উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল- "কোর কোর্স", "ইলেকটিভ কোর্স", 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স' "স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স", "এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স" এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি

উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

Multidisciplinary/Interdisciplinary Course 1

কোর্সের শিরোনাম : গণমাধ্যম ও গণজ্ঞাপন

কোর্স কোর্ড : NMD-BG-01

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ২০২৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the University Grant Commission -
Distance Education Bureau

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

Multidisciplinary/Interdisciplinary Course 1

কোর্সের শিরোনাম : গণমাধ্যম ও গণজ্ঞাপন

কোর্স কোর্ড : NMD-BG-01

মডিউল : ১, ২, ৩

Module : 1, 2, 3

কোর্স মাল্টিডিসিপ্লিনারি/ ইন্টারডিসিপ্লিনারি কোর্স ১ **Multidisciplinary/ Interdisciplinary Course 1**	কোর্স লেখক **Course Writer**	কোর্স সম্পাদক **Course Editor**
মডিউল ১ Module 1 :	**একক ১, ২ :** ডঃ প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ	
	একক ৩ : অরিজিৎ ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, সুনীত চক্রবর্তী, ভবেশ দাস	
মডিউল ২ Module 2 :	**একক ১ :** ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	**ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল**
	একক ২, ৩ : ডঃ প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ	
মডিউল ৩ Module 3 :	**একক ১, ২, ৩ :** ডঃ প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ অরিজিৎ ঘোষ, সহকারী অধ্যাপক, সংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	

ফরম্যাট এডিটিং : ডঃ প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি :

ড. শক্তিনাথ ঝা
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

ড. নীহারকান্তি মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা

ড. চিত্রিতা ব্যানার্জি
সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড. অনামিকা দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমন্ত্রিত সদস্য

ড. প্রাপ্তি চক্রবর্তী, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদায় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যাতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনো রকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম **(NBG)**

Multidisciplinary / Interdisciplinary Course 1

কোর্সের শিরোনাম : গণমাধ্যম ও গণজ্ঞাপন

কোর্স কোর্ড : NMD-BG-01

মডিউল : ১, ২, ৩

Module : 1, 2, 3

সূচীপত্র

মডিউল	পৃষ্ঠা সংখ্যা
মডিউল ১ : গণমাধ্যম	
একক ১ ❑ গণমাধ্যম কী ও কেন	৯—১৫
একক ২ ❑ গণমাধ্যমের বিবর্তন	১৬—২৬
একক ৩ ❑ গণমাধ্যমের লিখনরীতি	২৭—১৩৬
মডিউল ২ : গণজ্ঞাপন	
একক ১ ❑ জ্ঞাপনধারণা	১৩৯—১৫২
একক ২ ❑ গণজ্ঞাপনের উৎস	১৫৩—১৬০
একক ৩ ❑ গণজ্ঞাপনের ধরণ	১৬১—১৬৬
মডিউল ৩ : দৈনন্দিন জীবনে গণমাধ্যম ও গণজ্ঞাপনের প্রভাব	
একক ১ ❑ গণমাধ্যম ও সমাজ	১৬৯—১৭৫
একক ২ ❑ সংস্কৃতি ও জ্ঞাপনের সম্পর্ক	১৭৬—১৮২
একক ৩ ❑ বিজ্ঞাপন ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং প্রযুক্তিগত ও নৈতিক প্রভাব	১৮৩—২০২

মডিউল ১
গণমাধ্যম

একক ১ ❑ গণমাধ্যম কী ও কেন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ গণমাধ্যমের সংজ্ঞা

১.৪ গণমাধ্যমের কাজ

১.৫ গণমাধ্যমের বিভিন্ন রূপ

১.৬ প্রশ্নাবলি

১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

গণমাধ্যম এবং গণজ্ঞাপন সম্পর্কে পাঠ নেওয়ার আগে আমাদের জেনে নিতে হয় গণমাধ্যম কাকে বলব? গণমাধ্যম কী এবং কেন—এই দুই প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে সরল অথচ স্বচ্ছ ধারণা না রেখে গণমাধ্যম এবং গণজ্ঞাপনের গভীরতর পাঠের দিকে এগোনো কঠিন। এই উদ্দেশ্য থেকেই এই এককে গণমাধ্যমের সংজ্ঞা, তাদের কাজ এবং তাদের বিভিন্ন রূপ নিয়ে সংক্ষিপ্ত, সরল অথচ স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। এককের উপান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি ও উপযোগী গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হল।

১.২ প্রস্তাবনা

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছিলেন মানুষের সামাজিকতার কথা, তার যূথবদ্ধরূপে বাঁচতে চাওয়ার কথা। এই যূথবদ্ধ যাপনের মূলে রয়েছে মানুষের নিজেকে প্রকাশ করা তাগিদ। সৃষ্টির শুরুর দিন থেকে মানুষ নিজেকে, নিজের ভাবনা এবং মতকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। আদিমযুগে গুহাগাত্রে নানান সাংকেতিক চিহ্ন,

চিত্রের মাধ্যমে এবং সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, সঙ্গীত, চিত্রের মাধ্যমে মানুষ আসলে নিজেকে জানাতে চেয়েছে এবং জানতে চেয়েছে অপরকে। সমগ্র মানব সভ্যতা আদিমযুগ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেই এই নিজেকে জানানো এবং অপরকে জানার স্পৃহার মধ্যে। এই স্পৃহাই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশালত্ব পেয়েছে। যে সংকেতচিহ্ন হয়তো আদিমযুগে একটি মাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং বার্তা জ্ঞাপনের মাধ্যম ছিল তাই-ই সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিধিকে ক্রমে বাড়িয়ে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সংযোগস্থাপন এবং বার্তা প্রদানের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। আদিম থেকে মধ্যযুগ হয়ে আধুনিকযুগে এসে আমরা এই সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-শৈল্পিক-মানসিক বার্তা বিনিময় করতে থাকলাম বৃহত্তর অর্থে এবং ক্রমে ক্রমে উঠে এল 'গণমাধ্যম'-এর মতো পরিভাষা। 'গণমাধ্যম' অর্থাৎ গণের জন্য, গণের হয়ে এবং গণের প্রতি দায়বদ্ধ মাধ্যম।

১.৩ গণমাধ্যমের সংজ্ঞা

উইলবার শ্রাম গণমাধ্যমের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, "A mass medium is essentially a working group organised around some device for circulating the same message at about the same time, to large number of people." অর্থাৎ, গণমাধ্যম আসলে যন্ত্র দ্বারা সুগঠিত এবং সুপরিচালিত একপ্রকার কর্মসমষ্টি যা প্রকৃতপক্ষে একই সময়ে একই বার্তা এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে প্রেরণ-সহায়ক রূপে কাজ করে। সাধারণত সমস্ত প্রকার গণমাধ্যম পাঠক-শ্রোতা-দর্শক নির্বিশেষে বক্তব্য বা পরিবেশনের বিষয় প্রস্তুত করে।

গণমাধ্যমের বার্তা ধাবিত হয় "To whom it may concern"—এই পরিপ্রেক্ষায়। অর্থাৎ, প্রয়োজন বা ব্যক্তিগত অভিরুচির তাগিদ থেকে গ্রাহক কোনো গণমাধ্যমে প্রচারিত বার্তাকে গ্রহণ করে। এই বিষয়টি খুব সাধারণভাবে বোঝানো যেতে পারে সংবাদপত্র কিংবা টেলিভিশনে সংবাদ সম্প্রচারের উদাহরণের মাধ্যমে। যখন সম্পাদক সংবাদপত্রটি প্রকাশ করেন তখন তিনি জানেন না নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি তাঁর পত্রটি পাঠ করেছেন বা টেলিভিশনে সম্প্রচারিত সংবাদটি কোন ভিশেষ ব্যক্তি গ্রহণ করছেন; অথচ দুই গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেই বার্তা সম্প্রচার বিশেষ থেকে নির্বিশেষের দিকে ধাবিত হয়। বিশেষ কারণ সংবাদপত্রটি একটি নির্দিষ্ট ভাষার বা প্রদেশের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বা টেলিভিশনের সংবাদটি একটি প্রদেশ কিংবা দেশের দর্শকের জন্য সম্প্রচারিত কিন্তু নির্বিশেষ কারণ সেই বিরাট গোষ্ঠীর মধ্যে ঠিক কতজন বা কারা নির্দিষ্ট একটি গণমাধ্যমের বার্তা গ্রহণ করছেন তা নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা মুশকিল। এই বিষয়টি অন্য সমস্ত গণমাধ্যমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

যদি আমরা কয়েকটি বিখ্যাত সংজ্ঞার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করি তাহলে গণমাধ্যম কী বা কাকে বলব গণমাধ্যম—সে বিষয় একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে।

- "Mass media are channels of communication which aid the transfer of meaning from a sender to heterogenous audiences simultaneously. It refers to a varied range of media technologies that reach a large audience through mass communication. Exam-

ples include : Television, Radio, Newspaper, Magazines, Motion pictures. (Emerging Trends in Indigenous Language Media, Communication, Gender, and Health', www.igi-global.com).

● Communication system in which messages are deliverd to very large audiences. The association to broadcasting led to the use of the expression mostly in relation to radio and television, but printed material, in particular newspapers and magazines, can also be considered mass media. ('Handbook of Research on Computer Mediated Communication', www.igi-global.com).

● Mass media refers to a diverse array of media technologies that reach a large audience via mass communication. The technologies through which this communication takes place include a variety of outlets. ('Maintaining International Relations Through Digital Public Diplomacy Policies and Discourses', www.igi-global.com).

অর্থাৎ, সার্বিকভাবে বলতে গেলে বিচিত্র বিন্যাসের বা বিভিন্ন ধরনের মিডিয়া বা মাধ্যম সহায়ক প্রযুক্তি যা এক বিস্তৃত দর্শকের কাছে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে তা-ই গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

১.৪ গণমাধ্যমের কাজ

গণমাধ্যমের কাজের পরিধির বিপুলতার কথা স্মরণে রেখে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞগণ সংক্ষেপে বলেছেন "to inform, to educate and to entertain"। অর্থাৎ গণমাধ্যমের কাজ হল তথ্য জ্ঞাপন করা, শিক্ষিত করা এবং বিনোদন দেওয়া। তথ্য সরবরাহের মধ্যে নিহিত থাকে পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি বা "surveillance of the environment"; কারণ শুধু তথ্য সরবরাহ করলেই হয় না, সেই তথ্যের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদানও প্রয়োজন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে আধুনিকতর হতে থাকা গণমাধ্যমের কার্যধারা জটিল হয়ে উঠছে, তাদের কার্যবিন্যাসের রূপরেখা বিস্তৃততর হওয়ার সমান্তরালে সামাজিক প্রেক্ষিত অনুযায়ী তাদের কার্যধারাতেও আসছে বৈচিত্র্য। গণমাধ্যমের এই বিচিত্র কার্যধারাগুলিকে সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত করা হল;

● **তথ্য (Information) :-** তথ্য আদান প্রদান মানব সভ্যতার অগ্রগতির একটি অঙ্গ। গণমাধ্যম যে তথ্য প্রদান করে তা বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় নানান বিষয় বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটা গণমাধ্যমের জ্ঞাপনের অন্যতম প্রধান কাজ। বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমগুলি প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ তথ্য সরবরাহ করে চলেছে। এই সমস্ত তথ্য বর্তমান পরিস্থিতি, সামাজিক পরিমণ্ডলকে বুঝতে আমাদের সহায়তা করে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, খেলাধুলো যে কোনো বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানার্জনের জন্য গণমাধ্যমগুলির সরবরাহকৃত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

● **শিক্ষা (Education) :-** সংবাদপত্র থেকে ডিজিটাল মিডিয়া সকল গণমাধ্যমই নানানভাবে নানান

দিক থেকে মানুষকে শিক্ষিত করে প্রধানত জনশিক্ষার প্রসার ঘটায়। তথ্যপ্রদান, তার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিয়ে গণমাধ্যমগুলি মানুষকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক নানান জটিল পরিস্থিতি বুঝতে সহায়তা করে।

● **বিনোদন (Entertainment) :-** বিনোদিত করা গণমাধ্যমের অন্যতম আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধারণ মানুষের মধ্যে রেডিও কিংবা টেলিভিশন ব্যবহারের প্রচলন শুরু হয় মূলত বিনোদনের উপকরণ হিসেবেই, পরবর্তীকালে যে তার জ্ঞাপন পরিধি বৃদ্ধি করে তথ্য সরবরাহ ও শিক্ষাদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

● **ব্যাখ্যা (Interpretation) :-** গণমাধ্যম তথ্য পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে যে তথ্যের ব্যাখ্যাও করে তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার প্রয়োজন কোথায়? একটি বিষয়কে আমরা যেমন প্রয়োজনীয় তথ্যের সাহায্যে জানতে পারি তেমনই সেইসব আহৃত তথ্যের সঠিক ব্যাখ্যা বিষয়টিকে যথার্থরূপে অনুধাবন করতে সহায়তা করে। মানুষ যত আধুনিক ও উন্নত হচ্ছে ততই তার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমে জটিল হয়ে উঠেছে। এই জটিলতার জন্য যে কোনো তথ্যের নানান ব্যাখ্যারও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, আর্থিক কোনো নীতি বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে পরিবর্তন এলে শুধুমাত্র তথ্যের সাহায্যে সেই পরিবর্তনের ধরন কিংবা কারণ সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়; তথ্যের সঙ্গে যথাযথ ব্যাখ্যা থাকলে সেই পরিবর্তনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝা সম্ভব হয়।

● **ঐতিহ্যের হস্তান্তর (Transmission of Heritage) :-** গণমাধ্যমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মে প্রবাহিত করা। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র তাদের নিজ নিজ উপস্থাপনা দিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার।

● **ঐক্যমত স্থাপন (Consensus) :-** আধুনিক সমাজ এখন গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর কোনো বিষয়ে ঐক্যমত স্থাপন জনমত গঠনের প্রাথমিক পর্যায় বলে অভিহিত হয়। জনমত—যা গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ রূপে পরিগণিত, বিভিন্ন মানুষের মতামতে ঐক্য না এলে একটি জনমত গঠিত হতে পারে না। আর এই ঐক্য স্থাপনের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গণমাধ্যম। তথ্য ও তার ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার ঘটিয়ে কোনো বিষয়ে ঐক্যমত স্থাপনের চেষ্টা করে গণমাধ্যম। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন আলোচনা পড়ে এবং শুনে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে মানুষ নিজেদের মতামত স্থাপন করে। এবং একটা বৃহৎ সংখ্যক মানুষের একমতের ওপর ভিত্তি করেই গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে।

● **উন্নয়ন (Development) :-** মানুষকে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণোদিত করে আধুনিক গণমাধ্যমগুলি। এক স্থানের উন্নয়নের বার্তা অন্যত্রবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ এবং ক্রমে নিজেকে উন্নত করে তোলার বাসনাটি গড়ে তোলে গণমাধ্যম। পরিবার পরিকল্পনা, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বোঝাতে আধুনিক গণমাধ্যমগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। উন্নয়নের কাজে গণমাধ্যমের এই ভূমিকার বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখে জ্ঞাপন বিদ্যায় সম্পূর্ণ নতুন একটি শাখার উদ্ভব ঘটেছে, যাকে বলা হচ্ছে 'Development Communication' বা উন্নয়ন জ্ঞাপন।

যদিও আমাদের এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে সমস্ত গণমাধ্যম একইভাবে একই উদ্দেশ্য থেকে গড়ে

ওঠেনি। কিছু গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য যেখানে বিনোদন সাধন তেমনই অন্য বেশকিছু গণমাধ্যমের প্রধান কাজ তথ্য সম্প্রচার করা। মুদ্রিত গণমাধ্যমগুলির মধ্যে অন্যতম বই যেমন একদিকে দীর্ঘস্থায়ী এবং বহু তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবে কাজে লাগলেও এটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সময় এবং অর্থসাপেক্ষ তেমনই অন্যদিকে অপর একটি মুদ্রিত গণমাধ্যম সংবাদপত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সময় এবং অর্থ দুই-ই হ্রাস করে, যার ফলে দৈনিক নানান তথ্য বিতরণ ও গ্রহণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। আবার টেলিভিশন বেতারের তুলনায় অনেকাংশে দ্রুত যেখানে সম্প্রচারিত তথ্য একই সঙ্গে চলমান অবস্থায় দেখা এবং শোনা যায়, এবং এটি স্থিতিশীল একটি খবরের কাগজের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুতগতিতে সংবাদ বা তথ্য সম্প্রচারে সক্ষম। টেলিভিশন একই সঙ্গে একই সময়ে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে ঘটমান ঘটনার বিবরণী দিতে সক্ষম। যদিও টেলিভিশনেরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। টেলিভিশন একঠি একমুখী মাধ্যম হওয়ার দরুণ এটি শুধুমাত্র তথ্য প্রদান করে পাঠকদের উদ্দেশ্যে, একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা বিষয়-কেন্দ্রিক তথ্য প্রদান করলেও সেই বিষয় বা ঘটনার বিপরীতদিকের বা পাঠকের প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করতে অক্ষম। এইদিক থেকে নব্য-প্রযুক্তির ইন্টারনেট পরিষেবা দ্বিমুখী মাধ্যম হওয়ার ফলে কোনো একটি ঘটনা-কেন্দ্রিক দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া এবং আলোচনা সেখানে পাওয়া সম্ভব হয়। যদিও এই মাধ্যমের কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে, যার মধ্যে তথ্যগত ভিভ্রান্তি এবং নেথিবাচক মন্তব্যের শিকার হওয়া অন্যতম প্রধান।

১৯৬০ সালে গণমাধ্যম তাত্ত্বিক মার্শাল ম্যাক্লুহান মন্তব্য করেছিলেন—'The medium is the message'। এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে ম্যাক্লুহান বোঝাতে চেয়েছিলেন যে প্রতিটি গণমাধ্যম পৃথক পৃথক রূপে এবং পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে তথ্য উপস্থাপন ও সম্প্রচার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হওয়া সংবাদ একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রাব্য এবং তুলনায় এটি অনেক বেশি দ্রুতগতি সম্পন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গণমাধ্যম হওয়ার ফলে যদিও অল্প সময়ে অনেক বেশি সংখ্যক তথ্য প্রদান করতে সক্ষম, তবুও টেলিভিশনে দৃশ্য ও শ্রাব্য অবস্থায় সংবাদ প্রদর্শনের চাকচিক্যতা বজায় থাকলেও কোনো একটি সংবাদের গভীরে গিয়ে তার খুঁটিনাটি প্রদর্শন করা অসম্ভব ছিল, যা সম্ভব ছিল সংবাদপত্র বা মুদ্রিত গণমাধ্যমগুলির ক্ষেত্রে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট তথ্যকে কেন্দ্র করে নানান দৃষ্টিকোণ এবং তত্ত্বের আলোচনা মুদ্রিত গণমাধ্যমগুলির লক্ষ ছিল। ফলে যাঁরা শুধুমাত্র টেলিভিশনের থেকে তথ্য গ্রহণ করছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে একটা নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বা মতামত প্রকাশ পেতে থাকলো, অর্থাৎ কী দেখানো হচ্ছে তার থেকেও বেশি গুরুত্ব ও প্রভাব পেতে থাকলো কীভাবে দেখানো হচ্ছে—এই বিষয়টি।

কম্পিউটার বিজ্ঞানী অ্যালান কে মন্তব্য করেছিলেন, "Each medium has a special way of representing ideas that emphasize particular ways of thinking and de-emphasize others." অ্যালান এই মন্তব্য তখন করেছিলেন যখন ইন্টারনেটের ব্যবহার ও প্রয়োগ শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বা শিক্ষানবিশদের হাত থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষদের ব্যবহারিক জীবনেও ক্রমে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। দেড় দশক পরে ইন্টারনেট যখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন ম্যাকলুহানের মতো গণমাধ্যম নিরীক্ষকগণ দাবি জানালেন যে ইন্টারনেট আমাদের ক্রমে সামাজিক করে তুলছে, অথবা গণতান্ত্রিক অথবা অগভীর করে গড়ে তুলছে।

সমসাময়িক কল্পকাহিনীর প্রতি টেলিভিশনের প্রভাব সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধে ডেভিড ফস্টার ওয়ালেস মন্তব্য করেছিলেন, "reactionaries who regard TV as some populace, sapping IQs and compromising SAT scores while we all sit there on ever fatter bottoms with little mesmerized spirals revolving in our eyes.... Treating television as evil is just as reductive and silly as treating it like a toasted with pictures. (Wallace, 1997)" সন্দেহ নেই, গণমাধ্যমের তথ্য এবং প্রযুক্তি আমাদের নানাভাবে প্রভাহিত করেছে, করে চলেছে, যার মধ্যে বেশ কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে যার ইতিবাচক পরিবর্তন ভবিষ্যতে আমাদের নিজেদের ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করছে।

১.৫ গণমাধ্যমের বিভিন্ন রূপ

গণমাধ্যমের একাদিক রূপের প্রতি লক্ষ্য রেখে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞগণ মূলত ছয়টি প্রধান ভাগে এদের বিভক্ত করেছেন। এদের মধ্যে শুরুতেই রাখা হয়েছে চিরাচরিত বা পরস্পরিত মাধ্যমগুলিকে, যা আসলে স্বদেশজাত তথ্য সরবরাহতে সহায়ক। যেমন নাট্যকলা, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি। গণমাধ্যমের দ্বিতীয় স্তরে রাখা হয়েছে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত মাধ্যমগুলিকে, যেগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্যজ্ঞাপন করে থাকে। এদের মধ্যে রাখা হয়েছে পত্রিকা, সংবাদপত্র, ইস্তাহার বা প্রচারপত্রগুলিকে। গণমাধ্যমের তৃতীয় ধরন হল বৈদ্যুতিন সম্প্রচার মাধ্যম, যা আসলে শ্রাব্য, দৃশ্য অথবা যুগপৎ শ্রাব্য-দৃশ্য বৈদ্যুতিন মাধ্যম। এদের মধ্যে রয়েছে টেলিভিশন, রেডিও এবং চলচ্চিত্র। গণমাধ্যমের চতুর্থ প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে বাইরের মাধ্যমগুলি, অর্থাৎ বিলবোর্ড, পোস্টার, দেওয়াল লিখন প্রভৃতি। পঞ্চম প্রকৃতির গণমাধ্যম হল পরিবহন গণমাধ্যম। পরিবহন গণমাধ্যম বলতে বোঝানো হয় সেইসব সম্প্রচার কিংবা লিখন যা প্রতিনিয়ত আমরা বাসে, ট্রেনে, মেট্রো রেলে শুনতে বা পড়তে পাই। কিংবা বাস-টার্মিনাস এবং রেল-স্টেশনগুলিতে ক্রমাগত সম্প্রচারিত হতে থাকা কোনো না কোনো তথ্য বা বিজ্ঞাপন এই ধরনের গণমাধ্যমের আওতাভুক্ত হয়। এবং সর্বশেষে গণমাধ্যমের ষষ্টভাগটি হল 'ডিজিটাল মিডিয়া'। ডিজিটাল মিডিয়া যা ইন্টারনেট পরিষেবার মাধ্যমে তথ্যজ্ঞাপন করে থাকে। ডিজিটাল মিডিয়ার মধ্যে রাখা সমস্তরকম সামাজিক মাধ্যম, ই-মেল, ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন এবং সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং পরিষেবাসমূহ।

গণমাধ্যমের এই বিচিত্র রূপকে স্মরণে রাখলে একটা বিষয় খুব সহজে বোঝা যায় যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমের রূপ বিপুলভাবে বিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম চূড়ান্তরূপে যেখানে ইন্টারনেট-নির্ভর সেখানে জানানো আবশ্যিক যে এসবের অনেক আগে সংবাদপত্রই ছিল গণমাধ্যমের প্রধান রূপ। একটা দীর্ঘসময় পর্যন্ত সংবাদপত্রই মানুষের কাছে সমস্তরকম সাম্প্রতিক তথ্য সরবরাহের বিশ্বস্ত মাধ্যম হিসেবে কাজ করে গেছে। একটা দীর্ঘ শতাব্দীর পরে ১৮৯৫ সালে বেতারযন্ত্রের উদ্ভব হওয়ার অনতিকাল পরেই গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্রের প্রায় একচ্ছত্র স্থান অনেকাংশে হ্রাস পেল এবং সেই স্থান দখল করে নিল বেতার। অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় অনুযায়ী পরিবারগুলি একত্রিত হত রাজনীতি-সমাজনীতি-বিনোদন সম্পর্কিত সাম্প্রতিকতম সংবাদটি শোনার উদ্দেশ্যে। এই বিবর্তনের পথ ধরেই আবিষ্কৃত হল টেলিভিশন

এবং বেতারের মতোই টেলিভিশন ধীরে ধীরে বেতারের জনপ্রিয়তা হ্রাস করে দিল। এবং বর্তমানে ইন্টারনেট পরিষেবা গণমাধ্যমের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতম বিষয়। ইন্টারনেট পরিচালিত সামাজিক মাধ্যমগুলি বর্তমানে সংবাদ শিরোনাম সম্প্রচারের ক্ষেত্রে প্রধানতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ইতি এবং নেতিবাচক দিক দুই-ই রয়েছে যা পরবর্তীতে আলোচিত হবে; তবু একথা অন্যথা করার উপায় নেই যে ইন্টারনেটের বিবর্তনের সময় থেকে সাধারণ জনতা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের যেকোনো রকম সংবাদ বা তথ্য একটিমাত্র 'ক্লিক' বা স্পর্শের মাধ্যমে পাচ্ছে।

১.৬ প্রশ্নাবলি

১। গণমাধ্যমের কাজগুলি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ রচনা করুন।

২। গণমাধ্যমের রূপগুলি কি কি? আলোচনা করুন।

৩। গণমাধ্যমের সংজ্ঞা দিয়ে এর নানান রূপের ক্রম-বিবর্তন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা করুন।

১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। পার্থ চট্টোপাধ্যায়—*গণজ্ঞাপন*

২। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—*জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম*

৩। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—*আধুনিক গণমাধ্যম*

৪। The Evolution of Media—*Understanding Media and Culture—open.lib.umn.edu*

৫। PGJM 7B.

একক ২ ❑ গণমাধ্যমের বিবর্তন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ পঠনযোগ্য গণমাধ্যমের ইতিহাস ও বিবর্তন

২.৪ দৃশ্য ও শ্রাব্য গণমাধ্যমের ক্রম বিবর্তন

২.৫ প্রশ্নাবলি

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ উদ্দেশ্য

এই কোর্সটির শুরুর এককে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে গণমাধ্যম কী, তার কাজ এবং তার নানান রূপের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সার্বিক পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা গেছে। ফলে একটা সার্বিক ধারণা সঙ্গে করে এই এককটিতে আলোচনা করা হবে গণমাধ্যমের প্রধানতম রূপগুলির ক্রম-বিবর্তনের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ, এই এককটি রচনার উদ্দেশ্য দৃশ্য, শ্রাব্য এবং পঠনযোগ্য গণমাধ্যমগুলির ইতিহাস ও বিবর্তিত রূপের প্রসঙ্গটি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা। এককের উপান্তে তাদের সুবিধার্থে অনুশীলনযোগ্য প্রশ্নাবলি ও গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে।

২.২ প্রস্তাবনা

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছিলেন মানুষের সামাজিকতার কথা, তার যূথবদ্ধরূপে বাঁচতে চাওয়ার কথা। এই যূথবদ্ধ যাপনের মূলে রয়েছে মানুষের নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদ। সৃষ্টির শুরুর দিন থেকে মানুষ নিজেকে, নিজের ভাবনা এবং মতকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। আদিমযুগে গুহাগাত্রে নানান সাংকেতিক চিহ্ন, চিত্রের মাধ্যমে এবং সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, সঙ্গীত, চিত্রের মাধ্যমে মানুষ আসলে নিজেকে জানাতে চেয়েছে এবং জানতে চেয়েছে অপরকে। সমগ্র মানব সভ্যতা আদিমযুগ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেই এই নিজেকে জানানো এবং অপরকে জানার স্পৃহার মধ্যে। এই স্পৃহাই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশালত্ব

পেয়েছে। যে সংকেতচিহ্ন হয়তো আদিমযুগে একটিমাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং বার্তা জ্ঞাপনের মাধ্যম ছিল তাই-ই সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিধিকে ক্রমে বাড়িয়ে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সংযোগস্থাপন এবং বার্তা প্রদানের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। আদিম থেকে মধ্যযুগ হয়ে আধুনিকযুগে এসে আমরা এই সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-শৈল্পিক-মানসিক বার্তা বিনিময় করতে থাকলাম বৃহত্তর অর্থে এবং ক্রমে ক্রমে উঠে এল 'গণমাধ্যম'-এর মতো পরিভাষা। 'গণমাধ্যম' অর্থাৎ গণের জন্য, গণের হয়ে এবং গণের প্রতি দায়বদ্ধ মাধ্যম।

মানুষ নিজে ক্রম-বিবর্তমান একটি প্রাণী। সে নিজের আত্মিক-মানসিক-বৌদ্ধিক বিকাশ এবং বিবর্তনের সমান্তরালে নিজের নিত্য-ব্যবহার্য এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুর বিবর্তন করে চলেছে আদিম যুগ থেকে। ফলে এই ক্রম পরিবর্তন, সংযোজন-বিয়োজন এবং বিবর্তনের মধ্যে খুব স্বাবাবিকভাবেই ঢুকে পড়েছে গণমাধ্যমও। নির্বাক যুগের আকার-ইঙ্গিত-সাংকেতিক চিহ্ন-চিত্রকলা যেমন ক্রমে বিবর্তিত হয়ে পঠনযোগ্য বা 'Scripted form' পেয়েছে, তেমনই গণমাধ্যম শুধুমাত্র পটনযোগ্যতা থেকে বিবর্তিত হয়ে ক্রমে বৈদ্যুতিন দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমেও রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে এই এককের পরবর্তী অংশগুলিতে এই সমস্ত গণমাধ্যমের গড়ে ওঠার ইতিহাস এবং বিবর্তনের নানান কথা স্থান পাবে।

২.৩ পঠনযোগ্য গণমাধ্যমের ইতিহাস ও বিবর্তন

পঞ্চদশ শতাব্দীতে জোহানেস গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিস্কারের পূর্বাবস্থায় হাতে লেখা বই ছিল একমাত্র পঠনযোগ্য মাধ্যম। হাতে লেখা হওয়ার ফলস্বরূপ কোনো বইয়েরই একটি কপি আরেকটির সমান হয়ে উঠত না, কারণ মানুষ যখন একটি বই থেকে অপর বইটি দেখে কপি করছে তখন স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তীত লিপিকরের পরিবর্তীত হস্তাক্ষরের সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিমতও প্রায়শই প্রতিফলিত হয়ে যেত। যদিও তখনও পর্যন্ত এই হাতেলেখা বইগুলিই একমাত্র পঠনযোগ্য জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হত। মুদ্রণযন্ত্রের আবিস্কারে মুদ্রিত বা মুদ্রণযোগ্য গণমাধ্যমের উৎপাদনের পরিমাণ এক ধাক্কায় অনেকাংশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। এই মুদ্রণযন্ত্রের আবিস্কারের ফলে মুদ্রণযোগ্য গণমাধ্যমগুলি যেমন পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে স্বল্প খরচে মুদ্রিত হতে থাকল তেমনই একইসঙ্গে ক্রমে উন্নত হতে থাকা পরিবহন ব্যবস্থা এই মুদ্রিত গণমাধ্যমগুলিকে দ্রুত বৃহদাংশ পাঠকের কাছে পৌঁছনোর ক্ষমতা অর্জন করল। ফলে একই সময়ে দাঁড়িয়ে একই তথ্য একটা বৃহৎ গোষ্ঠঈর মানব সহজে এবং স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে পেতে শুরু করল। ফলে বৃহত্তর দৃষ্টির বিচারে দেখতে গেলে ইউরোপের নবজাগরণ কিংবা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের সংস্কারের মতো সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে গুটেনবার্গের আবিস্কারের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। যাই হোক, গুটেনবার্গের পরে ১৮১০ সালে আরও একজন জার্মান মুদ্রক ফ্রেডিরিক কেনিগ মুদ্রণযন্ত্র এবং সার্বিকভাবে মুদ্রণের বিষয়টিকে অনেকাংশে অগ্রসর করে তোলেন। কীভাবে? কেনিগ একটি বাষ্প-ইঞ্জিনকে মুদ্রণযন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে তার মুদ্রণ-ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি করে মুদ্রণযোগ্য মাধ্যমগুলিকে আধুনিক করে গড়ে তোলেন। ১৮০০ সালে যেখানে একটি হস্ত-চালিত মুদ্রণযন্ত্রে ঘণ্টা প্রতি ৪৮০ পৃষ্ঠা মুদ্রণ সম্ভব ছিল সেখানে কেনিগের যন্ত্রটি প্রতি

ঘণ্টায় প্রায় এর দ্বিগুণ পৃষ্ঠা মুদ্রিত করার ক্ষমতা রাখত। ১৯০০ সাল নাগাদ এই সংখ্যাই বহু মুদ্রণযন্ত্রে ঘণ্টা-প্রতি ৩০০০০ পৃষ্ঠায় পরিণত হয়েছিল।

এই আধুনিক মুদ্রণ-ক্ষমতাই দৈনিক সংবাদপত্রের উত্থান ও উন্নয়নকে অগ্রসর করেছিল। উনিশ শতকে দাঁড়িয়ে সংবাদপত্রই আমেরিকার ক্ষেত্রে যথাযথতম গণমাধ্যমে পরিণত হল যেখান থেকে আমেরিকাবাসী সার্বিক সমস্তরকম সংবাদ পেতে শুরু করল; কারণ নগরায়নের প্রভাবে শুধুমাত্র মৌখিক গালগল্পের মধ্যে দিয়ে যথাযথ সংবাদগুলি পাওয়া আর সম্ভব ছিল না। ফলে পৃথিবীর সমস্তরকম সংবাদ গ্রহণের জন্য আমেরিকাবাসী এই মুদ্রিত গণমাধ্যমটির ওপর ক্রমে নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ক্রমে শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ যে শ্রেণির কাছে যুগপৎ অবসরকাল এবং অর্থ দুই-ই অতিরিক্ত থাকল তাদের কাছে সংবাদপত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। গণমাধ্যম তাত্ত্বিক বেনেডিক্ট অ্যানডারসন যুক্তির দ্বারা দেখিয়েছেন যে সংবাদপত্র একই দেশের একাধিক শ্রেণির পাঠককে শ্রেণিবিভাজনের উর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র পাঠকসত্ত্বার দ্বারা চিহ্নিতকরণের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে এক জাতীয়সত্তার উন্মেষ ঘটাতে সহায়তা করেছে।

১৮৩০ সাল নাগাদ প্রধান দৈনিক সংবাদপত্রগুলি একটি নতুনতর প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে শুরু করলো, ইংরেজিতে যাকে বলা হল ‘Penny Papers’, যা আসলে স্বল্পমূল্যের দৈনিক-পত্রিকা যেখানে মুখরোচক জনমনোরঞ্জনকারী সংবাদ প্রকাশিত হত। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পত্রিকাগুলিতে শুকনো রাজনৈতিক খবরাখবরের তুলনায় প্রাধান্য পেত হত্যা এবং অভিযানমূলক মুখরোচক সংবাদ। যেখানে দৈনিক সংবাদপত্রগুলির পাঠক ছিল মূলত শিক্ষিত এবং বিত্তশালী শ্রেণি সেখানে এই ক্ষুদ্র স্বল্পমূল্যের পত্রিকাগুলির নির্ধারিত পাঠক ছিল তুলনায় স্বল্প বিত্তের অধিকারী বৃহৎ সংখ্যক গোষ্ঠী। এই ‘Penny Papers’-এরই ক্রমবিবর্তিত একটি রূপ আধুনিক মুখরোচক বিনোদনসর্বস্ব ট্যাবলয়েডগুলির মধ্যে পাওয়া সম্ভব।

ভারতবর্ষ যেখানে নানাভাষা ও নানা সংস্কৃতির দেশ সেখানে গণমাধ্যমগুলি ভারতবর্ষে পরিচিত হওয়ার সূচনা থেকেই এই নানান ভাষা-সংস্কৃতিকে একসূত্রে গ্রথিত করার ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করে গেছে। ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র রূপে চিহ্নিত করা হয় ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে জেমস অগাস্টাস হিকি সাহেবের দ্বারা ১৭৮০ সালে প্রকাশিত ‘বেঙ্গল গেজেট’। যদিও ব্রিটিশ শাসকদের বিরোধিতার জন্য প্রকাশের অনতিকাল পরেই সংবাদপত্রটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে ১৮১৮ সালের মে মাসে ‘বাঙ্গাল গেজেটি’ বা ‘বাঙ্গাল গেজেট’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ প্রায় সমনামে। এবং এই পত্রিকা মিশনারিদের প্রচেষ্টা বা সাহায্য ছাড়া বাঙালির দ্বারা প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র রূপে পরিগণিত হয়। এর দুই সম্পাদক হরচন্দ্র রায় ও গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এই পত্রিকাটির আয়ুও ছিল ক্ষণস্থায়ী, মাত্র তিন মাস। অর্থাৎ ১৮১৮ সালের মে থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত পত্রিকাঠি প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। উত্তরপ্রদেশের কানপুরের বাসিন্দা জুগল কিশোর শুক্ল ১৮২৬ সালে কলকাতা থেকে ভারতবর্ষের প্রথম হিন্দি ভাষার পত্রিকাটির সূচনা করেন, নাম ‘উদন্ত মার্তণ্ড’। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে প্রকাশিত এই হিন্দি সংবাদপত্রটি জাতীয়সত্তার খোঁজ করেছিল। ১৮২২ সালে কলকাতা থেকেই হরিহর দত্ত ভারতবর্ষের প্রথম উর্দুভাষার পত্রিকাটিও প্রকাশ করেন, নাম ‘জাম-ই-জাহান-নুমা’। সার্বিকভাবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের স্বর ধ্বনিত হলেও একইসঙ্গে

প্রকাশিত বহু ইংরেজি পত্রিকা (ব্রিটিশদের দ্বারা বা ব্রিটিশ সাহায্যপ্রাপ্ত) ব্রিটিশদের কার্যকলাপের সমর্থন প্রকাশ করত।

স্বাধীনতার পূর্ব এবং পরবর্তী সময়ে মুদ্রিত এই গণমাধ্যমে নৈতিকতার মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতার পূর্বে যেখানে দেশীয়-ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের প্রচারের সমান্তরালে স্বদেশ ও স্বজাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার ঘটানো সেখানে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তীকাল থেকেই সংবাদপত্রগুলির প্রধানতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো মুনাফা বৃদ্ধি, এবং ধীরে ধীরে এটি ব্যবসায় পরিণত হল। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম মুদ্রণ-কমিশনে সংবাদপত্রগুলির অবস্থা এবং অবস্থানকে সুচারুরূপে খতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করে তা তৎকালীন সরকারের সামনে নিবেদন করা হয়েছিল। এই রিপোর্টে ইতিহাস, নীতি, ক্ষমতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিযোগিতা, সাংবাদিক প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা ও মন্তব্য পেশ করা হয়েছিল। একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সমস্ত নানান কার্যকলাপ, কমিশন প্রভৃতি সত্ত্বেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তীকালে মুদ্রিত গণমাধ্যমের উত্থান যথেষ্ট ধীরগতিতে হয়েছিল। যদিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম বিতর্কিত 'জরুরী অবস্থা' চলাকালীন ভারতীয় মুদ্রণ ব্যবস্থার ওপর সেনশরসিপ নেমে আসে। এই জরুরী অবস্থার বিপরীত মত প্রকাশ করা শতাধিক সাংবাদিক সেই সময় কারাবদ্ধ হন, এবং একই কারণে বহু সংবাদপত্র প্রকাশনা সংস্থার বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই প্রথমবারের জন্য স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে মুদ্রিত গণমাধ্যমের ওপর 'Pre-censorship' লাগু করা হয়। যদিও এই বিতর্কিত ইতিহাসের অব্যবহিত পরে আশির দশক থেকে মুদ্রিত গণমাধ্যম ক্রমে বৃহৎ-শিল্পের রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে যেখানে অর্থকরী বিষয়টিও ক্রমেই প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

মুদ্রিত গণমাধ্যম বা সংবাদপত্রের বিবর্তনের ইতিহাস এরপর থেকেই ক্রমে দ্রুত ও বহুমুখী। বৃহৎ পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ, নিত্য-নূতন বাণিজ্যিক পরিকল্পনা, সংবাদপত্রগুলির আন্তঃপ্রতিযোগিতা ক্রমে সংবাদপত্রের বদলকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৯৭৫ সালে রামোজি রাও তেলুগু ভাষায় অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে যে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন তা প্রথমবারের জন্য প্রদেশের সমস্ত জেলাভিত্তিক সংবাদপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে শুরু করে; ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ স্থানীয় সংবাদ বা ঘটনা সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল হতে শুরু করলেন তেমনই সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্রের বাণিজ্যিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রামোজি রাওয়ের এই পদক্ষেপ তুমুল জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। বহু সংবাদপত্র এই একইভাবে স্থান-বিশেষে অতিরিক্ত পত্র যোগ করা শুরু করে যেখানে শুধুমাত্র সেই স্থান বা অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদই স্থান পেতে থাকে।

নব্বইয়ের দশকে যখন সমগ্র বিশ্ব অতি-দ্রুত আধুনিকতার অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলো তখন একাধারে সরকারের উদারীকরণ-পন্থা এবং বেসরকারিকরণ ভারতীয় মুদ্রিত গণমাধ্যমের সামনে বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজেদেরও ক্রমে আধুনিকতর করে তোলার সুযোগ এসে উপস্থিত হল। এই সময়ে দাঁড়িয়েই মুদ্রিত গণমাধ্যম ক্রমে ব্যক্তিগত কারবারের সীমা অতিক্রম করে জীবিকা হয়ে উঠতে শুরু করল। এই ক্রম-পরিবর্তীত যুগের সংবাদপত্রের কর্ণধারেরা ক্রমেই সংবাদপত্রকে একটি বস্তু এবং পাঠকসমাজকে সেই বস্তুর গ্রাহক হিসেবে ভেবে সেই অনুযায়ী নিজেদের বাণিজ্য-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করলেন। নিত্য-নূতন প্রযুক্তির

আত্মীকরণ, দ্রুত সম্প্রসারণের কৌশল অধিগ্রহণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা, ক্রম-পরিবর্তন হয়ে উঠল বর্তমান যুগের মুদ্রিত গণমাধ্যমের কর্মসূচী। বহু সংবাদপত্র বিদেশের থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করতে শুরু করল শুধুমাত্র প্রতিযোগিতায় নিজেদের এগিয়ে রাখার জন্য। কীভাবে? অতিরিক্ত অর্থ-বিনিয়োগ মানেই উন্নততর মুদ্রণ-যন্ত্রে রঙিন সংবাদপত্রের প্রকাশ যা এক-ধাক্কায় একটি সংবাদপত্রকে সমকালের অন্য পত্রগুলির তুলনায় অনেকবেশি আকর্ষণযোগ্য করে তুলবে। এই অর্থকরী দিকটির জন্যই বর্তমান সময়ে মুদ্রিত গণমাধ্যমগুলির বাহ্যিক চাকচিক্য তাদের মূল বক্তব্যের উন্নয়নের তুলনায় অধিক গুরুত্ব পেয়ে চলেছে, ফলে অধিকাংশ সংবাদপত্র এখন রঙিন বিজ্ঞাপনের ভাঁড়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

টেলিভিশনের আগমনে সাময়িকভাবে সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার একটা কারণ ছিল মানুষ সংবাদগুলি দেখা এবং শোনা এই দুই-ই একই সময়ে করতে পারছিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই মানুষ বুঝলেন টেলিভিশনে দৃশ্য ও শ্রাব্য অবস্থায় সংবাদ প্রদর্শনের চাকচিক্যতা বজায় থাকলেও কোনো একটি সংবাদের গভীরে গিয়ে তার খুঁটিনাটি প্রদর্শন করা অসম্ভব যেটা মুদ্রিত গণমাধ্যম অতি সহজেই করে থাকে। যদিও টেলিভিশনের এই চাকচিক্যতার কারণেও বহু সংবাদপত্র সাদা-কালো মাধ্যমের থেকে নিজেদের বিবর্তিত করে রঙিন হয়ে ওঠে অতিরিক্ত গ্রাহকের আশায়। এই সময়েই সংবাদপত্রগুলিতে গ্রাফিক্স, বৃহৎ আকারের ছবি স্থান পেতে থাকে সংবাদকে আরও আকর্ষিত করে তোলবার জন্য। এত কিছুর পরেও একুশ শতকে দাঁড়িয়ে যেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রতিদিন উন্নততর হয়ে চলেছে সেখানে পাশ্চাত্যের বহু দেশে মুদ্রিত গণমাধ্যমের জনপ্রিয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে চলেছে। যদিও এই বিষয়টি ভারতবর্ষের মুদ্রিত গণমাধ্যম সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। আমাদের দেশে প্রতিবছর মুদ্রিত গণমাধ্যম বা সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে চলেছে।

বর্তমানে প্রধান সংবাদপত্রগুলি ধীরগতিতে হলেও ট্যাবলয়েড়ের বা ক্ষুদ্র বিনোদন সর্বস্ব পত্রিকাগুলির বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে শুরু করেছে। জীবনযাত্রা, খাদ্য, চলচ্চিত্র এবং খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব-সম্পর্কিত সংবাদগুলিই এখন প্রতিদিনের ঘটে যাওয়া দেশি ও বৈদেশিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ-প্রদানের তুলনায় অধিক গুরুত্ব পেয়ে চলেছে।

২.৪ দৃশ্য ও শ্রাব্য গণমাধ্যমের ক্রম বিবর্তন (বেতার, টেলিভিশনসহ ডিজিটাল মাধ্যম)

● **রেডিও :** বিশ শতকের শুরুর কয়েক দশক প্রথম বৃহৎ অমুদ্রিত গণমাধ্যম—রেডিও—জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল। ১৯২০ সালের মধ্যে টেলিফোনের তুলনায় সস্তা রেডিওগুলির এই জনপ্রিয়তার কারণ ছিল—এক, অধিকাংশ মানুষ এটি সংগ্রহে সক্ষম ছিল এবং দুই, দেশের নানা প্রান্তে থাকা একটা বৃহৎ গোষ্ঠীর মানুষ একই সময়ে একই খবর শুনতে পারতেন। ১৯২৪ সালে কেলভিন কুলিজের প্রাক-নির্বাচনী বক্তৃতা একই সময়ে কুড়ি লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছেছিল। রেডিও বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল কারণ এঁরা এক বৃহৎ সংখ্যক বিমুগ্ধ শ্রোতার কাছে সহজেই পৌঁছতে সক্ষম হচ্ছিলেন যার ফলে বিপণন ব্যবস্থা দ্রুত ত্বরান্বিত হচ্ছিল। প্রথমদিকের এক বিজ্ঞাপন-পরামর্শদাতা মন্তব্য করেছিলেন রেডিও বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে নিজেদের ব্যবসায়িক নীতিকে প্রচার দেওয়ার জন্য স্বর্ণসুযোগ এনেছিল;

কারণ অগুন্তি শ্রোতা যারা একাধারে সহানুভূতিশীল আনন্দ-অনুসন্ধানী, উৎসাহী, আগ্রহী, কৌতূহলী হয়ে বিভিন্নরকম সংবাদের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। রেডিও একইসঙ্গে আঞ্চলিক-বিভেদের সীমা অতিক্রম করে সমগ্র দেশ ভিত্তিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে সচকিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল, "Americans in the 1920s were the first to wear ready-made, exact-size cloathing...to play electric phonographs, to use electric vacuum cleaners, to listen to commercial radio broadcasts, and to drink fresh orange juice year round (Mintz, 2007). (The Evolution of Media-Understanding Media and Culture, open.lib.umn.edu). ভোগবাদ সম্পর্কিত এই সুবিদিত সমাচারটি একাধারে ১৯২০-র সংবাদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে যেমন প্রতিপন্ন হয় তেমনই ১৯৩০ সালের 'The Great Depression' এর কালে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। সমকালের এই ভোগবাদী তাড়না অভূতপূর্ব উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করেছিল, কিন্তু আর্থিকমন্দা বা 'The Great Depression' শুরু হওয়ার সমান্তরালে ভোক্তাদের চাহিদা নাটকীয়ভাবে কমতে শুরু করল অতিরিক্ত উৎপাদিত হওয়া বস্তু এই আর্থিক মন্দাকে আরও গভীর করে তুলেছিল কারণ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অধিক হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ১৯২১ সালে রেডিও সিগন্যালের সহায়তায় তৎকালীন রাজ্যপাল স্যার জর্জ লয়েডের উদ্যোগে বোম্বে থেকে রেডিওতে একটি সাঙ্গীতিক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় যেটি পুনেতেও শোনা গিয়েছিল। এই পরীক্ষামূলক সম্প্রচারটি 'The Times of India', ডাকবিভাগ ও টেলিগ্রাফের বা তার বিভাগের সহায়তায় সম্পন্ন হয়েছিল। ভারতবর্ষে রেডিও পরিষেবার সূচনাকাল থেকেই এটি তথ্যপ্রদান, শিক্ষা এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে যেখানে সংবাদপত্র পৌঁছানো দুষ্কর ছিল সেখানেও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে তথ্য সম্প্রচার করা সম্ভব হয়েছিল।

দিল্লি থেকে প্রথমবারের জন্য বেতার-তরঙ্গে বেতার যন্ত্রে সংবাদ পাঠ ও সম্প্রচার করা হয়েছিল। এই একই বছর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে 'Indian State Broadcasting Service (ISBS)' এর নাম পরিবর্তন করে 'All India Radio' রাখা হয়। ঠিক এর পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৩৭ সালে কেন্দ্রীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠানের (Central News Organisation) প্রতিষ্ঠা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে, ১৯৪৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় যথাক্রমে সংবাদ পরিষেবামূলক বিভাগ বা 'News Service Division' এবং বিদেশ পরিষেবামূলক বিভাগ বা 'Foreign Service Division'-এ। ১৯৫৭ সালের ৩ অক্টোবর 'All India Radio'-এর নাম রাখা হয় 'আকাশবাণী'। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী থেকে সম্প্রচারিত হওয়া সংবাদ এবং সাম্প্রতিক বিষয় সম্পর্কিত অনুষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পায়।

ভারতীয় বেতারের ইতিহাসে ১৯৭৬ সালটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই বছরই 'All India Radio' 'দূরদর্শন'-এ থেকে পৃথক হয়ে যায়। এর ঠিক পরের বছর প্রথমবারের জন্য 'FM' পরিষেবার প্রচলন হয়। আশির দশকে সংবাদ সম্প্রচারের সমান্তরালে দূরদর্শন বেশ কিছু বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে শুরু করলে 'All India Radio'-র জনপ্রিয়তা ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। আশির দশকের শেষে দূরদর্শন তার এই জনপ্রিয়তা নাগরিক জনসমাজকে অতিক্রম করে ক্রমে গ্রামাঞ্চলের দিকেও ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের সূচনায় সরকার একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেখানে দিল্লি এবং বম্বের মতো নগরগুলিতে বেসরকারি নানান প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠান প্রযোজনার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সরকার এই

বেতারতরঙ্গের সহায়তায় সম্প্রচারিত হওয়া অনুষ্ঠানের বেশ কিছু সময়কে ঘন্টা হিসেবে বেশ কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিকিয়ে দেয়। কিন্তু কয়েক বছর পরেই, ১৯৯৮ সালে এই বেসরকারি FM সম্প্রচার বন্ধ হয় এবং 'All India Radio'-র প্রতি নির্দেশ আসে নিজস্ব FM পরিষেবার সূচনা করার জন্য। এর ফলস্বরূপ 'All India Radio', 'FM Rainbow', 'FM Gold', 'Vividh Bharati'-র মতো অনুষ্ঠানের সূচনা করে।

১৯৯৯ সালে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমে নিজেদের মতো করে বিভিন্ন শহরে FM পরিষেবা প্রদান করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। বেতার তরঙ্গের সহায়তায় সম্প্রচারিত এই বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন ক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করছিল তেমনই এই অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্প্রচারকগণ যাঁদের আমরা 'Radio jockey' বলি তাঁদের জনপ্রিয়তাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। এই বেসরকারি চ্যানেলগুলি মুখ্যত সাংগীতিক অনুষ্ঠানই সম্প্রচার করত। যদিও কিছু কিছু সংস্থা এবং চ্যানেল সাম্প্রতিক নানানবিষয়ক কেন্দ্রে রেখে তাদের অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সরকার মফস্বলগুলিতেও বেতারতরঙ্গ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভারতীয় বেতারের সম্প্রসারণ এক লহমায় অনেকটা বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনাটা ভারতীয় FM-এর বিপ্লব বা 'The Rebirth of Radio' হিসেবে চিহ্নিত হয়। এরই সঙ্গে সরকার নানান বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, পঞ্চায়েত এবং এন.জি.ও. গুলিকে নিজেদের এফ. এম. পরিষেবা সম্প্রচারের ছাড়পত্র প্রদান করে। এই সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং ছাড়পত্র প্রদানের পেছনে ছিল পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষদের কাছে পৌঁছে তাঁদের কথাগুলি তাঁদের মতো করে বলার এবং শোনানোর প্রচেষ্টা (Voice to the Voiceless)। এই ধরনের আঞ্চলিক এফ. এম. চ্যানেল বর্তমানে শতাধিক রয়েছে যাদের উদ্দেশ্যই হল সাধারণ মানুষের জন্য একটি অবাণিজ্যিক মাধ্যম গড়ে তোলা যেখানে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে।

● **টেলিভিশন :-** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমে বিত্তশালী হয়ে উঠছিল সেই সময়েই এক জনপ্রিয় গণমাধ্যমের অভ্যুদয় হল; এবং সেটি হল টেলিভিশন। ১৯৪৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৭০০০ টেলিভিশন ব্যবহৃত হয়েছিল; এবং পরবর্তী সাত বছরের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ আমেরিকাবাসীর ঘরে অন্ততপক্ষে একটি টেলিভিশন মজুত ছিল। টেলিভিশন সম্প্রচার এই সময়ের গণমাধ্যমগুলির মধ্যে প্রধানতম হিসেবে বিবেচিত হত এবং তিনটি প্রধান নেটওয়ার্ক নব্বই শতাংশ সংবাদ সম্প্রচার, নানান ঘটনা সম্প্রচারমূলক অনুষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করত; এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে কিছু সমাজবাদী সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন যে একসঙ্গে একই অনুষ্ঠান একটা বৃহৎ সংখ্যক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে টেলিভিশন সম্প্রচার আসলে আমেরিকার 'স্বাভাবিক' জীবন সম্পর্কে একটি সমজাতীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সার্বিক ধারণা তৈরি করতে সহায়ক হচ্ছে। কিন্তু এরই সমান্তরালে ১৯৬০ সালে টেলিভিশন বৈপরীত্যমূলক সংস্কৃতিতেও অবদান রেখেছিল। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল আমেরিকার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত প্রথম সামরিক দ্বন্দ্বমূলক সম্প্রচার যেখানে যুদ্ধের রাত্রিকালীন চিত্র, ফুটেজ যুদ্ধ-বিরোধীদের অভিমত প্রকাশ সামগ্রিকভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুলেছিল।

রেডিও ও টেলিভিশনসহ সম্প্রচারমূলক সমস্ত প্রযুক্তি এমনভাবে সমগ্র আমেরিকাবাসীর জীবনে প্রভাব

ফেলতে শুরু করেছিল যে সমস্তরকম মুদ্রিত গণমাধ্যম এই নতুন ধরনের সম্প্রচারকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। মুদ্রিত গণমাধ্যমগুলি ছিল অনেকবেশি স্থিতিশীল এবং সহজে সংরক্ষণযোগ্য। একইসঙ্গে এই মুদ্রিত গণমাধ্যমগুলি সময়ের নমনীয়তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার বিষয়ে সহায়ক ছিল। কীভাবে? একজন ব্যক্তি একবারে একটি পত্রিকা বা সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্র ক্রয় করার পর তিনি নিজের অভিরুচি অনুযায়ী সময় এবং স্থানে সেটি পাঠ করতে পারেন। এর বৈপরীত্যে সম্প্রচারমূলক গণমাধ্যমগুলি মূলত নির্দিষ্ট সময়ে সম্প্রচারিত হত বলেই তার মধ্যে তাৎক্ষণিকতা যুক্ত হয়েছিল। ১৯৯০ সালে ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত একটি চলমান টেলিভিশন সম্প্রচারকে ইচ্ছে মতো থামিয়ে দেওয়া (Pause) কিংবা পুনরায় সম্প্রচার করা অসম্ভব ছিল।

'কেবল' তারের মাধ্যমে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হতে শুরু করলে গণমাধ্যমগুলি ১৯৮০ এবং ৯০-এর দশকে আমূল বিবর্তনের সম্মুখীন হয়। টেলিভিশন আবিষ্কারের প্রথম কয়েক দশকে দর্শকদের কাছে হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র চ্যানেল ছিল যা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই ধরনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতো। ১৯৭৫ সালে তিনটি প্রধান নেটওয়ার্ক ৯৩ শতাংশ টেলিভিশন সম্প্রচারে সহায়ক ছিল। ২০০৪ এর মধ্যে এই ৯৩ শতাংশের অঙ্কটা নেমে দাঁড়ায় ২৮.৪ শতাংশে, এবং এর কারণ ছিল এই 'কেবল' তারের মাধ্যমে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সম্প্রচার। এর ফলে দর্শকদের হাতে অনেক বেশি বিকল্প এলো, অর্থাৎ ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য খেলার চ্যানেল, চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য চলচ্চিত্রের চ্যানেল, সঙ্গীত-রসিকদের জন্য সঙ্গীতের চ্যানেল চলে এলো। যদিও ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পূর্বোক্ত তিনটি প্রধান নেটওয়ার্কই টেলিভিশনকে চালনা করে এসেছিল।

১৯৩৬ সালে বিশ্বে প্রথমবারের জন্য টেলিভিশন-সম্প্রচার হওয়ার প্রায় দুই দশক পরে ইউনেস্কো'-র সহায়তায় ১৯৫৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের দিল্লিত প্রথম টেলিভিশন সম্প্রচার হয়। প্রথমাবস্থায় সপ্তাহের দুটি দিনে এক ঘণ্টা করে স্বাস্থ্য, ট্রাফিক, পথঘাটে চলার নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞানমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হত। ১৯৬১ সালে এই সম্প্রচারের ধরণ কিছুটা বদলে যায় যখন এর সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক প্রকল্পকেও (School Educational Television / STV) যুক্ত হয়। ১৯৭২ সালে বম্বেতে দ্বিতীয় আরেকটি টেলিভিশন স্টেশন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের টেলিভিশন সম্প্রচারের ধরণ বেশ খানিকটা বিবর্তিত হয়। এরপরে বম্বের স্টেশনটির মতোই ১৯৭৩ সালে শ্রীনগর এবং অমৃতসরে এবং ১৯৭৫ সালে কলকাতা, মাদ্রাজ এবং লখনৌতেও টেলিভিশন স্টেশন গড়ে ওঠে।

১৯৫৯ থেকে ১৯৭৫ এই ১৭ বছরে টেলিভিশন সম্প্রচার সাদাকালো মাধ্যমে হলেও অতি দ্রুততায় অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৭৬ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে আটটি টেলিভিশন স্টেশন ৪৫ লক্ষ দর্শকের জন্য উন্মুক্ত হয়ে সম্প্রচার করতে থাকে। তখনও পর্যন্ত টেলিভিশন সম্প্রচারের বিষয়টি বেতারের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল। কিন্তু পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধের সম্মুখীন হয়ে তৎকালীন সরকার জাতীয় টেলিভিশন নেটওয়ার্ক হিসেবে 'দূরদর্শন'-এর প্রতিষ্ঠা করে সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার বিভাগের আওতায় রাখেন।

মূলত তিনটি প্রধান কারণে বিশ শতকের সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে টেলিভিশনের অগ্রগতি দ্রুততা পায়। প্রথমত, ১৯৭৫ সালের আগস্ট থেকে ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসের মধ্যে SITE

বা 'Satellite Instructional Television Experiment' প্রতিষ্ঠিত হয় যার কাজ ছিল আসলে একটি স্যাটেলাইটের সহায়তায় টেলিভিশনকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য থেকে ছটি রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করলেও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও সম্প্রচারিত হত একইসঙ্গে। দ্বিতীয়ত, SITE এর পরেই ১৯৮২ সালে এলো দেশের প্রথম স্বদেশী স্যাটেলাইট INSAT1A, যা দূরদর্শনকে সমস্ত আঞ্চলিক স্টেশনের জন্য কার্যকর করে তুলল। INSAT-1A-এর সহায়তাতেই দূরদর্শন প্রথমবারের জন্য জাতীয়স্তরের অনুষ্ঠান সম্প্রচারে সক্ষম হয়। এই সম্প্রচারের বিষয়টি দিল্লি থেকে দেশের অন্য সমস্ত স্টেশনে ছড়িয়ে পড়তো। ১৯৮২ সালে ভারতবর্ষে যখন এশিয়ান গেমস হয় তখন প্রথমবারের জন্য সরকার রঙিন এই খেলার সংবাদ রঙিন সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তৃতীয়ত, নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে স্যাটেলাইটের সহায়তায় অভারতীয় চ্যানেলগুলিকে ভারতে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। ১৯৯০-এর পর থেকে কেবল তারের প্রয়োগে টেলিভিশন এক ধাক্কায় অনেকখানি গতি পায়।

TRAI-এর ২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক বিবৃতি অনুযায়ী চিনের পরেই ভারতবর্ষ টেলিভিশনের ব্যবসার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম রয়েছে। ভারতবর্ষের টেলিভিশন শিল্প ২০১৪-১৫ সালে ৪,৭৫,০০৩ কোটি থেকে ১৪.১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ সালে ৫,৪২,০০৩-এ দাঁড়ায়, এবং এই ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবসা শিল্প এবং ক্রয়-বিক্রয় দুই ক্ষেত্রেই অব্যাহত ছিল। গত শতাব্দীর শেষ দশকটি টেলিভিশনের বিবর্তনকে বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে কেবল এবং স্যাটেলাইটের প্রয়োগ এবং অন্যদিকে কেবল টি.ভি-র 'ডিজিটাইজেশন' এই পরিবর্তন ও বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছিল। ব্যবহারকারীর সংখ্যার বিচারে এশিয়া মহাদেশে ভারতবর্ষই টেলিভিশনের বৃহত্তম বাণিজ্য ক্ষেত্র।

● **ডিজিটাল মাধ্যম :-** ১৯৯৫ সালে ভারত সরকার বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির কম্পিউটারকে বিশ্বের নানা প্রান্তের কম্পিউটারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে। ১৯৯৯ সালে এশিয়া মহাদেশে 'অনলাইন' সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ২২৩। এমনকি ইন্টারনেট পরিষেবা ভারতবর্ষের বাজারে ছেয়ে যাবার বেশ কিছু সময় আগে ভারতবর্ষীয় উদ্যোক্তা রাজেশ জৈন ব্যক্তিগত উদ্যোগে' 'indiaworld.com' নামে আমেরিকান সার্ভারে একটি ভারতীয় 'ওয়েব পোর্টাল' চালু করেন। সম্ভবত এটিই প্রথম ভারতীয় ওয়েব পোর্টাল যা পৃথিবীর নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত দর্শক বা গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে সংবাদ এবং তথ্য সম্প্রচার করত। পরবর্তীকালে রাজেশ জৈন আরও একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করেন, এবং এই প্রথম এই ওয়েব পোর্টাল 'khoj.com' নামে একটি সার্চ-ইঞ্জিনও গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে 'সত্যম ইনফোওয়ে' (Satyam Infoway) এই ওয়েব পোর্টালটি ক্রয় করে নেয়। একইভাবে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্ণধার অজিত বালাকৃষ্ণন নিজস্ব ডোমেন নামসহ একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করেন, নাম 'rediff.com'। এই পোর্টালটির সঙ্গে ইমেল পরিষেবা সংযুক্ত থাকার কারণে ভারতীয়দের মধ্যে এটি তুমুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময়কালের মধ্যে 'ডট কম' কোম্পানির সংখ্যা অতি দ্রুততায় বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৯৬ সালে ভারতবর্ষে ইন্টারনেট পরিষেবা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার কালে দুটি মুখ্য গণমাধ্যম সংস্থা 'The Bennett' যারা ভারতবর্ষে ইংরেজি সংবাদপত্র প্রকাশ করত তারা এই নতুন ধারার গণমাধ্যমকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। একদম শুরুর দিক এদের দুটি পত্রিকা 'Femina' এবং 'Filmfare'-কে অনলাইন

পাঠকদের কাছে উপলব্ধ করে তুলল এবং এরই সঙ্গে 'The Times of India' এবং 'The Economic Times' এই দুটি সংবাদপত্রও অনলাইন মাধ্যমে চলে এল। যদিও এই অনলাইন সংবাদপত্রগুলির বিষয়বস্তু কিন্তু মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলি থেকেই গৃহীত হত। ১৯৯৮-৯৯ সালে 'indiatimes.com' নামে এই সংস্থা প্রথমবারের জন্য নিজস্ব পোর্টাল উদঘাটন করলে এরই সঙ্গে ভারতবর্ষে অনলাইন সংবাদের বাণিজ্যিক দিকটি অতিদ্রুততায় অগ্রসর হতে থাকে। অনলাইন সাংবাদিকতার পদক্ষেপটি গত শতকের শেষ দশক থেকে ধীরে ধীরে প্রথমে ইংরেজি এবং পরে হিন্দি সংবাদপত্রের হাত ধরে অগ্রসর হতে থাকে।

২০০৮ সালে রাজস্থানের অন্যতম একটি প্রধান সংবাদপত্র সংস্থা 'Patrika Group' তাদের নিজেদের ওয়েবসাইটটিকে পুনর্নবীকরণ করে পুনরায় চালু করে যেখানে অনলাইন পত্রিকাকে আকর্ষক করে তোলা হয়। এই বিষয়টিকে ভারতবর্ষে অনলাইন গণমাধ্যমের এবং অনলাইন সাংবাদিকতার উন্নয়নের **দ্বিতীয় পর্যায়** হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই পর্বে অনলাইন সংবাদপত্রগুলি নিজেদের উপস্থাপন পদ্ধতি এবং উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর উন্নয়নের দিকে জোর দেওয়া শুরু করল। নিজেদের মানকে উন্নত করে তোলার জন্য বিজ্ঞাপনের সহায়তার সমান্তরালে পাঠকদের থেকে 'ফিডব্যাক'-ও গ্রহণ করতে শুরু করল এই অনলাইন সংবাদপত্রগুলি।

বর্তমানে যে আকারে আমরা অনলাইন সংবাদপত্রগুলি পাই তা আসলে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি। বহু পরিবর্তন ও নিরীক্ষার ফলে অনলাইন সংবাদপত্রগুলি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। ডিজাইন থেকে শুরু করে সংবাদের শ্রেণি বা ধরণ অনুযায়ী বিভাজন করা এবং উপস্থাপন পদ্ধতিসহ সমস্ত কিছুই পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী ঢেলে সাজিয়ে বর্তমান রূপে নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথমাবস্থায় অনলাইন সংবাদত্রগুলি মুদ্রিত সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করেই নিজেদের পরিচালনা করত; অর্থাৎ মুদ্রিত মাধ্যমে যে সংবাদ প্রকাশিত হত তারই একটি অনলাইন রূপ অনলাইন সংবাদপত্রটিতে প্রকাশিত হত। কিন্তু **দ্বিতীয় পর্যায়ে** এসে অনলাইন সংবাদপত্রগুলি নতুন ধরনের 'সার্চ ইঞ্জিন' এবং 'হাইপারলিঙ্ক'-এর ব্যবহারের ফলে অধিক-পরিমাণে মিথষ্ক্রিয় হয়ে উঠলো, অর্থাৎ পাঠক এবং দর্শকের সঙ্গে আদান-প্রদান সহজতর হয়ে এলো। **তৃতীয় পর্যায়ে** এসেই অনলাইন সংবাদপত্রের জন্য মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমের থেকে পৃথক রূপ ও ধরনের সংবাদ এবং তথ্য প্রদান করা হতে থাকল। ইউনিকোডের ব্যবহারের ফলে আঞ্চলিক ভাষা এবং অক্ষরের প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্যাগুলিরও ক্রমে সমাধান হতে থাকলো। যদিও পরিসংখ্যানের ভিত্তি দেখা গেল পাঠককূল অনলাইন সংবাদপত্রের তুলনায় মুদ্রিত কাগজের সংবাদপত্র পাঠে অধিক স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। ল্যাপটপ, ই-বুক রিডার, ডেসক্টপসহ সমস্ত ইলেকট্রনিক মাধ্যমই কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পাঠের জন্য উপযুক্ত বা সুবিধেজনক হিসেবে বিবেচিত হল না। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান পাঠসহায়ক ইলেকট্রনিক কাগজ প্রস্তুতের চেষ্টা জারি রেখেছে।

অনলাইন সাংবাদিকতা ভারতবর্ষে সাধারণ স্তরের মানুষের মধ্যে এখনো ততটা জনপ্রিয়তা পায়নি, এর একটা কারণ এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে কম্পিউটার টেকনোলজি সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। ডিজিটাল মাধ্যমের বৈপ্লবিক প্রকাশ এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলগুলিতে হয়নি। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এই ডিজিটাল দুনিয়ার বহু বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন শুধুমাত্র আর্থিক অসুবিধের কারণে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে 'টেলি-কমিউনিকেশন' ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমকে প্রান্তিক এলাকাগুলিতে পৌঁছে

দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'Mobile Operators Association of India'-র প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৭ সালে ভারতবর্ষে মোবাইল ব্যবহাকারীর সংখ্যা ছিল ৯৪৬.৬৬ লক্ষ, এবং এর ২৫ শতাংশ ব্যবহারকারী আসলে 'স্মার্ট ফোন' ব্যবহার করতেন। এই সংখ্যাটি প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। অধিকাংশ টেলি-যোগাযোগ সংস্থাগুলি 5G মোবাইল সেবা চালু করছে। এই দলের মধ্যে রয়েছে ভারতী এয়ারটেল, ভোডাফোন, আইডিয়া, টেলিনর, বি.এস.এন.এল. এবং রিলায়েন্স জিও প্রভৃতি সংস্থা।

ভারতবর্ষের প্রান্তিক এলাকাগুলিতে অসাধারণ গতিতে টেলি-কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের বিস্তার অনলাইন সাংবাদিকতার পথকেও প্রশস্ত করেছে। বিভিন্ন ওয়েবসাইটের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমানে বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলিও তাদের অনলাইন রূপগুলির জন্য 'অ্যাপ' বা 'অ্যাপ্লিকেশন' চালু করছে। এই অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাহায্যে পাঠককুল একদিকে যেমন বিভিন্ন সংবাদপত্রের শীর্ষ সংবাদ বা সংবাদ-শিরোনামগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হচ্ছেন তেমনই একই সঙ্গে সময় এবং তথ্য সংরক্ষণেও সক্ষম হচ্ছেন। এইসবের ভিত্তিতে বলা যায় অনলাইন সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

২.৫ প্রশ্নাবলি

১। ডিজিটাল গণমাধ্যমের পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

২। মুদ্রিত গণমাধ্যমের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত নিবন্ধ রচনা করুন।

৩। মুদ্রিত গণমাধ্যম থেকে ডিজিটাল গণমাধ্যমের বিবর্তনটি সম্পর্কে লিখুন।

৪। দৃশ্য ও শ্রাব্য গণমাধ্যমগুলির বিবর্তন সম্পর্কে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ রচনা করুন।

৫। মুদ্রিত গণমাধ্যম এবং টেলিভিশনের প্রতি তুলনা করুন।

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। পার্থ চট্টোপাধ্যায়—*গণজ্ঞাপন*

২। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—*জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম*

৩। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—*আধুনিক গণমাধ্যম*

৪। The Evolution of Media—*Understanding Media and Culture—open.lib.umn.edu*

৫। PGJM-6a, 4a & b.

৬। ডিজিটাল সাংবাদিকতা—*সম্পাদনা -ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, অরিজিৎ ঘোষ, নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা।*

একক ৩ ❑ গণমাধ্যমের লিখনরীতি

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ মুদ্রিত গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুর লিখনরীতি

৩.৪ বেতার ও টেলিভিশনের বিষয়বস্তুর লিখনরীতি

৩.৫ ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তুর লিখনরীতি

৩.৬ প্রশ্নাবলি

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি রচনার উদ্দেশ্য বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমগুলিতে উপস্থাপিত তথ্যের লিপিকৃত রূপটি রচনার নিয়মনীতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ। অর্থাৎ, গণমাধ্যমগুলিতে উপস্থাপিত তথ্য কীভাবে লেখা হয় তার কলা-কৌশল সম্পর্কে বা স্ক্রিপ্ট-রাইটিং সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করা। ফলে ইতিপূর্বে পঠিত দুটি এককের পাঠ-অভিজ্ঞতা নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা এই এককটির পাঠ নেবেন। এককের উপান্তে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রশ্নাবলি ও গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩.২ প্রস্তাবনা

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছিলেন মানুষের সামাজিকতার কথা, তার যূথবদ্ধরূপে বাঁচতে চাওয়ার কথা। এই যূথবদ্ধ যাপনের মূলে রয়েছে মানুষের নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদ। সৃষ্টির শুরুর দিন থেকে মানুষ নিজেকে, নিজের ভাবনা এবং মতকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। সমগ্র মানব সভ্যতা আদিমযুগ থেকে এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছেই এই নিজেকে জানানো এবং অপরকে জানার স্পৃহার মধ্যে। এই স্পৃহাই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশালত্ব পেয়েছে। যে সংকেতচিহ্ন হয়তো আদিমযুগে একটিমাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং বার্তা জ্ঞাপনের মাধ্যম ছিল তাই-ই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নিজের পরিধিকে ক্রমে বাড়িয়ে

সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সংযোগস্থাপন এবং বার্তা প্রদানের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। আদিম থেকে মধ্যযুগ হয়ে আধুনিকযুগে এসে আমরা এই সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-শৈল্পিক-মানসিক বার্তা বিনিময় করতে থাকলাম বৃহত্তর অর্থে এবং ক্রমে ক্রমে উঠে এল 'গণমাধ্যম'-এর মতো পরিভাষা। 'গণমাধ্যম' অর্থাৎ গণের জন্য, গণের হয়ে এবং গণের প্রতি দায়বদ্ধ মাধ্যম।

মানুষ নিজে ক্রম-বিবর্তমান একটি প্রাণী। সে নিজের আত্মিক-মানসিক-বৌদ্ধিক বিকাশ এবং বিবর্তনের সমান্তরালে নিজের নিত্য-ব্যবহার্য এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুর বিবর্তন করে চলেছে আদিম যুগ থেকে। ফলে এই ক্রম পরিবর্তন, সংযোজন-বিয়োজন এবং বিবর্তনের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই ঢুকে পড়েছে গণমাধ্যমও। নির্বাক যুগের আকার-ইঙ্গিত-সাংকেতিক চিহ্ন-চিত্রকলা যেমন ক্রমে বিবর্তিত হয়ে পঠনযোগ্য বা 'Scripted form' পেয়েছে, তেমনই গণমাধ্যম শুধুমাত্র পঠনযোগ্যতা থেকে বিবর্তিত হয়ে ক্রমে বৈদুতিন দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমেও রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন গণমাধ্যমগুলির রূপ বদলেছে তেমনই তাদের তথ্য উপস্থাপনের রূপ ও রীতিতে এসেছে বিবর্তন। একটি গণমাধ্যমে যেভাবে বা যেরূপে তথ্য প্রদান করা হয় অন্য গণমাধ্যমগুলিতে উপস্থাপিত তথ্যের ধরণ ও রূপ তার থেকে স্বাভাবিকভাবেই হয় ভিন্ন প্রকৃতির। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বর্তমান এককে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তথ্যের উপস্থাপনের নানান নিয়মনীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা হবে।

৩.৩ মুদ্রিত গণমাধ্যমের বিষয়বস্তুর লিখনরীতি

৩.৩.১ সংবাদ

সংবাদ কী সে সম্পর্কে প্রত্যেকেরই মোটামুটি একটা ধারণা আছে। লোকসমাজে এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির দেখা হলে প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে—কী খবর, কেমন আছেন, অমুক কেমন আছেন, ছেলেমেয়েরা কে কী করছে? সামাজিক যোগাযোগই তো মূলত সংবাদ লেনদেন। তাছাড়া এই যুগটাই তথ্যের যুগ। তথ্য আদানপ্রদানের যুগ। যে ব্যক্তি, যে গোষ্ঠী বা যে দেশের তথ্যের ভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ সে তত বেশি শক্তিশালী। অর্থাৎ তথ্যই ক্ষমতা। এই তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের রেওয়াজ চিরাগত। এই কাজ যাঁরা করেন তাঁরা সাংবাদিক, আর যে পেশার মাধ্যমে সংবাদ জনসাধারণের কাছে পরিবেশিত হয় সে পেশার নাম সাংবাদিকতা।

সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ বা পরিবেশনের বিষয়টি আদিযুগ থেকে চলে আসছে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-সংবাদ সঞ্জয় যেভাবে বিবৃত করেছেন তা নিঃসন্দেহে আধুনিক যুগের সময়-সাংবাদিকদের সঙ্গে তুলনীয়। পুরাকালে রাজা বাদশাদের নিযুক্ত গুপ্তদূত বা চরদের বৃত্তিই ছিল গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করা। একালেও বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থায় গুপ্তবার্তা দফতর বা গোয়েন্দা বিভাগের কাজ কী সে বিষয়ে মোটামুটি সকলেই অবহিত আছেন। আঠার শতকের শেষ বা উনিশ শতকের গোড়ায় 'নিউজ রাইটার' বা সংবাদ লেখকের প্রধান

কাজই ছিল সরকারি সংবাদ সংগ্রহ করে নথিবদ্ধ করা। সতের দশকের প্রথম দিকে বিত্তবান ইউরোপীয়দের নিজস্ব সংবাদলেখক নিয়োগ করার কথা শোনা যায়। রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে এই সংবাদ লেখকরা সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন। ভারতবর্ষে মুঘল আমলে যাঁরা ছিলেন ওয়াকিয়া-নবিস প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন সংবাদলেখক। চাণক্য বা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে 'গূঢ়পুরুষদের' উল্লেখ আছে তাঁদের কাজও সাংবাদিকতা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। বিভিন্ন যুগে রাজদরবারে যাঁদেরকে বার্তাবহ বা ঘোষক হিসাবে নিয়োগ করা হত তাঁরাও ছিলেন মূলত সাংবাদিক।

লোকপরম্পরাগত কাহিনী, প্রবচন, কিংবদন্তী, প্রবাদ, জনশ্রুতি সবই মানুষের নিজের জানার ও অপরকে জানানোর আগ্রহ বা কৌতুহলের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আর, এই জানা ও জানানোর উপায় ও পদ্ধতিরও সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় রূপান্তর হয়েছে। সংবাদ বা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ বা পরিবেশন শতসহস্র বছরের সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হতে হতেই পেশাগত সাংবাদিকতার উদ্ভব। অন্যান্য পেশার মতো এই পেশাও নানা ঘাত-প্রতিঘাত, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে আজ এক ঈর্ষণীয় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। আর এই পেশায় নিযুক্ত সাংবাদিকরাও আজ সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত।

সমগ্র বিশ্বজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে বিপ্লব এসেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংবাদ সংগ্রহ ও সাংবাদিকতার রীতিনীতি ও গতিপ্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তিত হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমগুলিতে অর্থাৎ সংবাদপত্র রেডিও ও টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনের আদব কায়দা। আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে প্রতিযোগিতা। পেশা এবং ব্যবসা হিসাবে সাংবাদিকতার ধারা ও প্রকৃতি এবং প্রতিযোগী সংবাদ মাধ্যমগুলির সংবাদ পরিবেশনের প্রণালীও প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে। সময়োপযোগী হওয়ার জন্যই এই পরিবর্তনের প্রয়োজন। আর তা ছাড়া, প্রতিযোগিতার বৃত্তটাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এখন যুক্ত হয়েছে কমপিউটার-নির্ভর ইনফরমেশন সিস্টেম বা তথ্য পরিবেশন ব্যবস্থা স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বা উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সম্প্রচার, ইত্যাদি। সাংবাদিকতার আদর্শ ও নীতি বজায় রেখে, এবং এই কঠিন প্রতিযোগিতার পরিবেশে থেকে, সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকদের যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্যপালন খুবই দুরূহ। এই দুরূহ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনই সাংবাদিক, সাংবাদিকতা ও সংবাদ মাধ্যমের এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জোরেই সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যম সামাজিক দায়িত্বের অংশীদার। জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী সঠিক তথ্য ও নির্ভুল সংবাদ ঠিকমতো পরিবেশন করা এবং একই সঙ্গে জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা এই সামাজিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে সফল গণতন্ত্র সৎ সাংবাদিকতার ওপরই নির্ভর করে। কারণ, গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে জনমত আর জনমত গঠন ও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব ও কর্তব্য। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও অন্যায়ের সঙ্গে আপস ইত্যাদি সংবাদের মাধ্যমেই জনগণ জানতে পারেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধের অভাব বা অবক্ষয়, অর্থনৈতিক অবনতি বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতার অভাব, সুসংস্কৃতি বা কিছু কিছু বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসের মতো সামাজিক অভিশাপ, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, শিক্ষা এবং

স্বাস্থ্যচেতনা ও প্রয়োজনীয় পরিষেবার অপ্রতুলতা— সব কিছু বিষয় সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন ও অবহিত করতে পারে সংবাদ মাধ্যম।

সংবাদ মাধ্যমই আবার পারে জনসাধরণকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে। কৃষি ও শিল্পের অবস্থা; সমকালীন সাহিত্য, কারুশিল্প, বিজ্ঞান প্রযুক্তির ধারা; কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতার পাশাপাশি নবতর বিনোদনের আবির্ভাব সবকিছু সম্পর্কেই লোকসমাজকে অবহিত করে সংবাদ মাধ্যম। নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সংবাদ মাধ্যমগুলির মধ্যে থাকলেও সংবাদ মাধ্যম একদিকে সমাজের দর্পণস্বরূপ আর অন্যদিকে সমাজের শিক্ষক।

সংবাদের সংজ্ঞা :—

সংবাদের সংজ্ঞা কী? কী তার অর্থ? সংবাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কি?

আজকের দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিদিত পণ্যগুলির অন্যতম হচ্ছে সংবাদ। প্রতিটি মানুষই কোনও না কোনও একটি ভাষা জানেন এবং গণমাধ্যমে তাঁর প্রবেশ অবারিত। গণমাধ্যমের যুগ শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই সংবাদ সম্পর্কিত ধারণা মানুষের মনে ছিল। আদিম সমাজব্যবস্থাতেও গ্রামে গ্রামান্তরে সাপ্তাহিক হাটে বা হাটবারে যখন পণ্য বেচাকেনার জন্য লোকজনেরা মিলিত হতেন তখন তাঁদের মধ্যে স্থানীয় খবরেরও লেনদেন হত। আবার, সাধারণ মানুষকে কোন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ঢোল-শোহরতের প্রচলন বহুযুগ আগেই ছিল। চলতি কথায় এই ব্যবস্থাটিকেই ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জারি করা বলা হয়। মোটামুটি ভাবের আদানপ্রদানের শুরু থেকেই খবরের আদানপ্রদান চলছে।

কিন্তু খবর বা সংবাদ কাকে বলে? তার সংজ্ঞাটা কী? সংবাদের সংজ্ঞা সংবাদ নিজেই, অথবা সংবাদ হল সংবাদ। যখন যে ধরনের সংবাদ প্রচারিত বা পরিবেশিত হচ্ছে তখন সেই ধরনটিই সেই সংবাদের সংজ্ঞা। সংবাদের কোনও সাধারণ বা সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। প্রতিনিয়তই সংবাদের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হচ্ছে। এবং একইভাবে তার সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। এই প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত সংজ্ঞার কোনটিই কিন্তু ভুল নয়। কারণ, সংবাদের চেহারা বা চরিত্র বদলেই চলেছে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলির যে বিবরণ কোনও না কোনও পদ্ধতিতে পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের কাছে পৌঁছে যায় তাই সংবাদ। বিষয়ের এবং পাঠকের বৈচিত্র্যভেদে সংবাদের সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন হলেও প্রতিটি সংজ্ঞারই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সংবাদটি সম্পর্কে জনগণের আগ্রহ বা কৌতূহল থাকা চাই এবং সংবাদটির বিষয়বস্তু নতুন হওয়া চাই। যা আগে সংবাদ হিসাবে অন্য কোনভাবে প্রচারিত বা প্রকাশিত হয়েছে তা আর নতুনকরে সংবাদ গৃহীত বা গ্রাহ্য হবে না; আর মানুষের তাতে কোনও আগ্রহও নেই।

একটা কথা প্রচলিত আছে যে, কুকুর যখন মানুষকে কামড়ায় তখন সেটা কোনও সংবাদ নয়। মানুষ কুকুরকে কামড়ালে সেটা সংবাদ। কোনও সুনির্দিষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা না থাকলেও সংবাদের একাধিক সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সংজ্ঞাগুলি নির্ধারণ করেছেন সাংবাদিক বা সংবাদ বিশেষজ্ঞরাই। অথবা এ বিষয়ে যাঁদের পারদর্শিতা কেবলমাত্র কেতাবি বা পুঁথিগত। এখন দেখা যাক কী ধরনের সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতিটি সংজ্ঞারই গুণাগুণ যাচাই করে নিতে হবে। এবং কেবলমাত্র গুণগুলিই মাথায় রাখতে হবে।

১। যে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট সময়োপযোগী এবং বেশ কিছু লোকের তাতে আগ্রহ আছে তাই সংবাদ।

২। গতকালের দুনিয়া ও আজকের দুনিয়ার মধ্যে যে প্রভেদ সেটাই হচ্ছে সংবাদ।

৩। একজন সুদক্ষ প্রতিবেদক যে তথ্য সংগ্রহ করে সন্তুষ্ট হন ও প্রকাশ করেন এবং তাতে যদি পাঠকের আগ্রহ থাকে তাই সংবাদ।

৪। যথার্থ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন সম্পাদক সংবাদপত্রে বা সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশ করেন তাই সংবাদ।

৫। যে তথ্য পাঠ বা শ্রবণ করে পাঠক বা শ্রোতা/দর্শক সন্তুষ্ট হয় বা উৎসাহিত হয় তাই সংবাদ।

৬। যা চমকপ্রদ বা অভাবনীয় ঘটনা তাই সংবাদ।

৭। জনসাধরণ + ঘটনাবলী + পাঠক বা শ্রোতা-স্বার্থবাহী উপাদান = সংবাদ।

৮। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বা কাহিনীর প্রতিবেদন বা বিবরণ যা একজনের কাছে নতুন তথ্য বলে মনে হল তাই সংবাদ।

৯। ঘটনা বা মতামত, যার সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ আছে বা যা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত তাই সংবাদ।

১০। কারও মতে সঙ্গীত, সুরা ও রমণী হচ্ছে সংবাদের উৎস।

১১। সংবাদ হচ্ছে রমণী, মুদ্রা ও অপরাধের সমান।

১২। সংবাদ বা ইংরাজিতে যাকে বলে নিউজ (NEWS) তা হল North, East, West, South (উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ) অর্থাৎ চতুর্দিক থেকে সংগৃহীত তথ্য। অর্থাৎ চারিদিকে যা ঘটে চলেছে তাই সংবাদ।

১৩। সেটাই সংবাদ যেটা কেউ গোপন রাখতে চাইছে; বাকি সবই তো হয় বিজ্ঞাপন, নয় প্রচার।

১৪। জীবন ও জাগতিক বিষয়ের সবরকম বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে যা যা মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করে তাই সংবাদ।

১৫। যা কিছু নতুন তাই সংবাদ।

১৬। যা কিছু স্বাভাবিকতা থেকে ব্যতিক্রম তাই সংবাদ।

১৭। সংবাদ হচ্ছে সমসাময়িক ঘটনা, মতামত, চিন্তাভাবনা যা জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশকে প্রভাবিত করে বা সেই অংশের মনে আগ্রহ জাগায়।

১৮। বিশেষ বিষয় সম্পর্কে প্রকাশিত যে কোনও নতুন তথ্য সেই বিষয়ে আগ্রহী মানুষের কাছে সংবাদ।

১৯। ধর্ম, আভিজাত্য, দারিদ্র, অর্থ, যৌনতা ও রহস্যই হচ্ছে সংবাদ ।

২০। সংবাদপত্র যা প্রকাশ করে বা রেডিও এবং টেলিভিশন যা প্রচার করে তাই সংবাদ ।

সংবাদের সংজ্ঞা, তার অর্থ বা সংবাদ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কী তা মোটামুটি পরিষ্কার। একটা কথা কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে কোন ঘটনা বা কাহিনী বা তথ্য যতই গুরুত্বপূর্ণ, অর্থবহ ও কৌতুহলোদ্দীপক হোক না কেন যতক্ষণ তা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বা রেডিও/টেলিভিশনে প্রচারিত না হচ্ছে ততক্ষণ সেটা সংবাদ নয়। আর, সংবাদ মাধ্যমে সেটাই পরিবেশিত হয় যেটা সেই মাধ্যমের কর্তাব্যক্তিরা সংবাদ হিসাবে বিবেচনা করেন এবং তা প্রকাশ বা প্রচারের জন্য অনুমোদন করেন। এই কর্তাব্যক্তিরা হচ্ছেন -সম্পাদক,

প্রযোজক, 'কপি'-পরীক্ষক, যে সব সাংবাদিকরা সংবাদ বাছাই বাতিল ও পুনর্বিন্যাস করেন। এঁরাই হলেন সংবাদ মাধ্যমের দ্বাররক্ষী বা 'গেটকীপার'। এঁদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংবাদ মাধ্যমের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং একই সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতা/দর্শকের স্বার্থ।

সুতরাং এই দুদিকের স্বার্থ বজায় রেখে সাংবাদিককে ঠিক করতে হবে 'সংবাদ কী'? একই সঙ্গে সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে। একজন বিচক্ষণ সাংবাদিককে দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। (১) পাঠক বা শ্রোতা/দর্শক কী চান বা কিসে তাঁদের আগ্রহ। এবং (২) পাঠক বা শ্রোতা/দর্শককে একজন সাংবাদিকের কী দেওয়া উচিত বা কী জানানো উচিত।

সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়? (১) অর্থপূর্ণ ও সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, (২) সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও তাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র তুলে ধরা, (৩) মানুষের মতামত, ধ্যানধারণা, নানা বিষয়ে ভাষ্য ইত্যাদি বিনিময়ের ক্ষেত্র হিসাবে মাধ্যমকে গড়ে তোলা, (৪) সমাজের লক্ষ্য কী, মূল্যবোধ কী তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা, (৫) দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও তথ্য বিষয়ে মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, (৬) বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের চেতনা বৃদ্ধি করা, এবং (৭) জনগণের শিক্ষক হিসাবে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমেই মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা ও সাক্ষরতা প্রসারে প্রেরণা দেওয়া সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব। তাহলে, সাংবাদিকের কাজ হচ্ছে এমন সব সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করা যাতে মাধ্যমের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয়, পাঠক বা শ্রোতা/দর্শকরা সেই সংবাদ সম্পর্কে আগ্রহী হন এবং সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্বও পালিত হয়। আবার, একই সঙ্গে সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে যে তাঁর পরিবেশিত সংবাদ যেন সত্যনিষ্ঠ হয় এবং কোনরকম একদেশদর্শিতা বা পক্ষপাতদোষে দুষ্ট না হয়।

সংবাদের উৎস :—

এই সংবাদ কোথা থেকে কীভাবে সংগ্রহ করা হয়? বা, এই সংবাদের উৎস কী? বহতা নদীর মতো সংবাদ বা ঘটনাপ্রবাহের যে অংশটুকু সংবাদ হিসাবে বিবেচিত ও নির্বাচিত হয় তারও একটা উৎস আছে। সংবাদের এই উৎস প্রকটও হতে পারে, অদৃশ্যও হতে পারে। জনসভায় কোন বক্তৃতা, বিধানসভা বা সংসদে কোনও ঘোষণা, বার্ষিক বাজেট-বিবরণে কোনও বিষয়ে উল্লেখ, সরকার বা কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও ঘোষণা ইত্যাদি প্রকট বা প্রাকশ্য উৎস থেকে সংবাদ সংগৃহীত হয়। গোপন বা অদৃশ্য উৎস, যেমন কোনও ওয়াকিবহাল ব্যক্তি নিজের নাম গোপন রেখে কোনও তথ্য সাংবাদিককে জানালেন, এর থেকেও অনেক ভালো ভালো, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আবহিত হয়। এই অদৃশ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত সংবাদ লেখার সময়, 'নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায়' বলে সাংবাদিকরা উল্লেখ করেন। সংবাদের এই সব গোপন উৎস সম্পর্কে সাংবাদিকদের পূর্ণ আস্থা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের দেওয়া তথ্য কখনোই সংবাদ হিসেবে পরিবেশন করা উচিত নয়। বিচক্ষণ সাংবাদিকরা সে কথা জানেন এবং এই ধরনের কোনও সংবাদসূত্র কেনইবা কোনও তথ্য সংবাদ হিসেবে প্রচারের ব্যাপারে উৎসুক, তাঁর কী স্বার্থ, সাংবাদিককে অভিজ্ঞতার আলোকে তাও যাচাই করে নিতে হয়। এই বিষয়ে সচেতন না হলে সাংবাদিক বিপদে পড়তে পারেন, তাঁর সংবাদ মাধ্যম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। সুতরাং সংবাদের সত্যতা ও উৎসের উদ্দেশ্য যাচাই করার জন্য সাংবাদিকদের খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই একটু সন্দেহবাদী হতেই হয়। সাংবাদিকতার স্বার্থে সেটাই কাম্য।

সংবাদের সূত্র :—

নির্দিষ্ট কোন উৎস থেকেই যে সব সংবাদ জানা যায় তা কিন্তু নয়। নানা ধরনের সংবাদের জন্য নির্ভর করতে হয়। নানারকম উৎসের ওপর। সাধারণত, কোনও বিশেষ কারণ না থাকলে, কোনও উৎস থেকে সংবাদটি সংগৃহীত প্রকাশিত সংবাদে তার উল্লেখ থাকাটা বাঞ্ছনীয়। সরকারি ও পদাধিকারবলে যোগ্য সূত্র থেকে সংগৃহীত সংবাদ নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য ও সংখ্যায়ও অনেক বেশি। এইসব সংবাদ-উৎসকে 'সবল' উৎস বলে বিবেচনা করা হয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তি বা বিবরণ, যা সাধারণত প্রেস রিলিজ বা ব্রিফিং হিসাবে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়, 'সবল' উৎস হিসাবেই গণ্য হয়। সরকারি 'মুখপাত্র' জানান বলে যে সংবাদ পরিবেশিত হয় তাও একই পর্যায়ভুক্ত। কোনও সরকারি নীতি বা প্রকল্প বা কর্মসূচি ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যরা বা বিভাগীয় সচিবরা সব সময়ই 'সবল' উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেক সময় 'সরকারি সূত্র' বা 'প্রমাণিক সূত্র' জাতীয় অভিব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলিকেও মোটামুটি 'সবল' সূত্র বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ততটা সবল নয়।

কিন্তু 'নির্ভরযোগ্য সূত্র', 'জানা গেছে', 'বিশ্বস্ত সূত্র', 'রাজনৈতিক মহল থেকে শোনা', 'পর্যবেক্ষকদের মতে' ইত্যাদি অভিব্যক্তি বা প্রকাশভঙ্গি 'দুর্বল' সংবাদসূত্রের ইঙ্গিতবাহী। সংবাদসূত্র আবার সরকারি ও বেসরকারি দুরকমই হয়। বিধান-সংক্রান্ত, নির্বাহী ও বিচার-সংক্রান্ত বা 'লেজিসলেটিভ', 'এগজিকিউটিভ' ও 'জুডিসিয়ারি' এবং বিভিন্ন সরকার-সংলগ্ন বা অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সরকারি সূত্র। আর, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং নানাধরনের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিরা বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা হচ্ছেন বেসরকারী উৎস।

সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ বা প্রচারের জন্য সক্রিয়ভাবে যাঁরা সংবাদ সংগ্রহ করেন তাঁরা হলেন রিপোর্টার বা প্রতিবেদক, নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশেষ সংবাদদাতা, জেলা সংবাদদাতা, বিদেশ সংবাদদাতা ইত্যাদি বা ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন, খেলাধূলা, রাজনীতি, কূটনীতি ইত্যাদি বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত সংবাদদাতা। সাধারণত দৈনন্দিন ঘটনা, দুর্ঘটনা ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করার প্রতিবেদক বা সংবাদদাতারা থানায়, দমকল, হাসপাতাল/অ্যাম্বুলেন্স, আদালত, বিমানবন্দর, বন্দর, খেলার জগৎ, বণিকসভা, বিশ্ববিদ্যলয়, বিভিন্ন সরকারী দফতর, পুরসভা, পরিবেশ দফতর, আবহাওয়া দফতর ইত্যাদি জায়গায় নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। এটা নিঃসন্দেহে সাংবাদিকদের নিত্যদিনের কাজ। আর, এই সমস্ত যোগাযোগের কেন্দ্র ও সেখানকার অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সংবাদের উৎস বলে বিবেচিত।

এতো সব সত্ত্বেও সংবাদপত্রের প্রধান সংবাদ-উৎস হচ্ছে সংবাদ সংস্থা বা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, ইংরাজিতে যাকে বলে নিউজ এজেন্সি। প্রকাশিত সংবাদে এই সব সংবাদ সংস্থাকে সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাদের নাম সংবাদে উল্লেখ করা হয়। তাই পাঠকরা পি টি আই, ইউ এন আই, রয়টারস, এ পি, এ এফ পি, তাস ইত্যাদি সংবাদ সংস্থার নামের সঙ্গে পরিচিত। পূর্বে তার বা টেলিপ্রিন্টার যোগে বর্তমানে, কম্পিউটারের মাধ্যমে দূর দূরান্তে নিযুক্ত সংবাদিকদের সংগৃহীত সংবাদ বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা দেশে-বিদেশে নানা সংবাদপত্র/সংবাদ মাধ্যমকে পাঠিয়ে দেয়। আর সেই সব সংবাদ প্রকাশিত/প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষে দুটি নিউজ এজেন্সি বা সংবাদ সংস্থা আছে— পি টি আই (প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া) আর ইউ এন আই (ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া) সংবাদ সংস্থাগুলি সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমগুলির কাছে সংবাদ বিক্রি করে। নিজেরা কোনও সংবাদপত্র প্রকাশনা করে না বা নিজেদের অন্য কোন সংবাদ মাধ্যম নেই।

সংবাদ সংস্থা ছাড়া দেশ-বিদেশের রেডিও টেলিভিশন শুনে/দেখে সেখান থেকে সংগৃহীত সংবাদ সংবাদপত্রে কখনও কখনও প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ রেডিও ও টেলিভিশনও সংবাদে উৎস হতে পারে। সংবাদ সংস্থাও এই উৎস কাজে লাগায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা সংস্থার তরফে অথবা ব্যক্তিগত স্তরে জনপ্রতিনিধি বা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অনেক সময় সংবাদপত্র অফিসে প্রেস রিলিজ বা প্রেস নোট পাঠিয়ে দেন। এগুলিও সংবাদের উৎস হিসাবে গণ্য। আবার, অনেক সময় একজন সাধারণ নাগরিক বা পথচারীও সংবাদের উৎস হতে পারেন। যেমন, কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটলে একজন অপরিচিত ব্যক্তি সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন করে সেটি জানিয়ে দেন এবং এমন কিছু তথ্য ও আভাস দিয়ে দেন যাতে একজন সাংবাদিক দ্রুত সেই নির্দিষ্ট ঘটনাস্থলে পৌঁছতে পারেন এবং ঘটনা-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

এছাড়া সংবাদের উৎস হচ্ছে—প্রকাশ বা প্রচারের জন্য সরকারিভাবে কোনও বিবৃতি যদি কোনও ব্যক্তি বা কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আসে। এই ধরণের সংবাদ বিবৃতিকে ইংরাজিতে প্রেস রিলিজ বা প্রেস নোট বা প্রেস হ্যাণ্ড-আউট বলা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলন বা প্রেস কনফারেন্সও সংবাদের অন্যতম এক বড় উৎস। কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তি বা কোন পদাধিকারী আগাম ঘোষণা করে আনুষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিক সম্মেলন ডাকতে পারেন। সাধারণত কোনও সুনির্দিষ্ট বক্তব্য জনসাধারণকে সংবাদ মাধ্যম মারফৎ জানানোর উদ্দেশ্যেই সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়। এই সম্মেলনে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরও আহ্বায়ক দিয়ে থাকেন। প্রেস কনফারেন্সকে নিউজ কনফারেন্সও বলা হয়।

এছাড়া আছে নিউজ ব্রিফিং। কোনও একটি বিষয়কে সংবাদ হিসাবে প্রকাশ বা প্রচার করার জন্য দায়িত্বশীল বা পদাধিকারী কোনও ব্যক্তি যখন সাংবাদিকদের কাছে বিষয়টি বিবৃত করেন ও বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন তখন সেটিকে বলা হয় নিউজ ব্রিফিং বা প্রেস ব্রিফিং। প্রেস ব্রিফিং অনেকটা প্রেস কনফারেন্সেরই মতো। পার্থক্য খুবই সামান্য। যেমন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী প্রেস কনফারেন্স করেন, আর তাঁদের সচিবালয়ের কোনও প্রতিনিধি বা মুখপাত্র করেন প্রেস ব্রিফিং। একটি দলের সভাপতি করেন প্রেস কনফারেন্স, আর তাঁর দলের সাধারণ সম্পাদক করেন প্রেস ব্রিফিং। আবার, এই সভাপতিই যখন দলের জাতীয় সম্মেলনের কার্যাবলী সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু বলেন, সেটা হয় প্রেস ব্রিফিং। একইভাবে, প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যখন কোনও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেন ও সম্মেলনের কার্যাবলী সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন তখন সেটা প্রেস ব্রিফিং বা যদি বিদেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী বা উচ্চ পদাধিকারীর সঙ্গে বৈঠকের পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের সে সম্পর্কে কিছু বলেন, সেটাও প্রেস ব্রিফিং। প্রেস কনফারেন্স ও প্রেস ব্রিফিং এর মধ্যে পার্থক্য যদি যৎসামান্য, প্রেস কনফারেন্স অনেক বেশি আনুষ্ঠানিক।

সংবাদের উৎস আরও আছে। যেমন, সাক্ষাৎকার বা ইংরাজিতে যাকে বলে ইন্টারভিউ। কোনও গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোনও আগাম-নির্ধারিত জায়গায় সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর কাছ থেকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনও বিষয় সম্পর্কে জানা ও প্রকাশনার মাধ্যমে তা পাঠক সাধারণকে জানানো হচ্ছে সাক্ষাৎকার। বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও আজকাল সাক্ষাৎকার খুব জনপ্রিয় হয়েছে। একান্ত সাক্ষাৎকার বা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ (অর্থাৎ যা কিনা একজন সাংবাদিকই পেরেছেন, অন্যেরা পারেননি) সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার খুব কদর বাড়ায়।

অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদ, পুরসভা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের উৎস। জেলায় জেলায় পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থায় জেলা পরিষদের নানা স্তরের যে সব আলোচনা সভা হয় সেগুলিও সংবাদের উৎস। সংসদের অধিবেশন যখন চলে তখন সরকারের সমস্ত নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত সর্বাগ্রে সংসদেই ঘোষণা করতে হয়। রাজ্যস্তরে বিধানমণ্ডলের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং অধিবেশন চলাকালীন সংসদ ও বিধানমণ্ডল সংবাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। তাছাড়া অধিবেশন চলাকালীন সময়ে সংসদে সমস্ত সাংসদকে ও বিধানমণ্ডলে/বিধানসভায় সমস্ত বিধায়ককে পাওয়া যায়। গোটা দেশের বিভিন্ন এলাকার নানারকম সংবাদের উৎস এইসব জনপ্রতিনিধি।

আদালতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উৎস। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার সুনানি ও বিচারকদের রায় প্রায়শই সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট/হাইকোর্টের কোনও কোনও মামলার রায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এবং এসব রায়ের ফলে সরকারকে কখনও কখনও তার নীতি বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়।

এছাড়া নানা বিষয়ে নানারকম সম্মেলন, আলোচনাসভা, আলোচনাচক্র বা বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তির বক্তৃতা বা কোন শিল্পপতি/বণিকসভার ভোজসভা বা কোনও দূতাবাসে নৈশভোজ সবই সংবাদের উৎস। কোনও বিষয়ে সমীক্ষা বা তদন্তের রিপোর্ট, গবেষণাপত্র, অভিযোগের বই, টাইম-টেবল, বিজ্ঞপ্তি/বিজ্ঞাপন, প্রচারপত্র, পোস্টার, এমনকি হিসাবের খাতাও সংবাদের উৎস হতে পারে।

সংবাদের উৎস বা 'সোর্স' খোদ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে একজন সাধারণ পথযাত্রী সকলেই বা যে কেউ হতে পারেন। এই উৎস-র বিশ্বাস অর্জন করা এবং তার গোপনীয়তা বজায় রাখা প্রতিটি সাংবাদিকদের নৈতিক দায়িত্ব। আবার, এই উৎস-র কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা সে বিষয়েও প্রতিটি সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে।

সংবাদপত্রের উৎস ডিজিটাল যুগে বিস্তৃত হয়েছে। একজন সাধারণ নাগরিকও রিপোর্টারের মতো খবর পাঠাতে পারে সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনে। একে বলা হচ্ছে সিটিজেন সাংবাদিকতা। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি তুলে ধরতে পারেন সিটিজেন সাংবাদিক হিসেবে।

সংবাদের প্রকারভেদ অর্থাৎ সংবাদ কত রকমের হয়। সংবাদের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করার আগে এটা মনে রাখতে হবে যে, সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে সংবাদ। সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় তার অধিকাংশই সংবাদ-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ সংবাদ হচ্ছে অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং সংবাদের সঙ্গে সংবাদ-ভিত্তিক যে সব বিষয় সেগুলির পার্থক্য বোঝানোর জন্য 'হার্ড' (Hard) নিউজ বা 'স্ট্রেইট' (Straight) নিউজ ও 'সফ্‌ট' (Soft) নিউজ বা 'ফিচার' (Feature) নামে সংবাদের প্রকারভেদ করা হয়েছে। 'হার্ড' নিউজ বা 'স্ট্রেইট' নিউজকে বাংলায় বলা যেতে পারে 'গরম' খবর বা 'সোজাসাপটা' খবর। প্রসঙ্গক্রমে 'তাজা' খবরও বলা যায়। আর 'সফ্‌ট' নিউজকে 'নরম' খবর বা সংবাদের ভিন্ন স্বাদের বিস্তার বলা যেতে পারে। 'হার্ড' নিউজকে কখনও কখনও 'স্পট' নিউজও বলা হয়। 'স্পট' মানে কোনও নির্দিষ্ট স্থান বা জায়গা। সুতরাং 'স্পট' নিউজ বলতে সংবাদপত্র বা সংবাদ মাধ্যমের তরফে সম্ভবত এটাই বোঝানোর অভিপ্রায় থাকে যে 'আমরা অকুস্থলে উপস্থিত থেকে' সংবাদটি পরিবেশন করছি।

ঐতিহ্যগতভাবে গরম খবর বা সোজাসাপটা খবর ঘটনা-দুর্ঘটনা-দুর্যোগ ভিত্তিক। যেমন, পুলিশ আইন ভঙ্গকারীদের/আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালানো, বা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করে মুখ্য-নির্বাচনী

অফিসার সরকারি ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দলগুলির আচরণবিধি ব্যাখ্যা করলেন, বা কোনও মন্ত্রী ইস্তফা দিলেন, বা পুলিশ কয়েকজন চোরাচালানকারীকে গ্রেফতার করল, বা কোনও পথদুর্ঘটনায় কয়েকজন ব্যক্তি হতাহত হলেন, বা কোনও পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘ বিশেষ কোনও গিরিশৃঙ্গ জয় করল, বা ভারত ক্রিকেট টেস্ট জিতল, বা মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্ত হল, বা স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোনও জনসভা আয়োজন করা হল, বা কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু জীবনহানি হল, বা শেয়ার বাজারে হঠাৎ কোনও নামী কোম্পানীর শেয়ার দর পড়ে গেল, বা কোনও চিত্রাভিনেতা পুরস্কৃত হলেন, বা বিশ্বসুন্দরী সিনেমায় অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিলেন, বা নামী কোনও ব্যক্তির জীবনাবসান হল ইত্যাদি। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় দৈনন্দিন সংবাদ। এই সংবাদই গুরুত্ব পায় সর্বাগ্রে। কারণ 'হার্ড' নিউজ বা গরম/সোজাসাপটা খবর হচ্ছে নির্মম সত্য। আর এই নির্মম সত্যকে পাঠক/শ্রোতা/দর্শকদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়াটাই সাংবাদিক বা সংবাদ মাধ্যমের প্রথম দায়িত্ব। আর এই সংবাদ পরিবেশন করার ক্ষেত্রে আবেদন হবে প্রত্যক্ষ ও অকপট। বিলম্বহীনতাও এই সংবাদ পরিবেশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

তাজা বা গরম খবর যদিও মূলত দৈনন্দিন খবর এবং নতুন খবর, কোনও কোনও সময়ে অজানা পুরনো তথ্যও গরম বা তাজা খবরের মর্যাদা পায়। যেমন, কোনও বড় রাজনৈতিক নেতা বা কোনও শিল্পপতির মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর যদি জানা যায় যে তিনি মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি কোনও সমাজকল্যাণ সংস্থার নামে উইল করে দিয়েছেন, তখন সেটিও তাজা হিসাবেই গণ্য হবে। অবশ্য মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ভিন্নস্বাদের সংবাদ বা নরম খবর/ফিচার হিসাবেও এই তথ্যটি পরিবেশন করা যায়। সংবাদটি পাঠককে জানানো কতটা জরুরি, আদৌ বিলম্ব করা উচিত হবে কিনা বা সংবাদটির রচনাশৈলী কেমন হবে ইত্যাদি বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে সংবাদটি গরম না নরম—কী হিসাবে পরিবেশিত হবে।

প্রতিদিনের অজস্র ঘটনাবলির যেগুলি তাজা সংবাদ হিসাবে চিহ্নিত, বিবেচিত ও প্রকাশিত হয় তা কিছু দিন আগে থেকেই সাংবাদিকদের জানা থাকে। কারণ, এগুলি হয় পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী। যেমন কোনও বড় জনসভা, বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠক, প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ, রাষ্ট্রপতির রাজ্যসফর, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে চ্যারিটি ম্যাচ ইত্যাদি বিষয় তো পূর্বঘোষিত, আগে থেকেই জানা। সুতরাং এসব বিষয় ও সম্পর্কিত তথ্যসংক্রান্ত সংবাদ নির্ধারিত দিনে সংগৃহীত হবে এবং সেদিনই বা তার পরদিনই প্রকাশিত হবে। এগুলি সবই তাজা বা গরম খবর। আবার, যেহেতু এগুলি পূর্বনির্ধারিত ও পূর্বঘোষিত, নির্ধারিত দিনের আগেই এসব বিষয় সংক্রান্ত আগাম খবরও করা যায়। তবে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রেই আগাম খবর লেখা হয়। অনেকটা বড় কোনও নাটক অভিনীত হবার আগে তার অংশবিশেষ মঞ্চস্থ করার ধাঁচে অথবা 'পরবর্তী আকর্ষণ' বলে কোন সিনেমার কিছু অংশ 'ট্রেলার' হিসাবে দেখানোর কায়দায় এসব আগাম খবর করার রেওয়াজ আছে। এ ধরণের খবরকে বলা হয় 'কার্টেন রেইজার'। প্রস্তাবিত রাজনৈতিক বৈঠক বা দলীয় অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রণকৌশল পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে দলের তৃণমূলস্তরে ইতোমধ্যেই তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে কিনা তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'কার্টেন রেইজার' হতে

পারে। আর এ ধরনের খবর তাজা বা গরম হিসাবেই বিবেচিত ও পরিবেশিত হয়। শুধু রাজনীতি-সংক্রান্ত খবরই নয়, যে কোনও বিষয় নিয়ে নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'কার্টেন রেইজার' সংবাদ লেখা যায়।

যে কোনও বড় বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের অনুসারী সংবাদ বা 'ফলো-আপ' নিউজ লেখা হয়। অর্থাৎ প্রথম দিন কোনও একটি বিষয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও একই বিষয়ে নানা অজানা বা নতুন তথ্য সংগ্রহ করে পরের দিন (বা প্রয়োজনে আরও কয়েকদিন) আরও সংবাদ লেখা হয়। এ ধরনের সংবাদকে অনুসারী বা অনুসরণকারী সংবাদ বলে। কোনও বড় দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ড, সন্ত্রাসবাদী হামলা, মহামারী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সর্বদাই অনুসারী সংবাদ লেখা যায়। অনুসারী খবরও তাজা খবর।

এতো গেলো পূর্বঘোষিত বা আগাম-জানা বিষয়-সংক্রান্ত তাজা বা গরম (হার্ড নিউজ) খবরের কথা। এছাড়া এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই জানা যায় না। এসব ঘটনা আচম্বিতেই ঘটে। এগুলি প্রধানত দুর্ঘটনা। যেমন, ট্রেন দুর্ঘটনা, বিমান ভেঙে পড়া, পথ দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, নৌকাডুবি ইত্যাদি। এছাড়া কিছু ঘটনা ঘটে যেগুলিকে দুর্ঘটনা বলে না, কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে আগে থেকে কিছু জানাও যায় না। যেমন, মিছিলের ওপর পুলিশের গুলিচালনা, বিক্ষোভ আন্দোলনের হিংস্র পরিণতি, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, কোনও নামী ব্যক্তির মৃত্যু, আচমকা হরতাল, দু'দল ছাত্র বা যুবকের মারামারি, কোনও প্লেন ছিনতাই (হাইজ্যাক) ইত্যাদি হঠাৎ-ঘটা ব্যাপারগুলিও তাজা বা গরম খবর। এসব খবর লেখার ক্ষেত্রে আবেদন হবে স্পষ্ট, সহজ সরল সোজাসাপটা।

নরম খবর বা 'সফট নিউজ'-এর মধ্যে পড়ে যেসব খবর বা দু'দিন পরে ছাপলে ক্ষতি নেই। আর আছে 'ফিচার'। ফিচার ভিন্ন স্বাদের, ভিন্নশৈলীর সংবাদ-লিখন যা মানুষের মন কাড়ে, যা জানতে মানুষ উৎসুক, আগ্রহী এবং যা জেনে মানুষ উপভোগ করে। এসব খবর যতটা না সুনির্দিষ্ট ঘটনাভিত্তিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবতাধর্মী মূল্যভিত্তিক। কোনও ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত আকর্ষণীয় জীবনবৃত্তান্ত বা রেখাচিত্র (প্রোফাইল), ব্যঙ্গরসাত্মক বা হাস্যরসাত্মক বৃত্তান্ত, মানুষের জীবনযাপনের প্রচলিত গতিধারা ও আদবকায়দার কাহিনী (লাইফ স্টাইল), নানা বিষয়-সংক্রান্ত পর্যালোচনা ও সমালোচনা, সামাজিক সংবাদ, ভ্রমণ ও বিনোদন বিষয়ক লেখা বা বিচিত্র বিষয়ের সংবাদনামা ও হালকা মেজাজের বৃত্তান্তগুলিই সাধারণত নরম খবর বা ফিচার হিসাবে বিবেচিত। তাৎক্ষণিকতার বা গুরুত্বর দিক দিয়ে ভাবলে নরম খবরের স্থান গরম খবরের চেয়ে এক ধাপ নিচে। নরম খবর সাধারণত বৈচিত্রপূর্ণ বর্ণময় বিবরণ বা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ যা গরম খবরকে ভিত্তি করেও হতে পারে যা গরম খবর ছাড়া অন্য বিষয়ভিত্তিকও হতে পারে।

এই ব্যাখ্যা-বিবরণ-বিশ্লেষণমূলক নরম খবর বা ফিচার বৃহত্তর চিত্রপটের আপাত নরম সংবাদকে যেমন ফুটিয়ে তোলে, তেমনি শিক্ষামূলক তথ্যও পরিবেশন করে এবং একই সঙ্গে উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও রচনাশৈলীর পারদর্শিতায় পাঠকদের আনন্দ বর্ধন করে। নরম খবরের বিষয়ের অন্ত নেই। দৃশ্যমান জগতের সমস্ত বিষয় নিয়েই নরম খবর লেখা যায়, লেখা হয়। আবার, যা অদৃশ্য অর্থাৎ চোখের দেখা নয় বা মননের জগৎ তা নিয়েও লেখা হয় নরম খবর বা ফিচার। এই নরম খবর দু'ধরনের। সংবাদধর্মী ও মানবতাধর্মী মূল্যভিত্তিক বা মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ।

সংবাদধর্মী নরম খবর বা ফিচার কিন্তু অনুযায়ী সংবাদ বা 'ফলো আপ নিউজ' নয়। পারম্পর্য ও

ধারাবাহিকতা ও মূল সংবাদের পটভূমি উদ্‌ঘাটন অনুসারী সংবাদের অনন্য উপাদান। ''কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে''-র উত্তর সম্বলিত গরম বা সোজাসাপটা খবর লেখার পদ্ধতির তুলনায় সংবাদধর্মী নরম খবর লেখার ভঙ্গিটা অন্যরকম। ব্যক্তি বা ব্যক্তির কার্যকলাপ, সমসাময়িক ঘটনা, স্থানীয় বা আঞ্চলিক আবেদনের কোনও বিষয় বা বিষয়ের গুরুত্ব ও তার ব্যাখ্যা বা ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা—যা বাঁধা গতের বাইরে এবং একটু আলাদা—সংবাদধর্মী ফিচার বা নরম খবরের বিশেষত্ব।

সংবাদধর্মী বা সংবাদভিত্তিক ফিচার প্রকাশিত সংবাদে পরিবেশিত তথ্যের অতিরিক্ত কিছু কথা বলবে, যা প্রচলিত রীতিধারা থেকে নিশ্চিতভাবে ভিন্নস্বাদের এবং আনন্দদায়ক। এ ধরনের ফিচার বা নরম খবর হবে সৃজনশীল ও অধ্যাত্মীয় (বা চিত্তনিষ্ঠ, যার বিপরীত হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ) যার প্রধান কাজ হচ্ছে পাঠককে তথ্য জানানো ও আনন্দ দান করা। সংবাদধর্মী নরম খবরের সঙ্গে সোজাসাপটা গরম বা সোজাসাপটা খবর লেখার পদ্ধতির তুলনায় সংবাদধর্মী নরম খবর লেখার ভঙ্গিটা অন্যরকম। ব্যক্তি বা ব্যক্তির কার্যকলাপ, সমসাময়িক ঘটনা, স্থানীয় বা আঞ্চলিক আবেদনের কোনও বিষয় বা বিষয়ের গুরুত্ব ও তার ব্যাখ্যা বা ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে লক্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা—যা বাঁধা গতের বাইরে এবং একটু আলাদা—সংবাদধর্মী ফিচার বা নরম খবরের বিশেষত্ব।

সংবাদধর্মী বা সংবাদভিত্তিক ফিচার প্রকাশিত সংবাদে পরিবেশিত তথ্যের অতিরিক্ত কিছু কথা বলবে, যা প্রচলিত রীতিধারা থেকে নিশ্চিতভাবে ভিন্নস্বাদের এবং আনন্দদায়ক। এ ধরনের ফিচার বা নরম খবর হবে সৃজনশীল ও অধ্যাত্মীয় (বা চিত্তনিষ্ঠ, যার বিপরীত হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ বা বিষয়নিষ্ঠ) যার প্রধান কাজ হচ্ছে পাঠককে তথ্য জানানো ও আনন্দ দান করা। সংবাদধর্মী নরম খবরের সঙ্গে সোজাসাপটা গরম খবরের এখানেই পার্থক্য। এ ধরনের নরম খবরকে কিন্তু সমকালীনতা বা সময়োপযোগিতা বজায় রাখতে হবে, এবং এ ধরনের খবরে কল্পনাপ্রবণতার সুযোগ খুবই কম। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্য কোন বাধানিষেধ নেই।

মানবতাধর্মী-মূল্যভিত্তিক বা মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ নরম খবর বা ফিচার যা যা মানুষের মন কাড়ে বা যা মানুষের মনক নাড়া দেয় তাই নিয়েই লেখা হয়। এ ধরনের সংবাদে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায় মানুষ। এতে মানুষ থাকবে এবং মানুষের সংবেদনশীল মন যাতে নিশ্চিতভাবে সাড়া দেবে সে ধরনের একটি কাহিনী বা বৃত্তান্ত থাকবে, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। এই মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ নরম খবরে থাকবে একটি সুনির্দিষ্ট আখ্যানের রূপরেখা, থাকবে কয়েকজন ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র। গল্পের মতো এই খবরের শুরু, মধ্যর্যায় ও সমাপ্তি থাকবে। অনেক বিশেষজ্ঞ মতে, এ ধরনের নরম খবর বা ফিচারের অবস্থান অনেকটা খবর ও ছোটগল্পের মাঝামাঝি কোনও একটা জায়গায়। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের খবর হচ্ছে ঘটনাভিত্তিক ছোটগল্প। এবং তা সরাসরি বেলা। এ ধরনের খবরের মূল উপাদান :

- **মানবিক আবেদন**—এই ধরনের নরম খবর বা আখ্যান মানুষের মনকে নাড়া দেবে।
- **ঘটনা বা বাস্তব অবস্থা**—এই আখ্যান এমন ঘটনা বা বাস্তব অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করবে যাতে মানুষের আগ্রহ আছে বা যা মানুষের কাছে আকর্ষণীয়।
- **ব্যক্তিত্ব**—এ ধরনের আখ্যানে ব্যক্তিত্ব যুক্ত হয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। অসামান্য বা অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের কথা থাকলে এই আখ্যান আরও বেশি গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।

● **দৃষ্টিকাণ**—বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত হলে আখ্যানের বাঁধুনি মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।

● **গতিশীলতা**—এ আখ্যান হবে প্রাণবন্ত। আখ্যানে উল্লিখিত যে সব ব্যক্তিত্ব, তাঁদের কর্মচঞ্চলতায় আখ্যা যেন প্রাণবন্ত ও গতিশীল হয়ে ওঠে।

● **অনন্যতা ও সর্বজনীনতা**—আখ্যানে যেন অনন্যতা বা ভিন্নতা থাকে, আবার একই সঙ্গে তার যেন একটা সর্বজনীন আবেদন থাকে।

● **গুরুত্ব**—কোনও বিষয় বা ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য, নৈকট্য, সময়োপযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা থাকলে এ ধরনের আখ্যানের গুরুত্ব বাড়ে।

● **উৎসাহবর্ধন**—আখ্যান যেন মানুষের মনকে নাড়া দেয়, ঠিক যেমন আখ্যানের বিষয়টি সাংবাদিকের মনকে নাড়া দিয়েছিল।

মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার বা আখ্যানের বিষয় বা চরিত্রের নানা রূপের যে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়, পাঠক যেন সেই আবেগ ও অনুভূতির ব্যাপারে একাত্ম বোধ করে। আনন্দ, বিষাদ, ভয়, উত্তেজনা, কৌতুক, রাগ, সহানুভূতি ইত্যাদি কত রকমই না আবেগ ও অনুভূতি এ ধরনের ফিচারে ফুটে ওঠে। এ ব্যাপারে পাঠকের একাত্মবোধ এমনই হয় যে, পাঠক যেন নিজেই আখ্যানে বর্ণিত বিষয়ের এক সক্রিয় অংশীদার। উক্ত নাটক বা ছোটগল্পের সে যেন নিজেই একটি চরিত্র। রচনাশৈলী বা লিখনভঙ্গি ও অনন্য বা অদ্ভুত বিষয় বা চরিত্র নির্বাচনের ওপরই মূলত নির্ভর করে এ ধরনের ফিচার বা আখ্যানের গ্রহণযোগ্যতা। মানুষ নিজে যে ব্যাপারে জড়িত, তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী যে ব্যাপারে জড়িত সে বিষয়ে সে জানতে চায়। সে নিজের কথা জানতে-শুনতে চায়। সে অপরের কথা জানতে-শুনতে চায়। না বলা কথা, না-জানা কাহিনী শুনতে/জানতে চায়। এ ধরনের ফিচার বা নরম খবরের বিন্যাস সাধারণত বৃত্তান্তমূলক। অনেকটা গল্পকথনের রূপ। আর সেই কারণেই এ ধরনের সংবাদের সময়োপযোগিতা বহুলাংশেই গৌণ হয়ে যায়। বাস্তবিকপক্ষে মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ অনেক আখ্যান বা ফিচারের আকর্ষণ কালাতীত বা চিরন্তন।

অনেক ভালো ভালো আকর্ষণীয় মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচারের উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ—বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি বা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা, বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা (যেমন থ্যালাসেমিয়াগ্রস্ত বা প্রতিবন্ধী শিশু)। এছাড়া আছে বড় বড় বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট নজর এড়িয়ে যাওয়া কাহিনী, কোনও নামী মানুষের ছেলেমানুষী শখ বা বিশেষ কোন জিনিসের প্রতি লোভ। বহুরূপী, মুশকিল আসান, ভালুক নাচ, বাঁদর খেলা, ফুটপাথের আর্টিস্ট, শিশু শ্রমিক ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে লেখা যায় মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার। এ ধরনের ফিচারের বিষয়ের কোনও অন্ত নেই।

সংবাদভিত্তিক ও মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ ফিচার ছাড়াও আরও কয়েক ধরনের ফিচার আছে। যেমন, সমীক্ষা, সমালোচনামূলক ফিচার, বর্ণময় বর্ণনামূলক ফিচার, মতামতধর্মী ফিচার, নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানভিত্তিক ফিচার, আবহাওয়া বা বিশেষ ঋতু সম্পর্কিত ফিচার, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাভিত্তিক ফিচার, বিজ্ঞানভিত্তিক ফিচার, পটভূমি বা প্রেক্ষাপটভিত্তিক ফিচার, সাক্ষাৎকারভিত্তিক ফিচার, ভ্রমণমূলক ফিচার, ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক ফিচার, খেলাধূলা-সংক্রান্ত ফিচার, ব্যক্তিভিত্তিক ফিচার, জনসেবামূলক ফিচার, ধর্ম বা রাজনীতিভিত্তিক ফিচার ইত্যাদি।

লিখনশৈলী ও লেখার প্রণালী বিষয় বিশেষে ভিন্ন। তার ওপর আছে ফিচার লেখকের পছন্দ ও দৃষ্টিভঙ্গি। কোনও বিষয়ে ফিচারের ভূমিকা বা মুখবন্ধ বা সূচনা কী হবে তারও কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবুও সাধারণভাবে ফিচারের ক্ষেত্রে কয়েকরকম মুখবন্ধের প্রচলন আছে। যেমন—সারাংশ মুখবন্ধ (সামারি লীড), প্রত্যক্ষ মুখবন্ধ (ডাইরেক্ট লীড), প্রশ্নমূলক মুখবন্ধ (ক্যোইস্চন লীড), বর্ণনামূলক মুখবন্ধ (ডেসক্রিপটিভ লীড), বিস্ময় বা চমকধর্মী মুখবন্ধ (টিজার লীড), উক্তিমূলক মুখবন্ধ (কোটেশান্ লীড), অদ্ভুত বা উদ্ভট মুখ বন্ধ (ফ্রীক্ লীড) ও সম্মিলিত মুখবন্ধ (কম্বিনেশন লীড)।

যে ধরনেরই ফিচার হোক আর যেমনই হোক সে ফিচারের মুখবন্ধ বা সূচনা, সবরকম ফিচারেরই গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে কয়েকটি শর্তের ওপর। সেগুলি হচ্ছে ভাষার গুণগত মান, যুক্তিগ্রাহ্যতা , সামাজিক চেতনাবোধ, সত্যতা মানবিকতা ও সামগ্রিক সামঞ্জস্য বা সমন্বয়।

খবর লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন (Changing Pattern of News Coverage) : খবর লেখার প্রকরণ বা রীতি-পদ্ধতি ক্রমাগত বদলাচ্ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতি, পরিবর্তিত রুচি পছন্দ প্রতিযোগিতা ইত্যাদির ফলেই প্রতিবেদন প্রচারে অবিরাম পরিবর্তন।

এমন একটা সময় ছিল, যেমন ধরা যাক সদ্যসমাপ্ত বিশ শতকের সাতের দশকের শুরু পর্যন্ত, যখন সংবাদপত্র সংবাদ সরবরাহের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইথার তরঙ্গে বাহিত রেডিও স্টেশন প্রচারিত নিউজ বুলেটিন। সেটাও ছিল দিনে রাতে হাতে-গোনা মাত্র কয়েকবার। এখন যাঁরা প্রৌঢ় তাঁদের অনেকেই সেই আমলে প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়টার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন যখন রেডিওর 'নব্' বা চাবি ঘোরালে শোনা যেতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কয়েকটি পরিচিত কণ্ঠস্বর—''আকাশবাণী, খবর পড়ছি নীলিমা সান্যাল/বিজন বসু'' অথবা, পরবর্তী কোনও কালে, ''খবর পড়ছি দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।'' তখনও দূরদর্শন চালু হয়নি। নানারকম চ্যানেলের নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা সংবাদ পরিবেশনের রেওয়াজও তাই গড়ে ওঠেনি। খবর তখন ছিল অনেক সোজাসুজি এবং খবরের কাগজে ঘটনা দুর্ঘটনা, রাজনৈতিক কার্যক্রমের গতিপ্রকৃতি, খেলাধূলা, রাষ্ট্রশাসন ইত্যাদি প্রায় সবরকম খবরেই সংবাদপত্রগুলি শুধুমাত্র মূল ঘটনা ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার বিশ্লেষণ বা টীকা-টিপ্পনীসহ তার ব্যাখ্যা করেই সন্তুষ্ট থাকত। তখনকার দিনে পাঠকও সম্ভবত তার বেশি কিছু আশাও করতেন না। কিন্তু এখন যতই দিন যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই বদলাচ্ছে এবং সংবাদপত্রগুলিকেও পাল্লা দিতে হচ্ছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদ চ্যানেলগুলির সঙ্গে। তাই কেবলমাত্র মূল খবরটুকু সরবরাহ করে আর কিছু কিছু বিশ্লেষণ পরিবেশন করেই যদি তার কাজ শেষ করতে চায় তাহলে সংবাদপত্রের বাজার হারানোর সম্ভাবনা খুবই প্রবল।

এই অবস্থায় যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছে। এখন সংবাদপত্রগুলি তাদের সংবাদ পরিবেশনের আদলও পালটে ফেলেছে। মূল খবরের সঙ্গে বেশি বেশি করে যুক্ত হচ্ছে তার বিশ্লেষণ, তার পটভূমি, তার ভবিষ্যৎ নির্দেশে এবং তার মন্তব্যমূলক ব্যাখ্যান। যুক্ত হচ্ছে ঘটনার থেকেও তার মানবিক দিকগুলিকে বেশি করে দেখানোর জন্য সংবাদ-সম্পর্কিত অকথিত কাহিনী। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। হয়তো কোনও রাস্তার পাশের জবরদখলকারীদের বে-আইনী বাড়িঘর, দোকান ইত্যাদি ভেঙে দিয়ে রাস্তা চওড়া করার একটা সরকারি পরিকল্পনা নেওয়া হল। পরিকল্পনা মাফিক পুলিশ-প্রশাসন বুলডোজার, লরি, লোকের ইত্যাদি নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে কাজ শুরু করল। সংবাদপত্র আগের মতোই, ঐতিহ্য অনুযায়ী, ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ দিল।

যেমন, কতগুলি ঘরবাড়ি ভাঙা হল, কতজন বাধা দিতে এসে গ্রেফতার হল, কতজন বা পুলিশের লাঠিতে আহত হল, উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলির কোথাও কোনও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হল কি না, সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এ বিষয়ে কী বলল বা কী করল ইত্যাদি। একই সঙ্গে দেখা গেল, এসব খবরের পাশাপাশি আলাদা একটি খবরে তুলে ধরা হল কেমন করে কয়েকটি শিশু ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করে আনছে তাদের পড়াশুনার বা খেলাধূলার সামগ্রী বা কোনও মা তার সন্তানদের খেতে দেওয়ার অতি সাধারণ তৈজসপত্র ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে।

এরকমভাবেই খবরের অন্যান্য দিকগুলিতেও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে সংবাদপত্র ক্রমশই আরও ব্যাপক ও মনোহারী হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশবিদেশের বিভিন্ন খেলাধূলা আজকাল সরাসরি টিভির পর্দায় মানুষ দেখত পায় বলে সেসব খেলাধূলার ফলাফলের থেকেও সংবাদপত্র বেশি করে আলোচনা করছে সেসব খেলার নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলি, তাদের পারিবারিক সমস্যা থেকে শুরুকরে তাদের ভাবমূর্তি বিপণন বা ইমেজ মার্কেটিং পর্যন্ত। যে সমস্ত বিষয়ে মানুষকে নিত্যদিনই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় খবরের কাগজে সেগুলি আজকাল অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, পৌরসেবা বা পুর-পরিষেবা, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি নিজে আজকাল বিস্তারিত খবর পরিবেশন করা হচ্ছে। এবং সে কারণেই, পরিবর্তিত প্রয়োজনবোধে, খবর লেখার প্রকরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩.৩.১.১ সংবাদের রচনাশৈলী বা উপস্থাপনা (Style and Approach)

খবর লেখার পদ্ধতি বা শৈলী নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। অথচ বলা যায়, বিভিন্ন পদ্ধতির খবর লেখার নমুনা নিয়ে গবেষণা করে কয়েকটি নির্দিষ্ট শৈলীকে আদর্শ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। খবর অবশ্য ঠিক কীভাবে লেখা যেতে পারে তা নিয়ে কখনও শেষ কথা বলা যায় না। কারণ, যতই নতুন নতুন সাংবাদিক আসবেন ততই নতুন নতুন ভাবে খবর লেখার চেষ্টা চলতেই থাকবে। প্রতিটি সাংবাদিকের লেখ াই তাঁর স্বকীয়তায় বিভিন্ন সময়ে দিক্‌নির্দেশ করতে পারে এবং তা করে চলেছেও। কারণ, আমরা সকলেই জানি— "Style is the man" অর্থাৎ শৈলীই হচ্ছে ব্যক্তির উৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ।

এসব সত্ত্বেও সাংবাদিকতা শুরু করার মুখে কয়েক রকম লেখার পদ্ধতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা খুবই আবশ্যক। একটি একটি করে সেগুলির কথা বলা যাক।

প্রথমেই আসবে সেই চিরায়ত বা সাবেকি শৈলী যার গড়ন অনেকটা ইংরাজি "T" এর মতো। অর্থাৎ খবরের শুরুর দিকে মূল বক্তব্যটি বা খবরটি প্রথম একটি বা দুটি প্যারাগ্রাফের মধ্যে বন্দী করার কাঠামো। যেমন, "অনেক আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে আজ প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে রাজ্যে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। যদিও বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ১০ জন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন এবং গ্রেফতার করা হয়েছে ৫০ জনকে"।

এরকমভাবে লেখা খবরে মূল বক্তব্যটি রাখা হল একেবারে শুরুর প্রথম একটি বা দুটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ এবং খবরের বাকি অংশ—যেমন, ভোটদানের শতকরা হার, ঘটনা-দুর্ঘটনার বিশদ বিবরণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি পরপর প্যারাগ্রাফ সাজিয়ে লেখা হয়।

সংবাদ রচনার নানা কাঠামো বা নির্মিতিকে বিশেষজ্ঞরা জ্যামিতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবৃত করেছেন। এই জ্যামিতিক নির্মিতি কৌশল জানা থাকলে সংবাদ পরিবেশনের সঠিক রীতিটি বা বিন্যাসভঙ্গিটি যথাযথভাবে আয়ত্ত করা যায়। এই সংবাদ-বিন্যাসভঙ্গিকে কয়েকটি জ্যামিতিক ছকে ভাগ করা যায়। সোজা কথায় সংবাদটিকে কীভাবে সাজানো হবে—প্রথমে বা মুখবন্ধে কী লেখা হবে, তারপরই বা মধ্য অংশেই বা কী থাকবে, আর সব শেষে বা উপসংহারেই বা কী লেখা হবে? এই সংবাদ সাজানোর কায়দা বা বিন্যাসভঙ্গির জ্যামিতিক ছক হচ্ছে পিরামিড, উল্টো পিরামিড, ঘটনাক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স, পিরামিড ও সমান্তরাল বাক্সের সমন্বয়, রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয়, বাড়ি-ঘড়ি সদৃশ, ডিম্বাকৃতি ইত্যাদি।

পিরামিড (Pyramid) : ছোটখাট সাধারণ মানের খবরগুলি প্রধানত পিরামিডের মতো আকৃতিরই হয়। এসব খবরে মুখত একটি বিষয়ই থাকে এবং এর মুখবন্ধ বা ইনট্রোও হয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গুরুত্ব অনুযায়ী সংবাদের বাকি অংশটুকু ধাপে ধাপে যুক্ত হয় ও কাহিনী বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু যেহেতু খবরের বক্তব্যটিই ছোট এবং মূল খবরটি প্রথমেই থাকছে, তাই প্রয়োজনবোধে লিখিত খবরটির নিচের অংশ ইচ্ছামতো ছোট করা যায়। এই নিচের অংশেই থাকে মূল বিষয় সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি খবর যা ক্রমেই বিস্তারলাভ করে। প্রয়োজনে এই নিচের অংশকে ছোট করা হয়। কিন্তু খবরের কাঠামোটা জ্যামিতিক কল্পনায় পিরামিডের মতোই থাকে (চিত্র ১)।

চিত্র-১

উল্টো পিরামিড (Inverted Pyramid) : ঘটনার ধারাবাহিকতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্রম অনুসারে ছোটগল্পের শেষ পরিণতিতে বা উপসংহারে আসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি। গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে বিন্যাসের ধাঁচটি ছোটগল্পের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যটি খবরের শুরুতেই বলতে হবে। এবং বাকিসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সাজানো হবে তাৎপর্যের অধঃক্রম অনুযায়ী। সবচেয়ে কম তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি আসবে সংবাদের সর্বশেষ পর্যায়ে। এ ধরনের নির্মিতিকৌশল বা বিন্যাসভঙ্গির নাম জ্যামিতিক কল্পনায় উল্টো পিরামিড। সংবাদলিখনের এই কাঠামোটি ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত ও সবচেয়ে নিরাপদ। খবর লেখার সনাতন ধারায় এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ কাঠামো বলে বিবেচিত। সংবাদপত্রের মুদ্রণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে হয়ে থাকে। সুতরাং সংবাদ লিখতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে। এবং সর্বদাই সাংবাদিককে সচেতন থাকতে হবে পরিবেশিত সংবাদের সত্যতা, সময়োপযোগিতা ও পাঠকের আগ্রহ ধরে রাখার ক্ষমতা সম্পর্কে।

এইসব মাথায় রেখেই উল্টো পিরামিডের কাঠামোর কল্পনা। পিরামিডের সমস্ত শক্তি তার অধোভাগ বা তলদেশে। উল্টো পিরামিড কাঠামোয় সংবাদ লেখার মূল কারণ হচ্ছে এই যে, সংবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় শক্তি হচ্ছে তার শুরুর কথাতেই। অর্থাৎ খবরে সূচনাতেই (ইন্ট্রো বা লীড) একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে কিছুটা বিবরণ দেওয়া হয়। এই লীড (সূচনা বা মুখবন্ধ) একটি অনুচ্ছেদেও হতে পারে

অথবা, প্রয়োজনে, তিন চারটি অনুচ্ছেদেও হতে পারে। অর্থাৎ খবরের প্রথম দিকটি হয় প্রসারিত বা ছড়ানো। এবং তারপর ধীরে ধীরে কাহিনীকে গুটিয়ে আনা হয় ও প্রয়োজনে নিচের অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

উল্টো পিরামিড কাঠামোয় লেখা সংবাদের তিনটি অংশ বা পর্যায় থাকে। প্রথমে লীড বা সূচনা। যে কোনও সংবাদের প্রথম কয়েকটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ হচ্ছে সেই সংবাদের লীড। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সংবাদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য লীডের মধ্যে থাকবে। মোটামুটি এই লীড থেকেই পুরো সংবাদটি জানা যায়। সংবাদ সংস্থা প্রেরিত কোনও কোনও সংবাদের লীড অনেক সংবাদপত্রেই সংক্ষিপ্ত সমাচার হিসাবে মুদ্রিত হয়। দ্বিতীয় বা মধ্যমাংশে লীডের সমর্থনে বা লীডের জোর বাড়ানোর জন্য সেসব বিষয় নিয়ে লেখা হবে যা যথেষ্ট অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অপরিহার্য নয়। যেমন, কোনও সংবাদের সূচনায় যদি খুন সম্পর্কে পারিবারিক কলহকে কারণ হিসাবে লেখা হয়ে থাকে, তাহলে মধ্যমাংশে সেই কলহ-সংক্রান্ত সাক্ষীর বক্তব্য, মৃতদেহটি ঠিক কী অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তার ওপর কতগুলি ক্ষতচিহ্ন ছিল, বাড়িতে কেউ ছিল কিনা, কজন ঝি-চাকর সেই বাড়িতে কাজ করে ইত্যাদি বিষয়গুলি ইঙ্গিতপূর্ণ বিবেচনায় থাকবে। কিন্তু এসব খুঁটিনাটির সবগুলিই যে অপরিহার্য তাও নয়। তৃতীয় বা শেষ অংশকে বলা হয় 'ঠিক তত গুরুত্বপূর্ণ নয়' অর্থাৎ এই অংশটিকে যে কোনও সময়ে বাদ দেওয়া হয়। ইংরাজিতে খবরের এই অংশটিকে বলা হয় 'ইক্স্‌পেণ্ডেব্‌ল্ এণ্ডিং' অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপসংহারটিকে ত্যাগ করা যায় বা বাদ দেওয়া যায়। যেমন, খুনের খবরের ক্ষেত্রে গত দু'বছরে বা পাঁচ বছরে এই শহরে কতগুলি খুন হয়েছে, পুলিশ কতগুলি খুনের কিনারা করতে পেরেছে, পারিবারিক কলহজনিত খুনের সংখ্যাই বা কত ছিল ইত্যাদি বিষয় যেগুলি বাদ দিলে মূল খবরের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হয় না। খবরের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেই এগুলিকে বাদ দেওয়া যায়।

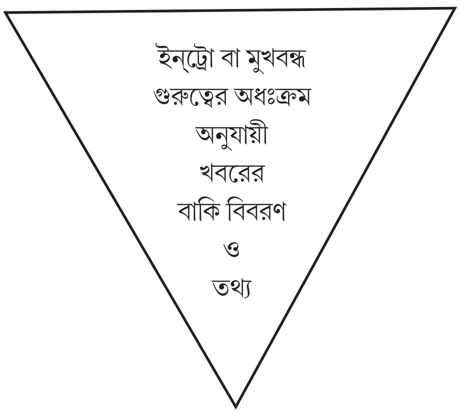

চিত্র-২

উল্টো পিরামিড কাঠামোই সাধারণত গ্রহণযোগ্য। অবশ্য একশ বছর আগে বা তারও আগে যে কাঠামো প্রচলিত ছিল তা হল ঘটনাক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্সের মতো। বাস্তব সমস্যা এড়াতেই শুরু হয় উল্টো পিরামিড। টেলিগ্রাফ সার্ভিসের অবিশ্বস্ততার বা অনিশ্চয়তার ফলে তারযোগে পাঠানো খবরের সবটুকু খবরের কাগজে পৌঁছতই না। মাঝপথে কেটে যেতো। এই সমস্যা এড়ানোর জন্য উল্টো পিরামিড কাঠামো চালু করা হয়। যার ফলে যে কোনও খবরের সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি প্রথম দু-তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই বলা হয়ে যেতো। টেলিগ্রাফের গোলমালের ফলে খবরের সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিই প্রথম দু-তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই বলা হয়ে যেতো। টেলিগ্রাফের গোলমালের ফলে খবরের বাকি অংশটুকু না পাওয়া গেলেও খুব একটা ক্ষতি হত না আজকের দিনে অধিকাংশ খবরই উল্টো পিরামিড বিন্যাসে পরিবেশন করা হয়। এতে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংবাদের প্রথম ভাগে থাকে আর সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি থাকে সর্বশেষে। এ ধরনের সংবাদ লিখনভঙ্গি সাংবাদিক ও পাঠক উভয়েরই খুব পছন্দ। পাঠক যেহেতু বেশিরভাগই সংবাদপত্র পড়ার সময় খুব ব্যঙ্গ করে

থাকেন, তাই তিনি চান যে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদও যেন খুব অল্প সময়ে পড়ে ফেলা যায়। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও টেলিভিশনে অবশ্য এ ধরণের সংবাদ বিন্যাস সবসময় শ্রোতা-দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যেহেতু কোনও খবরই সাধারণত এক বা দুমিনিটের বেশি হয় না তাই বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সংবাদ বিন্যাস ভিন্ন রূপের হতেই পারে। তবুও এধরনের বিন্যাস সকলেই পছন্দ করেন। কারণ শুরুতেই খবরটি জানা হয়ে গেলে, পরিহার্য বাকি অংশ কেউই আর দেখতে চান না (চিত্র ২)।

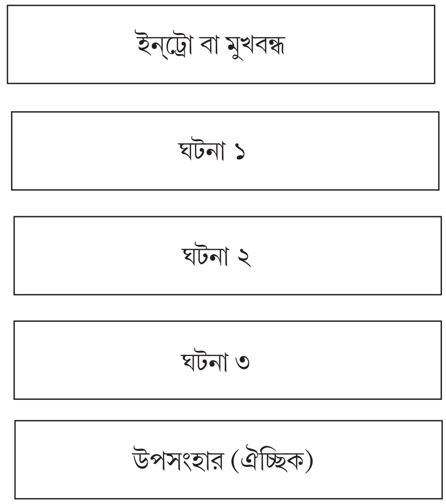

চিত্র-৩

ঘটনানুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স (Chronological) : যে ঘটনার পর্যায়ক্রমে বা ধাপে ধাপে সম্প্রসার ঘটেছে এবং কোনও পর্যায়ই অন্য কোনও পর্যায়ের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সে ঘটনা সম্পর্কিত খবরের বিন্যাস বা কাঠামো হবে ঘটনা-অনুক্রমিক বা সমান্তরাল বাক্স ধাঁচের। এক অর্থে বলতে গেলে এ ধরনের খবরের মধ্যে একাধিক খবর থাকে এবং এ ধরনের খবরের লীড বা সূচনা কী হবে তা নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। এজন্য সাধারণত এ ধরনের খবরের একটি সমন্বিত সূচনা লিখে তারপর ধাপে ধাপে পরবর্তী বিষয় বা তথ্যগুলিকে সাজিয়ে দিতে হয়। এক একটি ধাপ এক একটি বাক্সের মতো ভাবলে, সব মিলিয়ে কয়েকটি সমান্তরাল বাক্সের চেহারা নেয় এ ধরনের সংবাদ বিন্যাস। এই ঘটনানুক্রমিক বিন্যাসে অনেকে যেমন সমন্বিত সূচনা লেখার পক্ষপাতী, তেমনি অনেকেই আবার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বাদ দিয়ে তারপর পারম্পর্য অনুযায়ী অন্য তথ্যগুলি দিতে চান যাতে ঘটনার একটি ধারাবাহিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে (চিত্র ৩)।

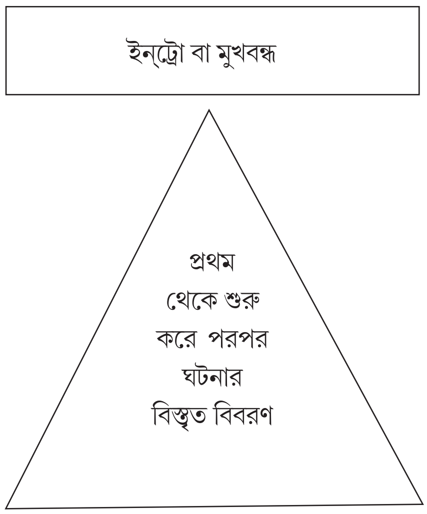

চিত্র-৪

পিরামিড ও সমান্তরাল বাক্সের সমন্বয় : এ ধরনের সংবাদ বিন্যাসের রেওয়াজ এখন আর নেই। এই রেওয়াজ লুপ্ত হয়ে যাবার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, এতে সংবাদের লীড বা সূচনা অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হয় যা আবার মুদ্রণ বিন্যাসে প্রসারিত আয়তক্ষেত্রের আকার ধারণ করে। সূচনার পরে মূল খবরটিকে আবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে ক্রমশ পিরামিডের মতো নিচের দিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এখনকার দিনে যেহেতু দীর্ঘায়িত সূচনা লেখার চলন নেই এবং পাঠকও এ ধরণের লেখা পড়তে বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন না, তাই এ ধরনের সংবাদ-লিখনভঙ্গি বর্জিত হয়েছে (চিত্র ৪)

রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয় কাঠামো (Essay Approach) : সংবাদে রচনা বা প্রবন্ধ জাতীয় বিন্যাস খুবই কম, বলা যায় বিরল। তবে এ ধরণের কাঠামোর লেখা প্রায়শই সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়, কোনও বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত নিবন্ধ, রবিবাসরীয় বা সাময়িকীর লেখা, ম্যাগাজিন আর্টিকল, সংবাদভাষ্য, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার বিশেষ লেখা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। স্কুল কলেজে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচনার সঙ্গে সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনের রচনার একটু তফাৎ আছে। পাঠক বা দর্শককে প্রতিপাদ্য বিষয়টি বা কোনও বিশেষ তত্ত্ব বা কোনও মন্তব্য দিয়ে আকৃষ্ট করে তবে প্রবন্ধ ধাঁচের লেখা শুরু করতে হয়। সাংবাদিক বা লেখককে তাঁর বক্তব্য বা মন্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ বা উদাহরণ দিয়ে লিখতে হবে এই রচনার মধ্যম অংশ। লেখার শেষ অংশে বা উপসংহারে লেখককে প্রতিপাদ্য বিষয়টি ও তৎসংক্রান্ত মন্তব্যের সারাংশ দিয়ে গোটা বিষয়টিকে গুটিয়ে আনতে হবে। শুরুর সঙ্গে তার সাযুজ্য থাকবে (চিত্র ৫)।

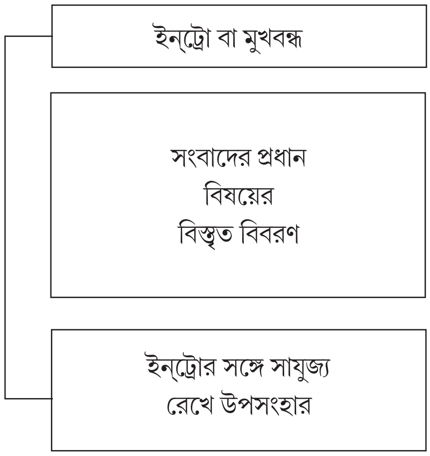

চিত্র-৫

বালি-ঘড়ি সদৃশ বিন্যাস বা কাঠামো (Hour-glass Organisation) : বাড়ি-ঘড়ি বা আওয়ার গ্লাস (বালি ভর্তি কাচের পাত্র যার মধ্যভাগ সরু এবং ওপরের মোটা অংশ থেকে বালি একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিচের মোটা অংশে সম্পূর্ণরূপে পড়ে যাওয়ার পরই পাত্রটি উল্টে যাবে ও ওপরের বালি আবার নিচে পড়বে—এরকমভাবে কার্যসাধন পদ্ধতিতে তৈরি যে ঘড়ি) যার আকৃতি অনেকটা ড্রাম বা ডুগডুগির মতো সেই রকম জ্যামিতিক বিন্যাসে কখনও কখনও সংবাদ লেখা হয়। এই কাঠামোয় লেখা সংবাদের ওপরের অংশ বা লীড ও নিচের অংশ বা উপসংহার হবে প্রসারিত। মধ্যম অংশ যা তুলনামূলকভাবে সরু সেখানে কাহিনী একটি মোড় নেবে, আর এই অংশটিকে ধরে নেওয়া হবে পরিবেশিত সংবাদটির এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায় উত্তরণের মধ্যবর্তী ধাপ। এই বিন্যাসে বা ধাঁচে লেখা সংবাদের জোরটা থাকে প্রধানত দুটি ভিন্ন অথচ গুরুত্বপূর্ণ অংশের ওপর। আর থাকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ একটা মোড় বা বাঁক যেটা সংবাদের এক অংশ থেকে আর এক অংশে উত্তরণের একটা ধাপ, জ্যামিতিক ছকে যার অবস্থান সংবাদটির মধ্যভাগে। এই পরিবর্তনসূচক মধ্যবর্তী পর্যায়টি হতে পারে কয়েকটি বাক্য বা অনুচ্ছেদ, আর এ ধরনের বাক্য বা অনুচ্ছেদ সাধারণ দীর্ঘ বা প্রলম্বিত সংবাদ-কাহিনীতেই দেখা যায়।

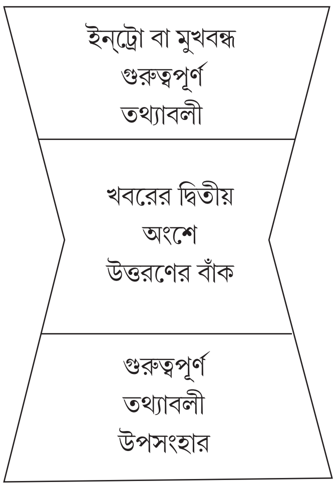

চিত্র-৬

এই অংশটিতে অনেক সময় উপ-শিরোনাম বা সাব হেডিং দেওয়া হয়, কোনও কোনও সময় গ্রাফিক্সও ব্যবহার করা হয়, কখনও বা বক্স বা বুলেট ব্যবহার করা হয়। এই মধ্যবর্তী অংশটি হতে পারে সময়ের ব্যবধানের ইঙ্গিতবাহী বা বিবরণমূলক কিছু ভৌগোলিক উপাদান বা হতে পারে অন্য কোনও বিষয় বা ধারার একটি ক্ষেত্র। আর এই ক্ষেত্রটি থাকবে সংবাদটির প্রধান দুটি অংশের সঙ্গে খুব শক্ত সুতোয় বাঁধা। এই ধরনের সংবাদ কাঠামোর প্রথম ও শেষ উভয় অংশই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিতে ঠাসা থাকে। (চিত্র ৬)

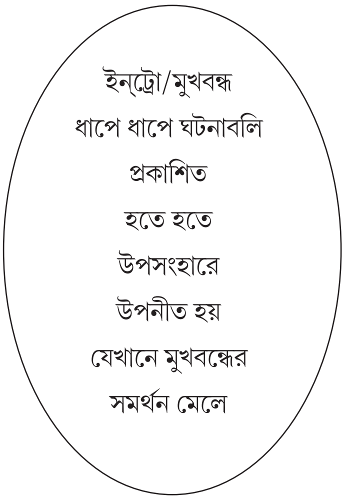

চিত্র-৭

ডিম্বাকৃতি কাঠামো (Goose Egg Organisation) : কোনও বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলে সে বিষয়টি নিয়ে বৃত্তাকারে লেখার প্রথা একেবারে অজানা নয়। বস্তুত কুশলী/শৈলীনিষ্ঠ সাংবাদিক বা লেখকদের কোনও বিষয়ের উপস্থাপনা শৈলী আন্দাজ করা বড় কঠিন। যাঁরা খুব অভিজ্ঞ ও রীতিকুশল তাঁরা যে কোনও বিষয়-সংক্রান্ত সংবাদ যে কোনওভাবে শুরু করতে পারেন ও তাঁদের লেখার শেষ ছত্র পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহল অটুটভাবে ধরে রাখতে পারেন। বহু উন্নতমানের সংবাদ, বাস্তবিকপক্ষে, বৃত্তাকারেই লেখা। তার মানে, কোনও একটি বিষয় নিয়ে সংবাদ লেখা শুরু হয় এবং সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টি শেষ পর্যন্ত প্রতিপন্ন হয়েছে সেটা সংবাদের উপসংহার বলা হয়। 'গুঞ্জ এগ' বা ডিম্বাকৃতি অবয়ব আসলে সনাতনী ঢঙে গল্প বলার এক পরীক্ষিত শৈলী। কোনও বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা মানে, প্রথম দৃশ্য শুরু হওয়ার পর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ঘটনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে এবং সবশেষে যে হিতোপদেশটি পাওয়া যায় তার যুক্তিগ্রাহ্য সমর্থন মেলে মুখবন্ধে বর্ণিত ঘটনাটি থেকেই। অর্থাৎ বৃত্তাকারে বা ডিম্বাকৃতি কাঠামোতে লেখার বা গল্প বলার রেওয়াজ সাবেককাল থেকেই প্রচলিত (চিত্র ৭)।

সংবাদ লেখার এসব কাঠামো ছাড়াও অন্য কাঠামো হতে পারে। সেটা অবশ্যই সাংবাদিকের ব্যক্তিগত লিখনশৈলীর ওপর অনেকটা নির্ভর করে। তাছাড়া বিষয় বিশেষে শৈলী ও বিন্যাস বদলাতেই পারে।

এসব ছাড়া বড় ধরনের যে গঠনশৈলী সাধারণত চোখে পড়ে সেটা অনেকটা একটি ক্ষুদ্র অংশকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর বা সার্বিক বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা। যেমন 'অনুপমের বয়স এখন দশ। তার কোনও কিছুরই অভাব নেই। বাবা-মা ভালো চাকরি করেন। তার সমস্যা একটাই—তাকে মাঝেমধ্যেই পেয়ে বসে এক অদ্ভুত হতাশা। ক্লাস পরীক্ষায় ভালো করতে না পারলেই সে বাড়ি ফিরে বসে থাকে এক কোণায়, কিছু খেতে চায় না। কখনও কখনও তার মনে হয় সবকিছু উড়িয়ে দেয় মেশিনগানের গুলিতে—অনেকটা টিভিতে দেখা নায়কদের কায়দায়।'

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই সংবাদের মধ্য দিয়ে পাঠককে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একটি সমসাময়িক

সমস্যার দিকে। স্কুলব্যাগের বোঝায় ক্লান্ত, অত্যন্ত কঠিন, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যাওয়ার ভয়ে আজকের অনেক শিশু/কিশোর/তরুণ-তরুণীই যে সমস্যার শিকার, এই সংবাদ সেই সমস্যারই ইঙ্গিতবাহী।

মানবিক উপাদান সম্বলিত এই ধরণের সংবাদ আজকাল প্রায়শই লেখা হয়ে থাকে। অবশ্যই খবর যে বিষয়বস্তুর ওপর লেখা হবে লেখার ভঙ্গি অনেকটাই তার ওপর নির্ভর করবে। কেউ যদি কোনও কঠিন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়ে লিখতে চান, তাঁকে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব লঘু করেও সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষায় বিষয়টি উপস্থাপিত করতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য বা অর্থনীতির খবরের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি একইভাবে প্রযোজ্য, যদিও সবটাই নয়। কারণ, মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক পরিভাষা অনেকটাই বোধগম্য, যেটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবসময় বলা যায় না। একথা সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে, খবর লেখাটা হচ্ছে একইসঙ্গে পাঠককে তথ্য সরবরাহ করা এবং সেই কাজটি মনোহারিত্বের সঙ্গে করা।

লেখার ধরণ এমন হবে যা কিনা পাঠককে আকৃষ্ট করবে, কিন্তু লেখাকে বর্ণাঢ্য করতে গিয়ে ভারসাম্যহীন করে বড় করে ফেলা চলবে না। লেখার ওপরে দখল আনতে গেলে তাই প্রয়োজন প্রতিদিন যিনি যে ভাষায় লিখবেন সেই ভাষায় প্রচারিত যত বেশি সম্ভব সংবাদপত্র পড়া এবং লেখার বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা। ধ্রুপদী সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বিশিষ্ট লেখকদের লেখাগুলি পড়লেও লেখার ভঙ্গিতে একটি নিজস্বতা সহজেই জন্মানো সম্ভব।

সূচনা বা ইনট্রো লেখার নিয়ম

কী করে 'ইনট্রো' বা সংবাদের সূচনা লিখতে হয়? পরিবেশনযোগ্য সংবাদটির সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থেকে সংবাদটির 'ইনট্রো' বা 'লীড' লিখতে হবে এবং এক মুহূর্তের জন্যও ভুললে চলবে না যে 'ইনট্রো' হচ্ছে সংবাদটির সারাংশ। কর্মব্যস্ত পাঠক পুরো সংবাদটি পড়ার সময় না পেলে কেবলমাত্র ইনট্রোটুকু পড়েই যাতে প্রাথমিকভাবে সংবাদটি জানতে পারেন। সুতরাং সংবাদের সূচনা বা ইনট্রোতে যেন সংবাদটি-সংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই প্রশ্নগুলি হচ্ছে, 'কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এবং কীভাবে'। ইংরাজিতে এগুলিকে বলা হয় "The Five Ws and one H : Who, What, When, Where Why and How। আজকাল যদিও 'ইনট্রো' লেখার ক্ষেত্রে অনেকরকম বৈচিত্র এসেছে তবুও চিরাচরিত পদ্ধতিতে লেখা ইনট্রোতে যে ছটি প্রশ্নের উত্তর নিহিত থাকবে তা খুবই অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক এবং ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য। যদি ইনট্রোতে বলা হয়, ''গতরাতে প্রায় নটার সময় কাশীপুরে একদল সশস্ত্র লোক এক ব্যাঙ্ক লুট করে পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়ে পালায়"—তাহলেই পাঠক এক নজরে ঘটনাটি সম্পর্কে একটি ধারণা করে নিতে পারবেন।

কে : কেউ না কেউ কোনরূপ ক্রিয়াকলাপ যুক্ত বা কাউকে না কাউকে ঘিরে চলে সক্রিয়তা। এই ব্যক্তি কে? কে বক্তৃতা দিলেন? কে মারা গেছেন? কে চুরির অভিযোগে ধরা পড়েছে? কখনও নাম হতে পারে, তাতে আবার আভিজাত্যসূচক খেতাব যুক্ত হতে, কখনও বা ব্যক্তির কোন একটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণও থাকতে পারে। নামের আগে খেতাব যথা, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারক, মেয়র, উপাচার্য ইত্যাদি লেখা হয়। সংক্ষিপ্ত বিবরণ যেমন, ছ-ফুট লম্বা এক নতুন খেলোয়াড়, ৩৫ বছর বয়সের এক বিলেত ফেরৎ ডাক্তার, মানসিক বিকারগ্রস্ত এক কয়েদি, ভিন রাজ্যের অসাধু কয়েকজন ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

কী : কী ঘটেছে বা কী হয়েছে? ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধারণত এই অংশে থাকে। যেমন, খোয়া গেছে, খুন হয়েছে, ডাকাতি হয়েছে, পালিয়ে গেছে, গ্রেফতার হয়েছে, বাজেট পেশ হয়েছে, আয়কর বেড়েছে, পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে ইত্যাদি। কখনও বা কিঞ্চিৎ বিবরণ থাকে। যেমন, কার্গিল যুদ্ধে নিহত জওয়ানের স্ত্রীকে সরকার পুরস্কার দিল, উত্তেজিত জনতা ইটপাটকেল ছোঁড়ে ও অফিস ঘর ভাঙচুর করে, গ্রাম থেকে শহরের আদালতে মামলা করতে আসা এক প্রৌঢ় প্রতারিত ইত্যাদি।

কেন : কোনও কোনও সময় খবরের ইন্‌ট্রোতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ একটা ঘটনা কেন ঘটলো সেটা ঠিক সেই মুহূর্তে জানা বা বোঝা যায় না। তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জানা যায়, যেমন চালক গাড়িটির ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে বলেই দুর্ঘটনা হয়, প্রশ্নগুলি সম্পূর্ণ সিলেবাসের বাইরে ছিল বলেই কেমিস্ট্রি দ্বিতীয় পত্রের আবার পরীক্ষা হবে ইত্যাদি।

কবে/কখন : দৈনিক সংবাদপত্রে সাধারণত সপ্তাহের কোন দিনে ঘটনাটি ঘটেছে তার উল্লেখ করা হয় পাঠকের কাছে এটি খুবই প্রাসঙ্গিক, যেমন কোথায় ঘটেছে সেটাও খুবই প্রয়োজনীয় তথ্য। কখনও কখনও নির্দিষ্ট দিন ও নির্দিষ্ট সময়েরও উল্লেখ করার প্রয়োজন থাকে, যেমন শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ যখন সব অফিস কাছারি বন্ধ হয়ে গেছে তখন দুর্বৃত্তরা এসে হানা দেয়, বুধবার লাঞ্চের সময় সবাই যখন অফিস থেকে বেরোতে শুরু করে ঠিক সেই সময় সুযোগ বুঝে প্রতারকটি বড়বাবুর ঘরে ঢুকে পড়ে ইত্যাদি।

কোথায় : কোলকাতায় না হাওড়ায় না নদীয়ায়—ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে না বললে সংবাদটি পাঠকের কাছে খুব বিভ্রান্তিকর মনে হবে। আবার শুধু কোলকাতায় বললেও ঘটনাস্থলটি পরিষ্কার হবে না, কোলকাতার কোথায় অর্থাৎ কোন রাস্তায়, এমন কি সম্ভব হলে সেখানকার উল্লেখযোগ্য কোন বাড়ি বা লাইব্রেরি বা স্মৃতিস্তম্ভের কাছে কিনা জানাতে পারলে পাঠক খুব খুশি হয় ও খবরটি সম্বন্ধে আরও বেশি আগ্রহী হয়।

অনেক সংবাদপত্রই সংবাদে উল্লিখিত ঘটনার স্থান ও কাল অর্থাৎ কোথায় ঘটেছে এবং কবে ঘটেছে তা লেখে না। এই সংবাদপত্রগুলি লেখে, আজ এখানে বা গতকাল এখানে। এই সংবাদপত্রগুলি ডেটলাইন ব্যবহার করে। অর্থাৎ এসব সংবাদপত্রের প্রতিটি প্রকাশিত সংবাদের প্রথম ছত্রের শুরুতেই একটি জায়গার নাম ও একটি তারিখ (অর্থাৎ যেখান থেকে যেদিন সংবাদটি লেখা হচ্ছে) উল্লেখ করা থাকে—সেটিকেই বলা হয় ডেটলাইন। যেমন—দিল্লি, ডিসেম্বর ২৫ বা কোলকাতা, জানুয়ারী ১২)।

কীভাবে : ঘটনাটি কীভাবে ঘটলো তা সাধারণত প্রকাশিত সংবাদটির মধ্য অংশে বিস্তারিতভাবে বলা থাকে। তবুও তার একটা ইঙ্গিত সংবাদের ইন্‌ট্রোতে থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন, বহুতল বাড়ির জঞ্জাল পরিষ্কার করার এক অভিনব পরিকল্পনা চালু করতে চলেছেন শহরের মেয়র অথবা বকেয়া বিক্রয়কর কীভাবে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করে স্কুলের মিড্‌-ডে মিল চালু করা যায় তা নিয়ে আলোচনায় বসতে চান রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, স্কুল শিক্ষক মন্ত্রী ও বাণিজ্য-কর মহাধ্যক্ষ ইত্যাদি।

সংবাদের লীড বা ইন্‌ট্রোতে যদিও 'কে কী কেন কবে কোথায় এবং কীভাবে'-র উত্তর থাকাটা কাম্য, সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে গিয়ে খবরের সূচনা যেন তালগোল পাকানো শ্রুতিকটু বাক্যের সমষ্টি হয়ে না দাঁড়ায়। সংবাদের ভাষা হবে নির্ভুল, সরল, সংক্ষিপ্ত অথচ সাধারণের বোধগম্য। সব প্রশ্নের উত্তর যে একটি বাক্যের মধ্যেই থাকতে হবে বা সব প্রশ্নের উত্তর যে প্রথম প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদেই

থাকতে হবে তাও নয়। ইন্ট্রো বা লীড এক প্যারাগ্রাফ থেকে শুরু করে তিন-চার প্যারাগ্রাফও প্রয়োজনবোধে হতে পারে। পাঠক যেন একবার পড়েই খুব সহজে সংবাদটি বুঝতে পারে।

সারাংশ

মূল পাঠে সংবাদ ও প্রতিবেদন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগই মূলত সংবাদ লেনদেন। তাছাড়া এই যুগটাই তথ্যের যুগ, তথ্য আদানপ্রদানের যুগ। তথ্যই শক্তি। তথ্যই সংবাদের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রতিনিয়তই এই বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হচ্ছে। সংবাদের সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। সংজ্ঞা যাই হোক, সংবাদের বিষয়বস্তু সব সময়ই হবে নতুন, সময়োপযোগী, অর্থবহ ও কৌতূহলোদ্দীপক। নানা উৎস থেকে সংগৃহীত হয় তথ্য, যার ভিত্তিতে লেখা হয় সংবাদ। এই কাজ যাঁরা করেন তাঁদেরকে বলা হয় রিপোর্টার বা প্রতিবেদক। আর, সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় তা হচ্ছে সংবাদ, প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন হতে পারে সোজাসাপটা গরম খবর (হার্ড নিউজ) বা ভিন্নস্বাদের ভিন্নশৈলীর নরম খবর (ফিচার)।

খবর লেখার রীতি-পদ্ধতি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, প্রতিযোগিতার ফলে মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী বদলে যাচ্ছে। সংবাদ রচনার কাঠামো বা বিন্যাসভঙ্গিও নানারকম হয়। সূচনা বা মুখবন্ধ, মধ্যাংশ ও উপসংহার—সংবাদ এই তিনটি অংশে বিন্যস্ত থাকে। সূচনা বা ইন্ট্রোতেই ‘‘কে, কী, কেন, কবে, কোথায় এংব কীভাবে”-র উত্তর বা সংবাদটির সারাংশ বোঝা যায়। কর্মব্যস্ত পাঠক যেন দ্রুত একনজরে ইন্ট্রোটুকু পড়েই প্রাথমিকভাবে সংবাদটি জানতে পারেন। সংবাদের ভাষা এমন সহজ ও সুখপাঠ্য হবে যে তা পাঠককে আকৃষ্ট করবে। কিন্তু কোনভাবেই সংবাদের ভাষা যেন ভারসাম্যহীন না হয়। এবং নিরপেক্ষতা না হারায়।

৩.৩.২ ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন

আধুনিক পৃথিবীতে খবর পরিবেশনের অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। নামকরণ থেকে স্পষ্ট যে এই ধরনের প্রতিবেদনে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কেবলমাত্র কোনও ঘটনার উল্লেখ নয়, এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হল ঘটনাকে কার্য-কারণ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা। সেই কারণে নির্দিষ্ট ঘটনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ পরিবেশন করে বা ব্যাখ্যা করা এই প্রতিবেদনের অন্যতম চাহিদা। প্রত্যেক ঘটনারই কিছু প্রচ্ছন্ন দিক থাকে, থাকে প্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক দৃষ্টিকোণ। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনে এই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ত্রিমাত্রিক এক প্রক্রিয়া। অতীতের প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করাই এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য। রসকু ড্রামণ্ড (Roscoe Drummond) নামে আমেরিকার এক বিখ্যাত ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদকের মতে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের অর্থ হল গতকালের পশ্চাদপটে আজকের ঘটনাকে বিচার করে আগামীকালের অর্থপ্রদান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঝোঁক দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। কার্টিস ডি. মাকডুগাল (Curtis D. MacDougal) তাঁর Interpretative Reporting গ্রন্থে লিখেছেন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন মার্কিনীরা হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এর কারণ তাঁরা বুঝতে পারেন নি। এর ফলে সংবাদ রচনাশৈলীতে পরিবর্তন দেখা যায়। এর ফলে ১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন অধিকাংশ মার্কিনী অবাক হননি।

ম্যাকডুগাল-এর মতে সাংবাদিককে পরিদর্শকের ঊর্দ্ধে উঠতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার পাশাপাশি একজন ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিককে মনে রাখতে হবে যে কোন খবরই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই ঘটনার পারম্পর্যে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর কাজ। যুক্তিবোধ, গবেষণাধর্মিতা তাই একজন ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকের অবশ্যম্ভাবী চরিত্র।

আজকের সমাজে ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। ওয়াল্টার লিপম্যান একদা বলেছিলেন সমাজ যত জটিল ও অস্পষ্ট হবে খবরের পশ্চাদপট ততই গুরুত্বপূর্ণ হবে। একথা কতটা প্রাসঙ্গিক তা বর্তমানে প্রমাণিত। এছাড়াও বর্তমান সময়ে উদ্দীষ্ট পাঠক/দর্শক (Target audience) মূল সংবাদ পেয়ে যান খুব তাড়াতাড়ি। মূলত টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনও একটি খেলার সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে টেলিভিশনে। তখন উদ্দীষ্ট দর্শক খেলার প্রতিটি মুহূর্তের অগ্রগতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এমনকি সরাসরি সম্প্রচার না হলেও খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বা কিছুক্ষণের মধ্যেই টেলিভিশনের মাধ্যমে খেলার ফলাফল সম্প্রচারিত হয়। তখন পরের দিনের সংবাদপত্রে কেবলমাত্র খেলার ফলাফল প্রকাশ করলে মাধ্যমটি তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলবে। তাই স্বল্প পরিসরে ফলাফল জানানোর পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ফলাফলের ব্যাখ্যা, বিশেষজ্ঞের মতামত। এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালের কথাই ধরা যাক না কেন। ফলাফলের পাশাপাশি টস জিতে ভারতের ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত অথবা ভারতীয় বোলারদের ব্যর্থতা কেবল সংবাদপত্রেই আলোচিত হয়নি। এমনকি টেলিভিশনেও খেলা-সংক্রান্ত অন্যান্য অনুষ্ঠানে ফলাফলের পাশাপাশি এই ব্যাখ্যামূলক আলোচনা উঠে এসেছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ঘটনার নিরস প্রতিবেদন নয়। বরং তা লক্ষ্য দর্শককে শিক্ষিত করে, 'কে' এবং 'কি'র স্বল্প পরিসর থেকে 'কেন' এবং 'কীভাবে'-র বৃহৎ প্রেক্ষাপটে নিয়ে যায়।

তদন্তমূলক প্রতিবেদন

তদন্তমূলক প্রতিবেদন বলতে বোঝায় জনস্বার্থে রচিত এক বিশেষ ধরনের প্রতিবেদন। সুগভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে জনস্বার্থের পরিপন্থী আপাত লুক্কায়িত কোন তথ্যকে উন্মোচিত করাই মূলত তদন্তমূলক প্রতিবেদন বলে পরিচিত। পল এন উইলিয়ামস্ (Paul N. Williams)-এর মতে এটি একটি বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া, কেবলমাত্র তথ্যের অনুসন্ধান নয়, বরং তথ্যের ভিত্তিতে এই ধরনের প্রতিবেদনে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। কিন্তু সেখানে আবেগ বা পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্তের কোন স্থান নেই।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতার নির্ভীক চরিত্রের মধ্যে অনেকে সমাজে বিবেকের কণ্ঠস্বর খুঁজে পান। জাস্টিস এ. এন. গ্রোভার (A. N. Grover) তাঁর Press and Law বইতে ক্লার্ক আর মলেনহফ (Clark R

Mollenhoff) -এর Investigative Reporting বইটির মুখবন্ধ থেকে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন।

- এটি সাংবাদিকের নিজস্ব কাজ। অন্য কোনও ব্যক্তি তাঁকে সহায়তা করতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিকের ভূমিকাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ;
- এই তদন্তের বিষয় অবশ্যই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়া প্রয়োজন; এবং
- জনগণের কাছ থেকে সত্য গোপন করার বা মিথ্যা চাপিয়ে দেওয়ার কোনও প্রচেষ্টা থাকা চলবে না।

সাধারণত অন্যায়, অপরাধ, অর্থ ও ক্ষমতার অপব্যবহার প্রভৃতি তদন্তমূলক সাংবাদিকতার বিষয় হতে পারে। এছাড়াও সমাজ তথা জনগণের জন্য জরুরি যেকোনও বিষয়ই তদন্তমূলক প্রতিবেদনের বিষয় হতে পারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক অভিপ্রায় বা পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত এ ধরনের সাংবাদিকতার চরিত্রহানি ঘটায়।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতা জনপ্রিয়তা অর্জন করে ওয়টারগেট কেলেঙ্কারির ঘটনা থেকে। ১৯৭২ সালের মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্কালে ওয়াশিংটনের ওয়াটারগেট হোটেলে অবস্থিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদর দপ্তরে আড়িপাতার যন্ত্র বসানো হয়েছিল এবং এই ঘটনায় মদত দিয়েছিলেন খোদ প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন এবং রিপাবলিকান পার্টি—এই তথ্য তদন্তমূলক অনুসন্ধান করে উদ্ধার করেন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার দুই তরুণ সাংবাদিক কার্ল বার্নস্টেইন (Carl Bernstein) এবং বব উডওয়ার্ড (Bob Woodward)। এই তদন্তের ফলে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হয়।

বার্নস্টেইন এবং উডওয়ার্ড ওয়াটারগেট ঘটনায় গ্রেপ্তার চার ব্যক্তিকে জেরা করার মধ্যে দিয়েই কাজ শুরু করেছিলেন। তদন্তের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই পরবর্তী ঘটনাসমূহ প্রকাশিত হয়। তাঁরা বলেছিলেন, ‘‘আমরা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইনি, আমরা কেবল খবরটাকে তাড়া করেছিলাম।’’ এরকমই কোনও ঘটনার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থেকে তদন্তমূলক প্রতিবেদন তৈরি হয়। পুলিৎজার জয়ী সাংবাদিক রবার্ট গ্রিন এই বিষয়টিকেই বলেছেন খবর শোঁকা। এর ভিত্তিতেই তদন্তের প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথি, প্রমাণ ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সাংবাদিককে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

ভারতবর্ষে তদন্তমূলক সাংবাদিকতা শুরু হয় মূলত ১৯৭৭ সালে আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হবার পর। বিশেষত ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে সেসময় এই ধরনের বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ভাগলপুর জেলে বন্দীদের পুলিশ কর্তৃক অন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা, কুয়ো তেল কেলেঙ্কারি, বোফর্স কেলেঙ্কারি, হাওলা কেলেঙ্কারি থেকে সাম্প্রতিককালের তহেলকা কাণ্ড বা কার্গিল যুদ্ধের সময় কফিন কেলেঙ্কারির মত অজস্র তদন্তমূলক প্রতিবেদন ভারতের সাংবাদিকতার ধারাকে পুষ্ট করেছে।

ওয়াল্টার লিপম্যান বলেছিলেন সমাজ যত জটিল হবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের গুরুত্ব এবং ক্ষেত্র তত প্রসারিত হবে। বর্তমান জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্যায়-অবিচারের সংখ্যা যত বাড়ছে ততই প্রসারিত হচ্ছে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার সুযোগ। কিন্তু এর পাশাপাশি সাংবাদিক তথা সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্বও বাড়ছে। তদন্তমূলক সাংবাদিকতার লক্ষ্য জনস্বার্থে কোনও ঘটনার লুক্কায়িত দৃষ্টিকোণ যথাযথ তথ্যের সাহায্যে উন্মোচন করা। এক্ষেত্রে মিথ্যা বা অর্ধসত্যের কোনও স্থান নেই। কারণ তাতে জনস্বার্থই লঙ্ঘিত হয়।

কিন্তু আজকের মারাত্মক প্রতিযোগিতার মাঝে সাংবাদিকের সামনে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার নামে মিথ্যা বা অর্ধসত্য প্রচারের টোপও প্রচুর। এরকম ঘটনার উদাহরণ দেশে বিদেশে খুব কমও নয়। কিন্তু সমাজের বিবেকের এক কণ্ঠস্বর প্রকৃত তদন্তমূলক সাংবাদিকতা প্রকাশ করে, এ ধরনের প্রবণতা তার পরিপন্থীই কেবল নয়, এই ঘটনা সংবাদ মাধ্যমের প্রতি জনগণের আস্থাও কমিয়ে দেয়। স্বভাবতই তদন্তমূলক সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থেই বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

তদন্তমূলক সাংবাদিকতা বা অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা সম্পর্কে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের মতামত নীচে উল্লিখিত হল—

অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা, আদর্শ ও এক্তিয়ার :

অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনে তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে

(ক) এটি কোনও সাংবাদিকেরই কাজ হতে হবে, অন্য কারোর নয়

(খ) এ বিষয়টি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট হতে হবে

(গ) জনসাধারণের থেকে সত্যকে গোপন রাখার একটি প্রয়াস চলে

(১) প্রথম আচরণবিধিটি (ক) এর প্রয়োজনীয় অনুসিদ্ধান্তের অনুসারী। এই অনুসিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথাগতভাবেই তদন্তকারী সাংবাদিককে তাঁর লেখাটি সেইসব তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে যেগুলির অনুসন্ধান, অনুবেক্ষণ এবং সত্যতা নিরূপণ তিনি স্বয়ং করেছেন। তৃতীয় কোনও পক্ষের আহরিত তথ্য যা কোনও প্রত্যক্ষ, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে স্বয়ং সাংবাদিক কর্তৃক পরীক্ষিত নয়—তার ভিত্তিতে লেখাটি তৈরি করা উচিত নয়।

(২) কোন কোন বিষয় প্রকাশ করা উচিত কোন কোন বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন, এ ব্যাপারে একটা সংঘাত দেখা দিতে পারে। তদন্তকারী সাংবাদিককে সেগুলি চিহ্নিত করতে হবে এবং একদিকে উন্মোচন ও অন্যদিকে গোপনীয়তার মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে, তবে সবার ওপরে জনকল্যাণকে স্থান দিয়েই এটা করতে হবে।

(৩) তদন্তকারী সাংবাদিককে অপরিণত, অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট তথ্য, যা স্বয়ং সাংবাদিক কর্তৃক কোনও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা নয়, সেগুলি থেকে ঝটিতি ভেলকিবাজির মতো চমকপ্রদ কিছু তৈরি করে ফেলার লোভ সংবরণ করতে হবে।

(৪) কাল্পনিক তথ্যকে ভিত্তি করার, অস্তিত্বহীন কোনও কিছুকে খুঁচিয়ে বার করার বা কারণ ব্যতিরেকেই অনুমান করার প্রবণতাকে সতর্কভাবে এড়িয়ে চলা উচিত। যত বেশি সম্ভব তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে, সেগুলি কাজে লাগাতে হবে এবং প্রেসে পাঠানোর মুহূর্ত পর্যন্ত যতটা সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(৫) সংবাদপত্রগুলির তথ্যের সত্যতা ও যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য কঠোর নির্দেশ থাকা উচিত। তদন্তের রায়গুলিকে বিষয়গতভাবে পরিবেশন করা উচিত, অতিরঞ্জন বা বিকৃতি ব্যতিরেকে।

(৬) সাংবাদিকের তদন্তাধীন বিষয় অথবা প্রশ্নটি নিয়ে এমনভাবে এগোনো উচিত নয়, যাতে তিনি

নিজেই অভিযোক্তা অথবা মামলার অধিবক্তা হয়ে যান। সাংবাদিকের মনোভাব হওয়া উচিত স্পষ্ট, সঠিক এবং নিরপেক্ষ। বিবেচ্য বিষয়টির পক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত তথ্যগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করে দেখার পর সেগুলি স্পষ্টভাবে এবং আলাদাভাবে বিবৃত করা উচিত যার মধ্যে থাকবে না কোনও একতরফা সিদ্ধান্ত বা পক্ষপাতদুষ্ট মন্তব্য। প্রতিবেদনটি সুরে অন্তর্বস্তুতে হওয়া উচিত পরিমিত, শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ, ঠিক এমনটি হওয়া উচিত তার ভাষাও। কখনোই অপ্রয়োজনীয়ভাবে আক্রমণাত্মক, কণ্টকাকীর্ণ, বিদ্রূপাত্মক এবং ভর্ৎসনামূলক হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে যখন সেই ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয় যার অভিযোগে বর্ণিত কার্যকলাপ অথবা অশোভন আচরণ নিয়ে তদন্ত চলছে। অথবা তদন্তকারী সাংবাদিকের কাজকর্ম এবং অশোভন আচরণ তদন্তাধীন হয়েছে তার বিরুদ্ধে অপরাধ অথবা নিরপরাধের রায় এমনভাবে দেওয়া উচিত নয় যাতে মনে হয় তিনি (সেই সাংবাদিক) একজন বিচারক হিসাবে অভিযুক্তের বিচার করছেন।

(৭) একটি প্রতিবেদনের তদন্ত, উপস্থাপনা ও প্রকাশনার গোটা প্রক্রিয়ায়, তদন্তকারী সাংবাদিক/ সংবাদপত্রের অপরাধ ব্যবহারশাস্ত্রের সর্বোচ্চ নীতি দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এই নীতি অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগকৃত অপরাধ যতক্ষণ পর্যন্ত না নিরপেক্ষ, নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণাদির দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিরপরাধ।

(৮) কারও ব্যক্তিগত জীবন, কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির হলেও, তা তার একান্ত নিজস্ব। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও ব্যক্তির অপরাধ/অন্যায়ের সঙ্গে তার সরকারি পদ বা ক্ষমতার অপব্যবহার জড়িত থাকার তথা জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত, তার ব্যক্তিগত জীবন ও তার গোপনীয়তার উন্মোচন অনুমোদনযোগ্য নয়।

(৯) একজন সাংবাদিকের তদন্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ফৌজদারি দণ্ডবিধির স্পষ্ট প্রয়োগ হতে পারে না। তবুও সেগুলির অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতিগুলিকে সমদর্শিতা, নৈতিকতা এবং বিবেকের ভিত্তিতে পথনির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.৩.৩ সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থায় প্রতিবেদনে লেখার নিয়ম ও পার্থক্য

সংবাদপত্র এবং সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের কাজ সংবাদ সংগ্রহ। দ্রুত প্রতিবেদন (কপি) লিখে ফেলা। মনে রাখা প্রয়োজন, দুটি ক্ষেত্রেই একজন সাংবাদিককে একাধিক কপি লিখতে হয়। প্রতিটি প্রতিবেদনেই সমান গুরুত্ব দিতে হয়। আর সাংবাদিকের প্রতিবেদনের উপর সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করে। সেই কারণে প্রতিবেদন লেখার সময় সাংবাদিকদের কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখতেই হয়। যেমন—

সঠিক শব্দ ব্যবহার : সংবাদ প্রতিবেদন যে ভাষাতেই লেখা হোক না কেন, সঠিক শব্দ যেন প্রয়োগ করা হয়। যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও প্রতিবেদন লেখার সময় কখনও ‘কলকাতা কলেজ’ লেখা চলবে না।

ব্যাকরণগত ত্রুটি না থাকে : প্রতিবেদনের ভাষা যেন ব্যাকরণগত ত্রুটিমুক্ত হয়। লেখা দারুণ, কিন্তু ব্যাকরণগত ভুল থাকলে তা মোটেই সাংবাদিকের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে না।

বাক্য সহজ-সরল : প্রতিবেদন পড়তে যেন পাঠকের অসুবিধা না হয়। পড়ার পর যেন পাঠকের মনে ভাল লাগা তৈরি হয়। এটা তখনই সম্ভব যখন প্রতিবেদনের বাক্য সহজ-সরল হবে।

অশ্লীল শব্দ নয় : সংবাদ প্রতিবেদনে অশ্লীল শব্দের ব্যবহার সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের মর্যাদা নষ্ট করে এবং পাঠকের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

তথ্যের সত্যতা যাচাই : প্রতিবেদন ভাল লেখার অন্যতম শর্ত হল তথ্যের সত্যতা যাচাই করা। প্রকাশিত প্রতিবেদনে তথ্য ভুল হওয়া মানে সাংবাদিকের কর্মদক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। আবার মনে রাখতে হবে, যা তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা যেন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা না হয়।

ইন্ট্রো সংবাদের সারাংশ : প্রতিবেদন লেখা হয় মূলত উল্টোনো পিরামিড কাঠামো অনুসরণ করে। অর্থাৎ মূল খবরটাই যেন প্রতিবেদনের প্রথমেই বা ইন্ট্রোতে দেওয়া থাকে। যাতে করে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা না হয় যে খবরটা কী। মূল খবরটা প্রথমেই বুঝতে না পারলে প্রতিবেদনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে পাঠক।

একই শব্দ এড়িয়ে যাওয়া : প্রতিবেদন লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে, একই শব্দ যেন বারবার ব্যবহার না হয়। চেষ্টা করা যতটা সম্ভব একই শব্দ এড়িয়ে যাওয়া। প্রয়োজনে একই শব্দের সমার্থক শব্দ লেখা যেতে পারে।

শৈলী আকর্ষক : এক-একটি বিষয়ের প্রতিবেদন আলাদা আলাদা লিখন শৈলী হয়। সাংবাদিককে সেদিকে অবশ্যই নজর দিতে হয়। লিখন-শৈলী যেন আকর্ষণীয় হয়, তা খেয়াল রাখতে হবে। সোজা ব্যাপার হল, শিক্ষাবিষয়ক কপি লেখার ধরনের সঙ্গে কখনও ক্রীড়াবিষয়ক কপি এক হবে না। আবার রাজনৈতিক কপির সঙ্গে স্বাস্থ্যের প্রতিবেদন লেখার ধরন এক হবে না।

বিজ্ঞাপনধর্মী যেন না হয় : প্রতিবেদন যেন ব্যক্তি বা সংস্থার স্বার্থবাহী বিজ্ঞাপন না হয়ে যায়।

আইনগত সমস্যা থেকে মুক্ত : সাংবাদিককে কপি লেখার সময় অবশ্যই প্রেস আইন এবং সংবিধান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, প্রকাশিত প্রতিবেদন ভবিষ্যতে আইনগত সমস্যার মধ্যে না পড়ে।

ভারতের সংবাদ সংস্থা

পিটিআই : ভারতের বৃহত্তম সংবাদ সংস্থা (নিউজ এজেন্সি) হল প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া বা পিটিআই। বর্তমানে পিটিআই-এর সদর দফতর দিল্লিতে। দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে পিটিআই ইংরেজি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। ছবিও প্রদান করে। প্রায় ৪৫০টি ভারতীয় সংবাদপত্র পিটিআই-এর গ্রাহক। এর মধ্যে যেমন রয়েছে 'হিন্দুস্তান টাইমস', 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' তেমনই আছে 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'এই সময়'। সর্বভারতীয় সকল নিউজ চ্যানেল এবং দূরদর্শন কিংবা অল ইন্ডিয়া রেডিও-র মতো সরকারি মাধ্যমগুলিও গ্রাহক। ভারতে ১৫০টির বেশি দফতর রয়েছে। পিটিআই-এর। ব্যাঙ্কক, বেজিং, কলম্বো, ইসলামাবাদ, কুয়ালামপুর, মস্কো, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ওয়াশিংটন, নিউ ইয়র্কেও সংস্থার প্রতিনিধি রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার পিটিআই একমাত্র সংবাদ সংস্থা যার নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ (ইনস্যাট) সম্প্রচার ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯১০ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রথম সংবাদ সংস্থা 'এপিআই'-এর (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া) পথচলা শুরু হয়। তবে ১৯১৯ সালে এপিআই-কে অধিগ্রহণ করে রয়টার্স। যদি তখনও এপিআই-এর নামই ব্যবহার হয়। এত কিছু সত্ত্বেও ভারতের নিজস্ব কোনও সংবাদ সংস্থা ছিল না। সেই কারণে, ১৯৪৭ সালের ২৭ আগস্ট মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) প্রকাশ ঘটল 'এপিটিআই'-এর। ১৯৪৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এপিটিআই-র সমস্ত কার্যভার গ্রহণ করে সংবাদ সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু করল পিটিআই। যদিও রয়টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই কাজ শুরু হয়। কিন্তু ১৯৫৩ সালে স্বাধীন সংবাদ সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু করল পিটিআই। জরুরি অবস্থার সময় পিটিআই-এর স্বাধীনতা কিছুটা কমে ছিল। ১৯৮৪ সালে বিদেশেও পিটিআই-এর পরিষেবা শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে সূচনা পিটিআই টিভি-র। ১৯৮৭ সালে পিটিআই-এর ছবি প্রদানকারী পরিষেবা চালু হয়। ১৯৯৯ সালে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত হয় পিটিআই। ২০০৩ সাল থেকে সরকারি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পিটিআই-এর পরিষেবা শুরু করে।

ইউএনআই (ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়া) : ভারতের জনপ্রিয় সংবাদ সংস্থা হল ইউএনআই বা ইউনাইটেড নিউজ অফ ইন্ডিয়া। ১৯৫৯ সালে সংবাদ সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয় এটি। ১৯৬১ সালের ২১ মার্চ থেকেই কাজ শুরু করে এটি। ইংরেজি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে। ১৯৮২ সালে এই নিউজ এজেন্সিটি হিন্দিতেও সংবাদ সরবরাহ শুরু করে। বর্তমানে উর্দুতেও সংবাদ সরবরাহ করে ইউএনআই। ছবিও প্রদান করে এরা।

ইউএনআই প্রথম সংবাদ সংস্থা যারা আন্দামান নিকোবর সংবাদ প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন শহরের পাশাপাশি দুবাই, ওয়াশিংটন, লন্ডন, ইসলামাবাদ, ঢাকা, কলম্বো, সিডনিতেও এখানকার সাংবাদিক রয়েছে। বিশ্বের প্রায় এক হাজারটি প্রচারমাধ্যম ইউএনআই-এর গ্রাহক।

হিন্দুস্তান সমাচার : ভারতীয় ভাষায় প্রায় ১৪০টির মতো গ্রাহককে সংবাদ সরবরাহ করে হিন্দুস্তান সমাচার। বাংলা, হিন্দি সহ ১০টি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে এটি। কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে এই নিউজ এজেন্সির দফতর রয়েছে। হিন্দিতে সংবাদ সরবরাহের জন্য হিন্দুস্তান সমাচার প্রথম দেবনাগরী টেলিপ্রিন্টার চালু করে। ১৯৪৮ সালে এস এস আপ্তে ব্যক্তি মালিকানাধীনে এই সংবাদ সংস্থাটি তৈরি করেন। ১৯৫৭ সালে সমবায়ভিত্তিক মালিকানাধীনে চলে আসে এই সংবাদ সংস্থাটি।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থাগুলির মধ্যে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য 'আইএএনএস' (ইন্দো এশিয়ান নিউজ সার্ভিস) দেশের বেশ কয়েকটি নামী সংবাদপত্র এই নিউজ এজেন্সির গ্রাহক। ইংরেজি ভাষায় সংবাদ সরবরাহ করে। ছবিও প্রদান করে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থা এটি। দিল্লিতে এই সংস্থাটির সদর দফতর।

অনুশীলনী

- **ছোট প্রশ্ন :**

১) কার মতে তদন্তমূলক প্রতিবেদন একটি বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া?

২) 'Press and Law' বইটি কে লিখেছেন?

৩) তদন্তমূলক সাংবাদিকতার দুটি মৌলিক উপাদান লিখুন।

৪) ইউ এন আই কোন সালে সংবাদ সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি পায়?

৫) 'এ পি' কোন দেশের সংবাদ সরবরাহ সংস্থা?

● **বড় প্রশ্ন :**

ক) ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের জনপ্রিয়তা ঊর্ধ্বমুখী কেন?

খ) তদন্তমূলক সাংবাদিকতা কী? তার সীমা কি নির্দিষ্ট? এর বৈশিষ্ট্য কী?

গ্রন্থপঞ্জি

১. *Professional Journalism* : M. V. Kamath : S. Chand

২. *Journalist's Hand* : M. V. Kamath

৩. *Professional Journalism* : Patanjali Sethi : Orient Longman Mumbai

৪. *Basic News Writing* : Mevlin Mencher, Won. C. Brain Publishers

৫. *Investigative Journalism in India* : S. K. Aggarwal, Mittal Publications

৬. *The Romance of the Newspaper* : Chalapati Rao ; NCERT

৭. সংবাদ বিদ্যা : পার্থ চট্টোপাধ্যায়

৮. সংবাদ প্রতিবেদন : ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (লিপিকা)

৩.৩.৪ বিভিন্ন ধরণের প্রতিবেদন

রাজনৈতিক (Political) প্রতিবেদন

একথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, সংবাদপত্র যেহেতু সমাজের দর্পণ এবং রাজনীতি যেহেতু মোটামুটিভাবে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে রাজনৈতিক সংবাদ। এই রাজনীতি কিন্তু আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যে রাজনীতি বা পলিটিক্স-এর কথা পড়েছি তার থেকে আলাদা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাজনীতির তত্ত্বগত দিকগুলি আলোচনা করা হয় আর সংবাদপত্র রাজনীতির ফলিত বা ব্যবহারিক দিকটিতেই বেশি আগ্রহী। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনীতিতে অংশ নেয় বহু রাজনীতিক দল। এই দলগুলির কোনটি থাকে শাসন ক্ষমতায়, কোনটির বা ভূমিকা হয় বিরোধীদলের। সংবাদপত্র শাসক ও বিরোধী এই দুই দলকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখে বা সেটাই তার আদর্শ হওয়া উচিত। রাজনৈতিক সংবাদ লেখার সময় সদাসতর্ক থাকতে হয় যাতে বিভিন্ন মতাদর্শগত ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে পাঠককে অবহিত রাখা যায় এবং একই সঙ্গে শাসকদলের কার্যকলাপ এবং বিরোধীদলের শাসকদল সম্পর্কে সমালোচনার গতিধারা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হয় এবং তাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে মানুষের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের/নেত্রীদের সঙ্গে তো বটেই এমন কি এইসব দলের অন্যান্য স্তরের এবং গণসংগঠনগুলির নেতা/নেত্রীদের সঙ্গেও রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন।

রাজনৈতিক সংবাদে মূলত প্রাধান্য পায় বিভিন্ন দলের গণকল্যাণমুখী কার্যসূচী এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে গণআন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবস্থা। রাজনৈতিক দলগুলির ঘোষিত কর্মসূচী বা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবের কতটা তফাৎ সেটাকে মানুষের নজরে আনাটাও রাজনৈতিক সংবাদদাতার কাজ। বিভিন্ন উপদলীয় কার্যকলাপের প্রতিও রাজনৈতিক সংবাদদাতাদের নজর রাখতে হয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, রাজনৈতিক সংবাদ লিখতে গিয়ে সাংবাদিক কখনও তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ বা পছন্দ অপছন্দের ওপর ভিত্তি করে কোন অভিমত প্রকাশ করবেন না। তাঁর কাজ সঠিক তথ্য সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনে দিক নির্দেশ করা, কিন্তু কখনোই কোন পক্ষ অবলম্বন করা নয়। তাঁকে সর্বদাই থাকতে হবে নিরপেক্ষ এবং বিষয়নিষ্ঠ।

আইনসভা (Legislative) বা সংসদ/বিধানমণ্ডলী-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

গণতন্ত্রে মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হল আইনসভা। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হল সংসদ। রাজ্যস্তরে বিধানসভা/বিধানমণ্ডলী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা এখানে নতুন আইন প্রণয়ন করেন, কখনও আবার পুরনো আইনকে সংশোধন করেন বা বদলান সেটিকে যুগের উপযোগী করার জন্য। এছাড়াও তাঁরা বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন যার মধ্য দিয়ে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সময়বিশেষে অভাব-অভিযোগের প্রতিফলন ঘটে।

আইনসভা সম্পর্কিত প্রতিবেদকের তাই আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলির বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে কীভাবে বাজেট পাশ হয় বা money bill পাশ হয় সে বিষয়ে খুব স্বচ্ছ ধারণা থাকা

চাই। সভায় যেভাবে ভোট দেওয়া হয় বা অধ্যক্ষ যেভাবে রুলিং দেন সেসব বিষয়গুলি বেশ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সভার মধ্যে কোনও সদস্য যা হোক কিছু বলতে পারেন, কারণ তাঁর সে ব্যাপারে একটা বিশেষ ক্ষমতা বা legislative prerogative আছে। সাংবাদিকদের কিন্তু তা নেই। তাই কোনও সদস্যের কোনও মন্তব্য যদি কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী হয় বা কুৎসামূলক হয় তাহলে সেসব মন্তব্যকে যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে এবং মানহানি আইন বাঁচিয়ে সাংবাদিককে পরিবেশন করতে হয়।

নগর ও সমাজজীবন (Civil and Social Life) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

রাজনীতির মতোই প্রশাসন পরিচালনা-সংক্রান্ত সবকিছুই সাংবাদিকদের কাছে সংবাদের একটি অন্যতম বড় উপাদান। প্রশাসনেরও আবার বিভিন্ন দিক আছে। যেমন, লোকসভা বা বিধানসভার শাসকদল যেভাবে সরকার পরিচালনা করে সেটি যেমন প্রশাসনের মূল অংশ, তেমনই কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাগুলিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি প্রশাসন সম্পর্কে খবর লিখতে গেলে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ (যেমন—কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, পরিবহন, নগর উন্নয়ন ইত্যাদি) বা দফতরের দৈনন্দিন ভিত্তিতে যে সব কাজগুলি হয় সেগুলি থেকে জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্যগুলি তুলে এনে পাঠককে অবহিত করাও সাংবাদিকদের কাজ। এইসব খবর কখনো বিভাগীয় মন্ত্রী বা কোনও উচ্চ-পদাধিকারী কর্তাব্যক্তির সাংবাদিক বৈঠক বা বিবৃতির মাধ্যমে হতে পারে, আবার কখনো বা সাংবাদিক তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশেষ অনুসন্ধানের মাধ্যমেও এইসব তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদ পরিবেশন করেন।

অনেক সময় দেখা যায় সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী বা বিভাগীয় কর্মকর্তা যে বিষয়টিতে জোর দিয়ে বলতে চাইলেন সে বিষয়টি সংবাদ হিসাবে ততটা গুরুত্ব পেল না, গুরুত্ব পেল তাঁর বক্তব্যের এমন একটা দিক যার ওপর তিনি আলোকপাত করতে চাননি কিন্তু সাংবাদিকরা তাঁদের অনুসন্ধিৎসার জোরে সেটাকে বার করে আনতে পেরেছেন। এতে মন্ত্রী বা তাঁর অফিসার অসন্তুষ্ট হলেও সাংবাদিক নাছোড়। গণতন্ত্রের প্রহরী হিসাবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখাটা সাংবাদিকের কাজ। একথা তো সকলেরই জানা যে সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্রে অলিখিতভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই ষাট শতাংশ সাফল্যকে মন্ত্রী বা সরকার তুলে ধরতে চাইলেও সাংবাদিক যদি চল্লিশ শতাংশ ব্যর্থতা তুলে ধরতে চান তাহলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সরকারি বিভাগীয় খবর করতে গেলে বিভিন্ন প্রকল্পের ওপর সরকারি ঘোষণা ভালো করে সাংবাদিককে মনে রাখতে হয়, বা প্রয়োজনে লিখে রাখতে হয়, এবং দেখতে হয় সেইসব ঘোষিত কাজ নির্দিষ্ট সময়ে এবং বরাদ্দ অর্থসীমার বা বাজেটের মধ্যে শেষ হল কিনা। না হয়ে থাকলে তার সমালোচনামূলক লেখা এবং ব্যর্থতার জন্য দায় কার সে সম্পর্কে খবর লেখা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় প্রশাসনের উচ্চতম পর্যায়ে হয়তো অর্থ বরাদ্দ হয়েছে কিন্তু মাঝের বা নিচের স্তরের আধিকারিক বা কর্মীদের দীর্ঘসূত্রিতায় বা অবহেলায় তা কার্যকর করা হয়নি যার ফলে হয়তো কোনও জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি বা শিল্প গড়ে ওঠেনি। এই ব্যর্থতাগুলিও খবরের বড় উপাদান। সরকারি সাফল্য বা উন্নয়নমূলক যা কিছু কাজ সেগুলিও নিঃসন্দেহে সংবাদের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু এগুলি সাধারণত সরকারি প্রচার মাধ্যমের দৌলতেই মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তবুও উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশে

উন্নয়নমূলক সংবাদের ওপর সাংবাদিকদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কখনও কখনও সাফল্যের সংবাদ, তা সে সরকারি বা বেসরকারি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, প্রকাশিত হলে শ্রমিক-কর্মীরা খুবই উৎসাহিত হন ও কাজের গতি অব্যাহত থাকে।

মানুষের সামাজিক জীবন, সামাজিক সমস্যা, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তার বিচ্যুতি যেমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের উপাদান, তেমনই নাগরিক অধিকার, নাগরিক কর্তব্য এবং নাগরিক সুখসুবিধা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্বপালনে অবহেলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সাংবাদিকের কাজ হবে কিছু কিছু বিষয়ে মানুষকে অবহিত করা, আবার একইভাবে কিছু কিছু বিষয়ে মানুষকে তার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

অপরাধ ও দুর্নীতি (Crime and Corruption) বিষয়ক প্রতিবেদন

আইনের বাইরে গিয়ে এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিসাধনকর যেসব কাজকর্মগুলি মানুষ করে সেগুলিই অপরাধ ও দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে।

অপরাধ লঘু অথবা গুরুতর তা ঠিক করা হয় সাধারণত সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়ার ওপর। যেমন, খুন জখম যে রকম অপরাধ, চলন্ত বাসে কেউ পকেট মারলে তা ঠিক সেই মাপের অপরাধ নয়। আবার সভ্যজগতে কেউ কাউকে অপমান করাটাও এক ধরনের অপরাধ।

অপরাধ দমনের জন্য পুলিশি ব্যবস্থা আছে। পুলিশবাহিনীর একটি সদর দফতর থাকে, যার অধীনে বিভিন্ন শাখা অফিস এবং থানাগুলি থাকে সাধারণ মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। প্রতিটি সংবাদপত্রই সেজন্য নিয়মিত এক বা একাধিক সাংবাদিককে নিযুক্ত রাখে শহর ও গ্রামের নানারকম অপরাধের খবর সংগ্রহ করার জন্য। এইসব সাংবাদিকদের কাজ হল অপরাধ দমনের কাজে নিযুক্ত যে সব পুলিশ অধিকর্তা আছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং অপরাধমূলক ঘটনাগুলিকে একটু অন্যরকমভাবে লেখা। অন্যরকম বলতে এটাই বোঝায় যে, অপরাধ যেহেতু মানুষের ব্যতিক্রমী কাজ তাই সে ব্যাপারে মানুষের জানার আগ্রহ বা কৌতূহল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। দেখা যায় কখনও কখনও কোনো চুরির ঘটনার থেকেও কী কৌশলে সেই চৌর্যবৃত্তিটি সম্পন্ন হয়েছে তার বিষদ বিবরণ এবং সেই চোরকে ধরতে গিয়ে পুলিশ যে পাল্টা কৌশল ব্যবহার করে সেই কাহিনী অনেক বেশি চাঞ্চল্য জাগায় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একইভাবে কোনো হত্যার থেকে তার কৌশল বা ছকের নতুনত্ব বা বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার ঘটনা কুশলী এবং অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের লেখায় অদ্ভুতভাবে ফুটে ওঠে এবং তা সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে।

দুর্নীতি সাধারণত চোখের আড়ালেই ঘটে থাকে। অনেক সময় তার নথিপত্র সাংবাদিকরা পরিশ্রম করে এবং সংবাদসূত্রের জোরে জোগাড় করে থাকেন। এঁদের দক্ষতা তাই প্রশ্নাতীত। যে সমস্ত সাংবাদিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির খবর প্রকাশ্যে আনেন তাঁদের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা থাকা একান্ত আবশ্যক। তার মধ্যে প্রধান হল হিসাবশাস্ত্র (Accountancy) এবং প্রশাসনিক রীতিনীতির ওপর বিশেষ দখল। একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যায়—সরকারি কোনও বিভাগে বেশ কিছু টাকা নয়ছয় হয়েছে। অর্থাৎ যে টাকা যে খাতে খরচ হওয়ার কথা ছিল খাতা-কলমে দেখানো হলেও তা আদৌ খরচ হয়নি। এখন, সেই টাকাটা কে বা কারা আত্মসাৎ করেছে তা যদি কোনও সাংবাদিক প্রকাশ করতে পারেন তাহলে একই সঙ্গে কাগজের গুণমান বৃদ্ধি পায়, সমাজের কল্যান হয় ও তাঁরও সুনাম বাড়ে।

একথা বলাই বাহুল্য যে, এই ধরনের খবর প্রকাশ করার পিছনে শুধুমাত্র সাংবাদিকের অনুসন্ধিৎসাই যথেষ্ট নয়, নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র বা সংবাদসূত্র থাকাটাও খুব জরুরি। সাংবাদিকের এই কাজে সরকারি অফিসার, পুলিশ কর্মচারী থেকে শুরু করে প্রতারণার শিকার হয়েছেন এমন মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এমন কি আইনজীবীও সহায়ক হতে পারেন। তাই দুর্নীতির খবর যে সাংবাদিক প্রকাশ্যে আনেন তাঁর সমাজের প্রায় সর্বস্তরের অবাধ যাতায়াত থাকা চাই। আর, তার সঙ্গে চাই কঠোর অধ্যবসায়, ধৈর্য, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ বুদ্ধি ও গভীর মনন।

আইন আদালত (Law Court) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

যে কোনও শাসনব্যবস্থায়, বিশেষত গণতন্ত্রে, বিচারব্যবস্থার একটি বিশেষ স্থান আছে। আইনসভা, সরকার, কোনও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা অন্য কোনও ব্যক্তির কোন আদেশ, নির্দেশ বা কাজের ফলে যদি কোনও ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় বা অর্থহানি বা সম্মানহানি ঘটে তাহলে বিচারব্যবস্থার মাধ্যমেই তার প্রতিকার হতে পারে। সংবাদপত্রে কোর্ট রিপোর্টিং তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নতর আদালতগুলি—যেমন, মুন্সেফ আদালত, জজ আদালত, মহকুমা আদালত বা জেলা আদালতগুলির দায়রা বা Criminal বিভাগে যেমন নিত্যই বহুরকম অপরাধ, অত্যাচার বা বঞ্চনার মামলার ওপর রায় দেওয়া হয়, তেমনই রাজ্যস্তরে হাইকোর্ট একইসঙ্গে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করে থাকে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ধারাগুলির ব্যাখ্যা করে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে এবং একইসঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ওপর বিষয়ভিত্তিক মামলাগুলিতে রায় দিয়ে থাকেন। কোর্ট রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে তাই একইসঙ্গে দু-তিন রকমের দক্ষতা প্রয়োজন। অপরাধ সম্পর্কিত মামলাগুলি সম্বন্ধে লিখতে হলে যেমন প্রয়োজন Indian Penal Code (IPC)/Criminal Procedure Code (Cr.P.C.) সহ বিভিন্ন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে জ্ঞান ও সেইসঙ্গে মামলার গতিপ্রকৃতিকে একটু সরস ভাষায় পরিবেশন করার ক্ষমতা, তেমনই অন্যদিকে হাইকোর্টের রিপোর্টারকে বিভিন্ন দেওয়ানি আইন (Civil Procedure Code), কোম্পানি আইন, আয়কর আইন, বিক্রয়কর আইন, মোটরযান আইন (Motor Vehicles Act) প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রে সংবিধান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান খুবই প্রয়োজন। কোর্ট রিপোর্টারকে সবসময় মনে রাখতে হয় যে আদালতের লিখিত আদেশের বাইরে গিয়ে কোনরকম বাড়তি মন্তব্য বা ব্যাখ্যা করাটা গর্হিত কাজ বলে গণ্য হয় এবং তা আদালত অবমাননার (Contempt of Court) আওতায় পড়ে।

অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প (Economic, Business & Industry) বিষয়ক প্রতিবেদন

রাজনীতি দেশকে শাসন করে, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান যোগায় অর্থনীতি। আবার রাজনৈতিক মতাদর্শগত অবস্থান থেকেই রাজনৈতিক দলগুলি অর্থনীতিকে দেখতে চায়। তাই রাজনীতি ও অর্থনীতির শুরু ও শেষ খোঁজার চেষ্টা অনেকটা 'আগে ডিম না আগে মুরগি' সেই ধাঁধার মতো। সে যাই হোক, যাঁরা অর্থনীতি

ও ব্যবসাবাণিজ্য ব্যাপারে খবর লিখবেন তাঁদেরকে অর্থনীতির মূল বিষয়গুলি, যেমন—মূলধন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান বিভিন্ন বিষয়ে সর্বশেষ সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে হবেই। কোনও নীতির ভালো ও মন্দ দিক, সেইসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিল্পমহল ও বণিকসভাগুলির প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক স্তরে সেই সব নীতির প্রভাব অথবা কোনও বিশেষ আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিণতিতে এ ধরনের নীতি প্রণয়ন হলে তাও জেনে পাঠককে জানাতে হয়। আজকের বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সরাসরি প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে যেমন, ইদানীং ইরাকের ওপর আমেরিকার সম্ভাব্য আক্রমণের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের দাম ওঠানামার প্রভাব ভারতসহ সব তেল আমদানিকারী দেশের ওপরই পড়েছে। তেমনিই, আবার দেশে বা আন্তর্জাতিক স্তরে নির্মাণ (Construction) ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিলে ভারতের ইস্পাতশিল্পে মন্দা দেখা দেবে। তাই এই সমস্ত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ খুব সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করাটা অর্থনীতি ও শিল্পবাণিজ্য জগতের রিপোর্টারের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সরকারি শিল্পবাণিজ্য নীতি, ভর্তুকি (Subsidy) নীতি, বিক্রয়কর (Sales Tax) বা অধুনা আলোচিত গুণমানবর্ধিত কর (Value-added Tax), পণ্য ও সেবায় কর (GST), চুঙ্গি কর (Toll Tax), ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সুদের হারের ওঠানামা, শেয়ার বাজারের সূচকের ওঠানামা ইত্যাদি।

ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারি অনুদান, বিপণন, কাঁচামাল সরবরাহের সূত্র প্রভৃতি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে শিল্প বাণিজ্য-অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টার তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন না। কাজেই এই সব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের সম্যক জ্ঞান থাকাটা বাঞ্ছনীয়।

উন্নয়ন (Development) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সমাজের উন্নতি বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। একদিকে যেমন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রাস্তাঘাট, সেতু, পয়ঃপ্রণালী, উড়ালপুল, জলসরবরাহ, গৃহনির্মাণ, বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গবেষণাগার ইত্যাদি নির্মাণের খবর সরাসরি, অর্থাৎ প্রকল্পগুলির বিবরণ, বিস্তার, অর্থবরাদ্দ ইত্যাদি বিষয়সহ লেখাই হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিক বা development reporter-এর কাজ; অন্যদিকে তেমনই এসব কাজকর্মের ক্ষেত্রে গাফিলতি, বিচ্যুতি, দুর্নীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও মানুষকে এই সাংবাদিকরাই অবহিত করেন।

এছাড়া যে সব উন্নয়ন মানুষের পরিবেশ ও মনোজগৎকে প্রভাবিত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করাটাও এসব সাংবাদিকের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে মানুষের অংশগ্রহণ কীভাবে হচ্ছে তা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

খেলাধূলা (Sports) সম্পর্কিত প্রতিবেদন

খেলাধূলা বিষয়ক প্রতিবেদন এক অর্থে একটি বিশেষ ধরণের সাংবাদিকতা। সেজন্য এই ক্ষেত্রে সাংবাদিকের দক্ষতা হওয়া উচিত এমনই যে তিনি যেন নিজেকে খেলাধূলার জগৎ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। দেশবিদেশের প্রভূত জনপ্রিয় খেলা, যেমন—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, বেসবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস থেকে শুরু করে দাবা, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স্ সহ খেলাধূলার জগতের

গভীরে প্রবেশ করতে হয় ক্রীড়া সাংবাদিককে। প্রতিটি খেলাধূলার নিয়মকানুন, সেগুলির প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি, পরিসংখ্যান, ক্রীড়াবিদ্‌দের অতীত ও বর্তমান profile বা ব্যক্তিচিত্র প্রভৃতি বিশদ জেনে রাখা দরকার।

সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন খেলাধূলার প্রতি একটি স্বাভাবিক আগ্রহ। সম্ভব হলে নিয়মিত নিজে খেলাধূলায় অংশ নেওয়া। এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সাংবাদিক বুঝতে পারেন যে, তিনি যখন কোনও খেলোয়াড়ের প্রশংসা বা সমালোচনা করছেন প্রকৃতপক্ষে তা যুক্তিসংগত হচ্ছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়ই প্রকৃত বুঝতে পারেন যে একজন খেলোয়াড় যখন নির্দিষ্ট কোনও জায়গা বল গোলে পাঠান তখন তা কতটা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

আজকে টিভি-র কল্যাণে সরাসরি খেলাধূলা দেখার সুযোগ ঘটেছে। ক্রীড়া-সাংবাদিককে তাই খেলা ছাড়াও খেলোয়াড়দের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, অনুশীলন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু বিষয়েই জানতে হয় এবং মাঝে মাঝে সংবাদ হিসাবে পরিবেশন করতে হয়। সেইজন্য ক্রীড়া-সাংবাদিককে খেলোয়াড়, কোচ, ক্লাবের কর্মকর্তা, মাঠের কর্মকর্তা, এমনকি মালীদের সঙ্গেও হৃদ্যতা গড়ে তুলতে হয়। খেলার মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হয় শুধু খেলাই নয়, যাঁরা খেলছেন তাঁদের ছন্দোময়তা বা ছন্দোহীনতা, তাঁদের উত্তাপ বা শৈত্য, তাঁদের ঐশ্বর্য বা দৈন্য, তাঁদের জেতার তাগিদ অথবা খেলার আগেই হার-মানা মনোভাব।

ফ্যাশন (Fashion) বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোশাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন

সাংবাদিকতার জগতে ফ্যাশন বস্তু সর্বকনিষ্ঠ এবং হয়তো বা সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। সংবাদপত্র শুধুমাত্র সমাজের দর্পণ বা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়েই আবদ্ধ থাকেনি; বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে হয়ে উঠেছে অন্যান্য পণ্যের মতোই সাধারণভাবে কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে বিক্রয়যোগ্য একটি পণ্য। তাই তার কোন বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থান নেই। অর্থাৎ সমাজের উপতলার অথবা মধ্যবিত্তদের মধ্যে অধুনা ও ফ্যাশনদুরস্ত হওয়ার তাগিদ রয়েছে সেটাকেই সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়ে সংবাদপত্র পরিবেশন করছে ফ্যাশনের খবর। সংবাদ মাধ্যমের প্রভাবে আজকাল অবশ্য নিম্নমধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্তদের মধ্যেও ফ্যাশনদুরস্ত হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে বা তৈরি হয়েছে।

ফ্যাশন-সাংবাদিকতার জন্য তাই চাই ফ্যাশন-উদ্যোক্তা নানা ব্যবসায়ী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ। এছাড়াও প্রয়োজন পেশাদার মডেল অথবা চলচ্চিত্র শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। আর চাই আধুনিক ফ্যাশন সম্পর্কে ধারণা। কোন কোন আন্তর্জাতিক বা দেশি ডিজাইনাররা কখন/কোথায়/কী নতুন ডিজাইন আনছেন সেগুলি সম্পর্কে খোঁজখবর সংগ্রহ করা এবং মডেলের ছবিসহ সেগুলি প্রকাশ করাই হল ফ্যাশন-সাংবাদিকের প্রধান কাজ। রূপচর্চা যাঁর স্বাভাবিকভাবেই আসে বা যিনি কোনও না কোন সময়ে মডেলিং বা সিনেমা জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এরকম মানুষের পক্ষে ফ্যাশন-সাংবাদিকতা খুব স্বাভাবিকভাবেই উপযুক্ত কাজ হতে পারে। তবে, আদৌ যাঁর এরকম অভিজ্ঞতা নেই তিনিও পারবেন এই কাজ। তার জন্য চাই শিল্পীর চোখ আর ফ্যাশনমহলে গণসংযোগ।

বিজ্ঞান (Science) বিষয়ক প্রতিবেদন

এটি সর্বার্থে একটি বিশেষজ্ঞ-নির্ভর সাংবাদিকতা, যদিও উৎসাহী যে কোন ব্যক্তি ক্রমাগত চর্চা ও পড়াশোনার মধ্য দিয়ে এই বিষয়ে রিপোর্ট লেখার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে একটু কঠিন এই জন্যে যে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যে ধরনের জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে তার সঙ্গে শুধু তাল মিলিয়ে চলাই নয়, সাংবাদিককে বিষয়গুলি সাধারণ পাঠকের কাছে বোধগম্য করে উপস্থাপিত করতে হয়।

বিজ্ঞান-রিপোর্টিং-এ সাধারণত দুটি জিনিস গুরুত্ব পায়। একটি হল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবতম আবিষ্কার বা পুরাতন ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন ধারণার উদ্ভব। আর, অন্যটি হল—বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির মিলনে উদ্ভুত মানবকল্যাণমূলক আবিষ্কারের নতুন নতুন ঘটনা।

আধুনিক যুগে মাইক্রোবায়োলজি, জেনেটিক্স্, মহাকাশ-গবেষণা, সমুদ্র-গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর প্রতিনিয়তই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন আলোকপাত করছেন। আর, সেগুলির সঙ্গে পাঠকসমাজের পরিচয় করিয়ে দেন সাংবাদিক। সুতরাং সেইসব গবেষণালব্ধ ফল মানুষের পক্ষে ভালো না খারাপ সে বিষয়েও সাংবাদিককে ওয়াকিবহাল হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ''ক্লোনিং'' (এক প্রাণীদেহ থেকে কোষ নিয়ে অযৌন প্রক্রিয়ায় অন্যদেহে স্থাপন করে ঠিক একই রকম প্রাণী সৃষ্টি করা) নিয়ে, বিশেষ করে মানুষের ''ক্লোনিং'' করা নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা মানুষ সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জানতে পেরেছে বা পারছে। এই একইরকমভাবে বিজ্ঞান-সাংবাদিক আমাদের জানান যে, কীভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায় কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ আরও বেশি উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সুদূরের নীহারিকা থেকে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত মণিমুক্তার সন্ধান পর্যন্ত সবই উঠে আসে সংবাদপত্রের পাতায়, আর তার কৃতিত্ব বিজ্ঞান সাংবাদিকদেরই।

পরিবেশ ও বাস্তু-পরিবেশ (Environment and Ecology) সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(পরিবেশ বা বাস্তু-বিদ্যায় পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীজগতর সম্পর্ক আলোচিত হয়।)

পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়করা সবসময় উপলব্ধি করতে পারুন বা না পারুন, আমাদের এই সবুজ গ্রহটিকে রক্ষা করা এবং বাসযোগ্য করে রাখার দায়িত্ব প্রতিটি মানুষের। জাতি-রাষ্ট্রের (nation state) উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর (ethnic group) স্বকীয়ভাবে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা কখনও সীমিত করতে পারেনি পৃথিবীর আবহমণ্ডল, বায়ুস্তর অথবা মহাসাগরগুলির অবিচ্ছিন্নতাকে।

সভ্যতার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত কৃষি-সভ্যতা এবং তৎপরবর্তী পূরায় দু/আড়াইশো বছরের শিল্পসভ্যতার সময়কাল পর্যন্ত পৃথিবী যে এক সেই ধারণা স্বচ্ছ না হলেও আজকের দিনে প্রায় সকলেই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে, পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা না করে পরিকল্পনাহীন যন্ত্রসভ্যতার বিস্তার মানা প্রজাতির পক্ষে বিষময় হয়ে উঠেছে।

একথা ঠিকই যে কয়লা বা পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি ব্যবহার করে যন্ত্র চালিয়ে মানুষ প্রভূত সম্পদ সৃষ্টি করেছে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে। কিন্তু তার পরিণামে পৃথিবীর পরিবেশ হয়েছে সাংঘাতিকভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা এখন জানতে পারছি কলকারখানার ধোঁয়ায়, মোটরযানের ধোঁয়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন (ozone) স্তর ক্রমশই নিঃশেষিত হচ্ছে। যার ফলে সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মির (ultra-violet ray) সরাসরি পৃথিবীর বুকে নেমে আসার প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। বায়ুমণ্ডল ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। পরিবেশবিজ্ঞানীরা এমন সতর্কবাণীও দিয়েছেন যে, পৃথিবীব্যাপী এই উত্তপ্ততা (global warming) এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে তার ফলে মেরু অঞ্চল থেকে হিমবাহ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলভাগ এমনভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে যার ফলে পৃথিবীর নিচু অঞ্চলগুলি জলমগ্ন হয়ে যেতে পারে। একইরকমভাবে, সমুদ্রের জলদূষণ এবং বর্জ্য পদার্থ ফেলা যদি অবিলম্বে বন্ধ না করা যায় তাহলেও মানুষের এবং সমুদ্রের প্রাণিজগতের অপূরণীয় ক্ষতি অনিবার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তৈলবাহী কোনও জাহাজ ফুটো হয়ে গিয়ে জল যদি দূষিত হয়ে যায় তাহলে সামুদ্রিক জীব ও পাখি মারা যায় হাজারে হাজারে।

পরিবেশ রক্ষায় অরণ্যেরও যে একটি বিশেষ অবদান আছে সেকথা আমরা সবাই জানি। গাছ কাটা পড়লে কম বৃষ্টিপাত থেকে শুরু করে বাতাসে অক্সিজেন হ্রাস প্রভৃতি ঘটনা মানুষের জীবনে নিয়ে আসতে পারে অপূরণীয় ক্ষতি।

পরিবেশ-সংক্রান্ত রিপোর্টিং বা প্রতিবেদন করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও রাজ্যস্তরে প্রাসঙ্গিক যে সমস্ত সনদ (Charter) ও আইনকানুন আছে সেগুলিও ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। যেমন, সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষায় একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে, তাকে বলা হয় Earth Summit বা বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলন। সেখানে যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেগুলিকে সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি রূপায়ণ করে নিজ নিজ দেশে আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশে জল, বায়ু ও পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে এবং শব্দদূষণের বিরুদ্ধে বেশ কিছু আইন তৈরি হয়েছে। সেগুলিকে বলবৎ করার জন্য কেন্দ্রে আছে Central Pollution Control Board এবং রাজ্যগুলিতে আছে State Pollution Control Board। পরিবেশ সংবাদদাতা যেমন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খবর লক্ষ্য করে এদেশে সেগুলির প্রতিক্রিয়া নিয়ে মাথা ঘামাবেন, তেমনই তিনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং পরিবেশ রক্ষায় নিযুক্ত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা NGO-র সঙ্গে। তিনি যেমন লক্ষ্য রাখবেন যে কোথাও বেআইনিভাবে গাছ কাটা হচ্ছে কিনা, তেমনই তিনি লক্ষ্য রাখবেন যে কেউ কোথাও জলাজমি ভরাট করে নিয়ে বাড়ি তৈরি করছে কিনা। মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করতে তাই তিনি পরিবেশন করবেন দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে পরিবেশ রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ মানুষদের নির্ভীক সংগ্রাম।

স্বাস্থ্য (Health) বিষয়ক প্রতিবেদন

কথায় বলে স্বাস্থ্যই সম্পদ। প্রতিটি মানুষ ও জাতির সাফল্যের মূলে আছে পরিশ্রম বা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে মানুষের সুস্থ শরীরের ওপর। শরীরের সুস্থ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। প্রতিটি মানুষ চায় সুস্থ থাকতে। মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে। এরই মধ্যে আবার স্বাস্থ্য সবার আগে। এই স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন একদিকে সুষম খাদ্য, সক্রিয় স্বভাব ও নিয়মানুবর্তিতা আর অন্যদিকে প্রয়োজন সামাজিক ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে ভালো মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা।

চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার জন্য আছে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, নার্সিং হোম, পে-ক্লিনিক বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ডাক্তারি-ব্যবসায়। এসব কিছু ব্যবস্থার সবচেয়ে ওপরে আছে স্বাস্থ্য দফতর ও স্বাস্থ্যকর্মী। স্বাস্থ্য দফতরের কাজ অনেক বেশি, তাই একজন প্রতিমন্ত্রীরও প্রয়োজন হয়েছে। স্বাস্থ্যকৃত্যক অধিকার বা Directorate of Health Services-এর প্রধান স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্বাস্থ্য দফতরের স্বাস্থ্য সচিব বা Health Secretary ও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী অফিসার বা আধিকারিক আছেন যাঁরা সরকারের স্বাস্থ্য দফতর বা বিভাগ ও অধিকার বা directorate-এর বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

বিভিন্ন হাসপাতালে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়োগ বদলি সব কিছু স্বাস্থ্য বিভাগ বা অধিকার থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। হাসপাতালের মধ্যে আবার কয়েকটি আছে যেখানে শুধু রোগের চিকিৎসাই হয় না, চিকিৎসাক্ষম-বিজ্ঞান নিয়ে পড়ানোও হয় অর্থাৎ ডাক্তারি পড়ানো হয়। এসব হাসপাতালে যেমন একজন অধীক্ষক বা Super-intendent আছেন, তেমনই একজন অধ্যক্ষ বা Principalও আছেন। সব হাসপাতালেই বিভিন্ন রোগ বা অসুখের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন বিভাগ আছে এবং সেইসব বিভাগের বিশেষজ্ঞ-চিকিৎসকও আছেন। নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উপযোগী হাসপাতালও আছে, যেমন— প্রসূতি হাসপাতাল, সংক্রামক ব্যাধি-হাসপাতাল, টিবি হাসপাতাল, স্নায়ুরোগ-সংক্রান্ত হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল ইত্যাদি। আরও নতুন হাসপাতাল ও চিকিৎসা বিজ্ঞান কলেজ তৈরির পরিকল্পনাও আছে। আবার একইসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় হাসপাতালের ফি বৃদ্ধির ফলে সাধারণ গরীব মানুষ অনেক অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা যেমন আছে তেমনই আবার ফি না বাড়ালে সরকারের পক্ষেও হাসপাতাল চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

এইসব কিছুই স্বাস্থ্য প্রতিবেদককে মাথায় রাখতে হবে। তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে কোনও দূরারোগ্য ব্যাধির কোনও ওষুধ আবিস্কৃত হল কিনা, দেশে বা শহরে বিশেষ কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এলেন কিনা, কোনও হাসপাতালে নতুন ব্যবস্থা কিছু হচ্ছে কিনা, চিকিৎসায় গাফিলতির ফলে কোনও হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু হল কিনা, মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন নির্দিষ্ট কোনও বিষয় নিয়ে সরব বা সক্রিয় হয়ে উঠেছে কিনা, কোনও হাসপাতালের অধ্যক্ষ বা অধীক্ষককে বদলি করা হল কিনা, কোনও হাসপাতাল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে কিনা, হঠাৎ রক্তদান শিবির উদ্যোগটা কমে গেল কেন এবং প্রকৃতই সেই কারণে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের অভাব দেখা দিয়েছে কিনা, আই ব্যাঙ্কে কেউ কর্ণিয়া দান করেন না কেন ইত্যাদি অজস্র বিষয় আছে যেগুলি সম্পর্কে একজন স্বাস্থ্য-প্রতিবেদককে মোটামুটি ভালোভাবে জানতে হবে। এবং প্রয়োজনমতো সময়ে সময়ে মানুষকে সংবাদের মাধ্যমে জানাতে হবে।

স্বাস্থ্য প্রতিবেদককে এও জানতে হবে শহরে বা কোনও নির্দিষ্ট জায়গায়/এলাকায় কোনও বিশে, ধরনের অসুখ দেখা দিয়েছে কিনা, কোনও নির্দিষ্ট স্থানে মশার উপদ্রব বেড়েছে কিনা বা ম্যালেরিয়ার আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে কিনা, নাগরিক স্বাস্থ্যরক্ষার্থে কর্পোরেশন বা পুরসভা তার দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে কিনা, শিশু ও মায়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার স্বার্থে কী বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ জানতে চায় এবং তাদের জানার প্রধান উপায়ই হচ্ছে সংবাদপত্র। সুতরাং স্বাস্থ্য-প্রতিবেদককে সর্বদাই সজাগ থাকতে হবে এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত কোনও সমস্যা দেখা দিলে বা নতুন কোনও সুযোগ-সুবিধার সম্ভাবনা দেখা দিলে মানুষকে জানাতে হবে। মাঝে মাঝে নানা জায়গায় স্বাস্থ্য শিবির বা Health Camp-এর ব্যবস্থা

করা হয়, সে বিষয়েও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। এসব স্বাস্থ্য শিবির বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারি উদ্যোগে সংগঠিত হয়। অনেক সময় সরকারি উদ্যোগেও স্বাস্থ্য শিবির খোলা হয়। বিশিষ কোনও রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাদানের ব্যবস্থাও সময়ে সময়ে করা হয়। এর মধ্যে শিশুদের টিকাদানের ব্যবস্থা কোথাও হলে সেদিকে বিশেষ নজর রাখা দরকার। জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সর্বশেষ কী পরিস্থিতি, ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কার্যক্রম ঠিকমতো অনুসৃত হচ্ছে কিনা, অপুষ্টিজনিত কারণে অসুস্থ ও দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের জন্য কোনো বিশিষ ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি সব বিষয়েই নজর রাখতে হবে। নজর রাখতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বা কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা বা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা। স্বাস্থ্য-সাংবাদিককে এসব খবরও মানুষকে জানাতে হবে।

স্বাস্থ্য, অসুখ ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত সব খবরই সাংবাদিককে জানতে হবে ও মানুষকে তা জানাতে হবে। সুস্থ সমাজ ও সুলভ চিকিৎসা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার। কিন্তু মানুষকে সচেতন করা ও সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব।

সারাংশ

সংবাদের শ্রেণীবিন্যাস বা সংবাদ কত রকমের হতে পারে সে বিষয়ক এককটি পাঠ করলেন। এখন দেখা যাক, আলোচিত অংশে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে মূল তথ্যাদি কী আছে।

সংবাদপত্র যেহেতু সমাজের দর্পণ এবং রাজনীতি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে তাই সংবাদপত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে রাজনৈতিক সংবাদ। গণতন্ত্রে মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান আইনসভা। তাই গুরুত্ব পায় আইনসভা-সংক্রান্ত প্রতিবেদন, বিশেষত, বাজেট বা বাজেট-সংক্রান্ত নানা বিষয়। নগর ও সমাজজীবন-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয় একদিকে সামাজিক সমস্যা, সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য ও তার বিচ্যুতির ওপর ও অন্যদিকে নাগরিক অধিকার, সুখসুবিধা ইত্যাদির ওপর। আইন ভঙ্গ কর যেসব কাজকর্ম হয় ও যার ফলে সমাজের ক্ষতি হয় সেগুলি অপরাধ ও দুর্নীতি বলে গণ্য। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ, সমাজে, শাসনব্যবস্থায় বিচার-ব্যবস্থার একটি বড় স্থান আছে। স্বাভাবিকভাবেই আইন-আদালত-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুত্ব খুবই। রাজনীতি যেমন দেশ শাসন করে, অর্থনীতি তেমনি যোগায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান। সুতরাং অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক প্রতিবেদনের গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিবেদনের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। এ ধরনের প্রতিবেদন সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচায়ক। খেলাধূলা সম্পর্কিত সংবাদের পাঠক অসংখ্য এবং তাঁদের আগ্রহ সীমাহীন। খেলা ছাড়াও খেলোয়াড়দের ব্যক্তি-জীবন, রুচিপছন্দ, দীনতা ও উদারতা সবই সংবাদ। এছাড়া আছে ফ্যাশন বা শৌখিন রীতিনীতি, সাজপোশাকের রেওয়াজ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন যা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলায় ও নবতর প্রজন্মকে আকর্ষণ করে। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিবেদনে সাধারণত দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়। একটি বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার বা পুরাতন ধারণার অবসান। আর, অন্যটি বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তির মিলনে কল্যাণমূলক আবিষ্কার। পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষা না করে পরিকল্পনাহীন কর্মকাণ্ডের বিস্তার মানব প্রজাতির পক্ষে বিষময়। সেই জন্য পরিবেশ ও বাস্তু-পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে মানুষের সচেতনতা বাড়ানো খুব প্রায়োজন। প্রয়োজন সুস্থ সমাজ গড়ে

তোলা, প্রাথমিকভাবে যার মূল নিহিত আছে সমাজের প্রতিটি মানুষের সুস্বাস্থ্যের ওপরে। এই সুস্থতা সুনিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে নিয়মিত প্রতিবেদন যা সাংবাদিকদের সামাজিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

৩.৩.৫ ফিচার

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি সংবাদ ও তথ্য জানানোর কৌসলকে ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করেছে। আজ শুধুমাত্র সংবাদ জানানোর মধ্যেই সংবাদ মাধ্যমগুলি ক্ষান্ত নয়। তারও বিশেষ বিশেষ ধরন আছে; যা পাঠককে তথ্য ও সংবাদ জানানোর সাথে আনন্দও দেয়। ফিচার হল সেই সুখপাঠ্যের বিষয়।

ফিচারের সংজ্ঞা

ফিচারের ধরন ও তার কাঠামো কী হওয়া উচিত এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তবে ফিচার সম্পর্কে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক উইলিয়াম থ্যাকারের কথাটি একজন সাংবাদিকের মনে রাখা দরকার— "The most engaging power of an author to make new things familiar and familiar things new", অর্থাৎ চেনা জগতের অজানা দিক এবং অজানাকে জানানো ফিচার লেখকের কাজ।

লুইস আলেকজান্ডার মনে করেন ফিচার শুরু হয় রিপোর্টিং দিয়ে এবং পাঠকের কাছে ঘটনাটির বর্ণনা ও তার অর্থ পৌঁছে দেয়। জি.এফ.মট (G.F.Mott) এর মতে — "Features entertains, informs, teaches" অর্থাৎ ফিচার পাঠককে আনন্দ দেয়, তথ্য জানায় এবং কিছু শেখায়।

বিখ্যাত সাংবাদিক উইলিয়াম ব্লায়ার জি.ফিচার কি তা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন— "a detail presentation of facts in an interesting way adopted to rapid reading for the purpose of entertaining or informing the average persons" অর্থাৎ ফিচার হল এমন এক ধরনের লেখা যা দ্রুতপাঠের উপযোগী করে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করা হয়। ফিচারের উদ্দেশ্য গড়পড়তা সাধারণ পাঠককে তথ্য জানানো বা আনন্দ দেওয়া।

বিশিষ্ট সাংবাদিকদের মতে ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদনের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। ফিচারের তথ্য ও সংবাদকে শুধুমাত্র সবিস্তারে সাজিয়েই দেওয়া হয় না, তাকে আকর্ষণীয় ভঙ্গি পরিবেশন করাও হয়, যা পড়ে পাঠক আনন্দ পায়।

ফিচার ও সংবাদ প্রতিবেদন

সংবাদ প্রতিবেদনে কোন ঘটনা বা বিষয়ের তথ্যকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ফিচার কিন্তু তথ্য জানানোর সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পশ্চাদপট তুলে ধরে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশন করা হয়। এমনকি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হয় ফিচারে।

সংবাদ প্রতিবেদনের মত কে, কী, কখন, কোথায়, কেন এবং কেমনভাবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই ক্ষান্ত হয়না ফিচার লেখক। ফিচারকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ঘটনার প্রভাবকে ফিচারে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

ফিচারের বিষয়বস্তু

ফিচারের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন Sky is the limit. মূলত গভীর ও মননশীল পর্যবেক্ষণ থেকেই এর বিষয়বস্তু বার করে আনতে পারেন ফিচার লেখক। আসলে বিষয়ের নতুনত্বই ফিচারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

জে. ইউ. জি. রাও মহাত্মা গান্ধীর ছাগলের দুধ খাওয়া নিয়ে এক 'সাক্ষাৎকার' ভিত্তিক ফিচারে লিখে ছিলেন। সবাই জানেন গান্ধীজি ছাগলের দুধ খেতেন নিয়মিত। এ ধরনের বিষয়বস্তুকে নিয়ে লেখা ফিচার পাঠককে আকর্ষণ করেছিল। আবার পি.টি. ট্যান্ডন নেহেরুর সোভিয়েত সফরের সময় তাঁর রাঁধুনী 'বুধি'কে নিয়ে লিখেছিলেন— "The cook who is tomorrow" শীর্ষক ফিচার।

আসলে পাঠকের সামনে অজানা জগতের অজানা ঘটনা বা চেনা জগতের অচেনা কোনও মাত্রা তুলে ধরতে পারলে তা ফিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে।

ফিচারের বৈশিষ্ট্য

ফিচার বিনোদনমূলক বিষয়বস্তু হলেও তার প্রধান আকর্ষণ মানবিক স্পর্শে। ফিচার সংবাদ প্রতিবেদনের তুলনায় একটু হালকা চালের, হালকা মেজাজের লেখা এবং এটি সংবাদ প্রতিবেদনের মতে উল্টো পিরামিড পদ্ধতিতে লেখা হয়না।

ফিচারে তথ্যকে বিস্তৃত ভাবে সাজিয়ে দিলেই হয়না, প্রয়োজনে তথ্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন যা নতুন দিককে তুলে ধরতে সাহায্য করে। ফিচার নিরপেক্ষভাবে তথ্যের বিশ্লেষণ করে। পাঠককে কোনও একটি মতামতে চালিত করা ফিচার লেখকের কাজ নয়। ভালো ফিচার পাঠক গল্পের মত পড়ে যান. তবে ফিচার গল্পের মত কল্পনাপ্রসূত নয়; তা অবশ্যভাবেই তথ্যভিত্তিক।

একটা ভালো ফিচারের সাধারণত তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন—

১। সহজ সরল বর্ণনা

২। সুনিয়ন্ত্রিত রচনাশৈলী, যাতে পাঠকের বিরক্তিকর উপাদান অনুপস্থিত।

৩। প্রচুর ঘটনা বা বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটানো।

ছবির ব্যবহার

সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে ফিচারেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে ফিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক ছবি বা স্কেচের প্রচলন উল্লেখ করার মতো। যেমন ভ্রমণ সম্পর্কে ফিচার হলে সংশ্লিষ্ট জায়গার ছবি বা খেলাধূলা-সংক্রান্ত ফিচার হলে খেলোয়াড়ের ছবি অথবা খেলার এক বিশেষ মুহূর্তের ছবি ছেপে দেওয়া হয়।

ফিচার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন উপযুক্ত ও আকর্ষণীয় শিরোনাম, যা সাধারণ পাঠককে ফিচার পড়তে উৎসাহিত করে।

ফিচারের গুরুত্ব

সংবাদপত্রের ইতিহাসবেত্তারা বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে ফিচারের রমরমা। দেখা গেল উপন্যাস, ছোটগল্পের চেয়ে সংবাদপত্রের ফিচারের আকর্ষণ পাঠকের কাছে বেশি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রেডিও টিভির ক্রমপ্রসারের সঙ্গে পাল্লা দিতেই ফিচারের আবির্ভাব। আজকে ইলেকট্রনিক প্রচারমাধ্যমের ব্যাপক প্রসারের যুগে স্পট নিউজ মানুষ সংবাদপত্র দেবার অনেক আগেই পেয়ে যচ্ছেন। সংবাদপত্র তাই ডুব দিয়েছে সংবাদের অন্তরালে। তথ্য বিশ্লেষণ করে নতুন দিককে তুলে ধরা হয় ফিচারে, যা আদলে পাঠককে চিন্তার সূত্র যুগিয়ে দিতে সাহায্য করে।

মানুষের পাঠাভ্যাসও দ্রুত বদলাচ্ছে। উপন্যাস ও ছোটগল্পের মানবিক আবেদন পড়ার মত সময় মানুষ পাচ্ছে না। ফিচারের মানবিক স্পর্শেই সে স্বাদ মেটাচ্ছে। তাছাড়া ফিচারের মধ্য দিয়ে তথ্য জানানোর নতুন স্টাইল তাকে আলাদা গুরুত্ব দিয়েছে। সংবাদপত্রে ফিচার এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে ব্রায়ান নিকোলাস তাঁর 'Feature with Flair' গ্রন্থে ফিচারকে সংবাদপত্রের 'Soul' বা আত্মা বলে বর্ণনা করেছেন।

৩.৩.৬ মানবিক আবেদনমূলক প্রতিবেদন

এখন গণমাধ্যমগুলিতে চটকদার সংবাদ পরিবেশনের রমরমা ব্যাপার। মানবিক আবেদনমূলক সংবাদের বিষয়টি ধীরে ধীরে আড়ালে আড়ালে সরে যাচ্ছে। ফলত প্রশ্ন ওঠে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ কী ? তার গুরুত্ব কোথায়?

আজকের সংবাদ মাধ্যমে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ প্রতিবেদন খুবই আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছে। সংবাদ ডেস্ক ও রিপোর্টাররা, এমনকি সংবাদ সংস্থা পর্যন্ত এ ধরনের বিষয় ও প্রতিবেদন সম্পর্কে বিশেষভাবে মাথা ঘামাচ্ছে। স্বভাবতই, এই প্রেক্ষাপটে মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং কিভাবে তা পরিবেশন করতে হয় তা নিয়ে বিশেষভাবে মাতা ঘামাতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ

আক্ষরিক অর্থে যদি ধরা যায়, যে সংবাদ মানুষকে আকৃষ্ট করে তাই হল হিউম্যান ইন্টারেস্ট বা মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ সংবাদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে সমস্ত ধরনেরই খবরেই প্রথম শর্ত হচ্ছে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যোগ্যতা। যে খবর পাঠককে পড়তে আগ্রহী করে না, তা খবরই নয়। এটাই তো সাংবাদিকতায় সংবাদ নির্বাচনের প্রচলিত রীতি।

এই রীতিকে সামনে রেখে এ ধরনের সংবাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিচার্য বিষয়। পাঠকের মনে আবেদন তৈরি করতে পারলেই কোনও 'সংবাদ'কে 'মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ' সংবাদ বলা যায় না। সমস্ত ধরনের 'সংবাদ' এরই আবেদন আছে বা থাকা উচিত পাঠকের কাছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই 'আবেদন' এক ধরনের নয়। ঘটনা বা তথ্য জানার জন্য পাঠক যে প্রতিবেদন পড়ছেন তার আবেদন এক ধরনের। কিন্তু 'জোড়া কন্যা গঙ্গা-যমুনা ভোট দিতে যাবে' এই প্রতিবেদনের আবেদন কি একই ধরনের? আবার রামনাথ কোবিন্দ

রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম ভোট দিলেন' এই সংবাদ প্রতিবেদনের সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার ভোট দেবার খবরের কোনও পার্থক্য নেই। দুটো সংবাদেরই 'আবেদন' আছে পাঠকের কাছে। কিন্তু পৃথক ধরনের 'আবেদন'। রাষ্ট্রপতি ভোটদানের খবরটার রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণের আবেদন আছে। কিন্তু 'গঙ্গা-যমুনা' ভোটার হিসেবে সাধারণ, রাজনৈতিক গুরুত্বে তাদের খবর হয়ে ওঠার কোনও যোগ্যতা নেই। কিন্তু গঙ্গা-যমুনা রাজনৈতিক বিবেচনায় ভোটার হলেও, সবাই জানেন, তাদের দেহ পরস্পরের সঙ্গে জোড়া, সেই অবস্থাতেই তাদের বয়স আঠের বছর পার হয়েছে এবং তারা ভোট দেবে। এটা 'সংবাদযোগ্য' ঘটনা তার কারণ তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার। এর 'আবেদন' পাঠকের আবেগের (emotion) কাছে। ভোট নিয়ে গুচ্ছ খবরের ভিড়েও গঙ্গা-যমুনার খবরটি পাঠকের মনের নরম কোণে দাগ কাটবে। একেই বলে 'মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ' সংবাদ বা Human-interest news।

বৈশিষ্ট্য

মানবিক আবেদন- সমৃদ্ধ সংবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যেতে পারে যেমন—

১) মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের মূল আবেদন পাঠককের মানবিক আবেগ ও অনুভূতিপ্রবণতার কাছে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

২) সাধারণভাবে সংবাদের ক্ষেত্রে কি, কখন, কোথায়, কিভাবে ঘটল বা কারা ঘটালো'র মতো পয়েন্টগুলো যেরকম ও যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ, মানবিক-আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রে তা সেভাবে হয় না। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যতিক্রমধর্মীতা। ঘটনার স্থানকালপাত্রপাত্রীর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল বিষয়টি পাঠক বা দর্শক-শ্রোতার অনুভূতিপ্রবমতায় নাড়া দিতে পারবে কিনা।

৩) সাধারণ সংবাদের ক্ষেত্রে সংবাদযোগ্য হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাৎক্ষণিকতা বা 'immediacy'। ঘটনা কতাটা 'টাটকা' তা অন্যতম প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ সংবাদের তা হয় না। আজকের খবর কালকে বাসি, অর্থাৎ তা সংবাদ— এমনটা এক্ষেত্রে ঘটে না।

৪) সাধারণভাবে, সংবাদ-যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনও বিষয় বা ঘটনা 'সংবাদ' হিসেবে গুরুত্ব পাবার সময় ঘটনার সাম্প্রতিকতম পরিণতি বা চূড়ান্ত পরিণতি কী, সেটাই নজর করা হয়, অর্থাৎ সংবাদ সাধারণভাবে চূড়ান্ত পরিণতিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পয়েন্ট। এটাই হার্ড নিউজের রীতি। সেকারণেই সংবাদ প্রতিবেদনে থাকে ইণ্ট্রো। প্রথমেই পাঠককে 'পরিণতি' অংশটি ধরিয়ে দিয়ে খবর পরিবেশন শুরু করা হয়। মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ইণ্ট্রোরীতি ও মানবিক আবেদনে-সমৃদ্ধ সংবাদের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না। যেমন ধরা যাক, 'মানবশিশু পাহারায় তিন কুকুর— এই যে সমবাদটি। এর চূড়ান্ত পরিণতি কী? কিন্তু যদি হাসপাতালে বাচ্চাকে খেয়ে ফেলত কুকুর, তাহলে তার সংবাদ হিসেবে মেজাজ হতো আলাদা, তার ইণ্ট্রো অথবা লিডও পৃথক হতো।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন সাধারণভাবে সফ্‌ট নিউজ বা নরম সংবাদ।

মানবিক আবেদনমুখী দৃষ্টিকোণ

মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চলে আসে, যা আধুনিক সংবাদ প্রতিবেদন রীতিতে চালু হয়ে উঠছে নজরকাড়া ভাবে।

এ আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে, হয়তো শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ বিষয় বা ঘটনার ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রতিবেদন হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ একটি সংবাদ হয় মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ বলে বিবেচিত হতে পারে, নয় পারে না।

কিন্তু এটা হলো মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ প্রতিবেদন সম্পর্কে একটি একমাত্রিক ধারণা। অভিজ্ঞ ও দক্ষ সাংবাদিকরা মনে করেন যে কোন সংবাদযোগ্য ঘটনাতে হার্ডনিউজ বার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদনকে দেখতে হবে, তাতে মানবিক আবেদনের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনও খবর করা যায় কিনা। কোনও সংবাদযোগ্য ঘটনার 'হার্ডনিউজ'-এর একটা দিক যেমন থাকে তেমনি থাকতে পারে মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ একটি বা একাদিক দিক। চিত্রকলা-সংক্রান্ত কোন প্রদর্শনী রিভিউ করতে গেলে রঙ সম্পর্কে ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে চিত্রকলা রিভিউ করা অসম্ভব।

শিরোনাম ও ছবির ব্যবহার

প্রদর্শনী রিভিউকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিষয়ের দিক থেকে সামঞ্জস্য রেখে একটি শিরোনাম নির্বাচন করতে হয়। সাধারণ পাঠক যাতে রিভিউটি পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন সেজন্য প্রদর্শনীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছবি রিভিউ প্রকাশের সঙ্গে তুলে ধরতে হয়, নিচে দিতে হয় শিল্পীর নাম।

৩.৩.৬ সাক্ষাৎকার প্রকার ও কৌশল

সাক্ষাৎকার মারফত সাক্ষাৎদাতার নিজস্ব বাক্যে, তথ্যে কোনও বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে মতামত, কারণ তুলে ধরা হয়। চলতি কোনও ঘটনাকে ঘিরে সাক্ষাৎদাতার মতামতকে সামনে রেখে অন্যান্য পাঠক, শ্রোতা দর্শকরা তাদের মতামত সম্পর্কে একটা সমীকরণ টানতে পারেন।

সাক্ষাৎকার কী

কোনও ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের একটি উপায় সাক্ষাৎকার। প্রতিবেদনকে জীবন্ত, মানবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য একটি ঘটনা, কোনও বিষয় বা ব্যক্তিকে ঘিরে তার আশপাশের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। রিপোর্টকে সার্বিক অর্থে সুন্দর ও তথ্যবহুল করে তোলার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে রিপোর্টার বা ঘটনা অনুসন্ধানকারীর এই যে আলাপ-আলোচনা এটাই সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার সাংবাদিকতার একটি বিশিষ্ট দিক।

সাক্ষাৎকারের ধরন ও প্রকার

উপস্থাপনা, বাচনভঙ্গি, প্রশ্নোত্তরশৈলী, বিষয়বস্তু ইত্যাদির ওপর সাক্ষাৎকারের ধরন নির্ভর করে। সাক্ষাৎকারগুলি হল—

(ক) সংবাদ সাক্ষাৎকার : ইতিমধ্যে ঘটে গেছে কিংবা খুব শিগ্‌গির ঘটতে যাচ্ছে এমন কোনও ঘটনার সংবাদকে কেন্দ্র করে যে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়— সেটাই সংবাদ সাক্ষাৎকার। মূলত সাম্প্রতিক কোনও সংবাদের বিষয়বস্তুর ওপর কর্তৃপক্ষের মতামত সংগ্রহ করে পাঠকের সামনে তুলেই ধরাই এর উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদানকারী যা বলেন সেটাই হল বিষয়। যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তিনি সংবাদসূত্র মাত্র।

রাজনীতি, বাণিজ্য, শিক্ষা, অপরাধ, আবিস্কার, খেলাধূলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি যে কোনও বিষয়ে সংবাদ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যেতে পারে।

(খ) ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার : এ ধরনের সাক্ষাৎকারে ব্যক্তিই প্রধান। এর মাধ্যমে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে যে দিকগুলি পাঠকের মনে কৌতূহল বা জানার ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে সাংবাদিক সেই সেই দিকগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এখানে সাংবাদিকের সৃজনশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(গ) সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার : এক্ষেত্রে কোনও একটা বিষয়ের ওপর একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সকলের মতামত থেকে একটি মূলসুর বেরিয়ে আসে। সাংবাদিক সেই মূল বক্তব্যই তুলে ধরেন পাঠকের কাছে।

(ঘ) দলগত সাক্ষাৎকার : একে সংবাদ সাক্ষাৎকারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ ধরনের সাক্ষাৎকারে কোনও বিশেষ ব্যক্তি নয়, বরং কোনও বিশেষ দল কিংবা গোষ্ঠীর একদল ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। যেমন— পাককল-ধর্মঘট প্রতিবেদন করতে গেলে সাধারণ শ্রমিক থেকে শুরু করে মালিক পর্যন্ত সকলেরই মতামত শুনতে হয়। এখানে সবার মতই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে ভারসাম্যমূলক সংবাদ প্রকাশে এ ধরনের সাক্ষাৎকার সহায়ক।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বপ্রস্তুতি

সাক্ষাৎকার গ্রহণে পূর্বপ্রস্তুতি দরকার। প্রস্তুতি ছাড়া সাক্ষাৎকার নিতে যাওয়া ঠিক নয়। তবে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি কী হবে তা নির্ভর করে বিষয়ের প্রকৃতির ওপর।

কোনও ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিতে যাবার আগে সাক্ষাৎদাতার কাছে কি জানতে হবে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়ে অসংলগ্ন প্রশ্ন করলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের উদ্দেশ্য মাটি হয়ে যেতে পারে। খুনের ঘটনায় দারোগার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় তথ্যকে সামনে রেখেই প্রশ্ননির্বাচন জরুরী। স্বাভাবিক কারণেই এ ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহম পূর্বে কিছু সম্ভাব্য প্রশ্নমালা তৈরি করে নিলে সুবিধা হয়।

আবার এমনও হতে পারে যে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে বিষয়ের পরিবর্তন করতে হতে পারে। ধরা যাক খুনের মামলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি নিয় ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অব পুলিশের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি ওই নির্দিষ্ট খুনের ঘটনা এড়িয়ে ওই ধরনের খুনের ব্যাপারে কোনও রাষ্ট্রীয় তদন্ত বা নীতির ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে বেশি আগ্রহী। এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে বিষয় পরিবির্তনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ-পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সাক্ষাৎদাতার মেজাজ-মর্জি সম্পর্কেও আগাম ধারণা করে নিতে হয়। অনেকেই মনে করেন সাক্ষাৎদাতার ছবি দেখলে এ ব্যাপারে আগাম ধারমা আন্দাজ করা যায়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের নিয়ম

সাক্ষাৎকার গ্রহণপর্বই সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সাক্ষাৎকার-প্রদানকারীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। প্রতম কাজ হল যথাসময়ে, যথাস্থলে উপস্থিত থাকা এবং দেখা করা। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার শুরুতে একটা ঘরোয়া আবহাওয়া তৈরির দিকে নজর দিতে হয়। আলাপচারিতার মধ্য দিয়েই মূল প্রশ্নের দিকে এগোতে হয়। আলোচনাচক্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে কেন্দ্রীভূ ত করতে হবে। এরপর প্রয়োজন সাক্ষাৎকারের গভীরে প্রবেশ করা। কিছু কিছু প্রশ্নে সাক্ষাৎকার-প্রদানকারী এতে বিব্রত ও আস্বস্তিবোধ করলে তা মোকাবিলা করার কৌশলও ঠিক রাখতে হবে। একপরই সাক্ষাৎকারীকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে। এরজন্য আবার হাল্‌কা কথাবার্তায় ফিরে আসতে হবে।

বক্তব্য লেখা : সাক্ষাৎকারদানকারী যেসব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবেন তা হুবহু টুকে নিতে হবে। নোটবুকে লেখার আগে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাৎকারদানকারী যে কথা বলবেন তা যদি ঠিক ঠিক লিপিবদ্ধ করা না হয় তবে রিপোর্ট লেখার সময় অসুবিধা হবে। রিপোর্ট প্রকাশিত হলে আরও অসুবিধা হতে পারে। রিপোর্টার বিপদে পড়তে পারেন।

রেকর্ড করা : নোট করার সময় অসুবিধা দেখা দিলে মোবাইল রেকর্ডারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবে মোবাইলরেকর্ডার ব্যবহার করা যাবে কি না সে ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে। অনেকে মোবাইলরেকর্ডিং পছন্দ করেন না। ব্যাপারটি আগেই জানার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে বিস্তৃত নোট নেবার চেষ্টা করতে হবে। সাক্ষাৎকারের পর কেউ কেউ আবার চূড়ান্তভাবে কী ছাপা হবে তা দেখতে চান। রিপোর্টার যদি মনে করেন তা দেখালে ক্ষতির কারণ নেই তবে তা দেখাতে পারেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য লুকিয়ে মোবাইলরেকর্ডিং করা উচিত নয়। এতে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ অবস্থায় নোটবুক এবং স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করা জরুরী।

অনেক সময় আবার সাক্ষাৎকারদানকারী ব্যক্তি কথা বলার সময় বলতে পারেন 'অফ দি রেকর্ড' যার অর্থ এখন যা বলছি তা ব্যবহার করা যাবে না। 'অফ দি রেকর্ড' বলার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলরেকর্ডিং বা নোট নেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। 'অফ দি রেকর্ড'-এর অন্তর্গত কথাবার্তা প্রতিবেদনে ব্যবহার করা উচিত নয়। এমন কোন কথা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় নয় যা সাক্ষাৎকারদানকারীর ক্ষতি করে। সে কারণে 'অফ দি রেকর্ড'-এর বিষয়টি স্মরণে রাখা উচিত।

প্রশ্ন করার কৌশল : সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার আগে কিছু প্রশ্ন তৈরি করা জরুরী। তবে এসব প্রশ্নের কোনটি আগে-পরে করতে হবে তা নির্ধারণ করা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোনও স্পর্শকাতর প্রশ্ন দিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু করলে সাক্ষাৎকারের আসল উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। একারণে হালকা প্রশ্ন দিয়ে সাক্ষাৎকার শুরু করা বাঞ্ছনীয় সেনসেটিভ এবং কঠিন প্রশ্নগুলির শেষের দিক তুলে ধরা উচিত। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বড় প্রশ্ন করা অনুচিত এবং প্রশ্নে নিজের মতামত প্রকাশ করা ঠিক নয়।

সাক্ষাৎকারের পরিবেশ : সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান বা পরিবেশ কীহবে তা নির্ভর করে সাক্ষাৎকারের বিষয় ও ব্যক্তিত্বের ওপর। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের স্থান যেমন কোনও রেলস্টেশন হতে পারে না তেমনি একজন আদিবাসীর সাক্ষাৎকারের স্থান পাঁচতারা হোটেলের শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষ হলে বেমানান লাগে। সাক্ষাৎকারের পরিবেশ যথাযথ ও অনুকূল না হলে আলাপচারিতায় ছেদ পড়তে পারে এবং তার আসল বৈশিষ্ট্য ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

লিখন শৈলী

সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন লেখার স্টাইল প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব স্টাইল। সে ব্যাপারে লেখকের নিজস্বতা থাকতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎকার নেবার পর যা জরুরী সেটি হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাক্ষাৎকার লিখে ফেলা। এতে তথ্য হারিয়ে যাবার ভয় কম থাকে। সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন লেখার পরও কিছু কাজ বাকি থাকে। তা হল প্রয়োজনবোধে প্রতিবেদন সাক্ষ্যৎকারদানকারীকে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় কাটছাট বা সংযোজন।

সম্পাদকীয়

একটি সম্পাদকীয় একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে একটি প্রকাশনার সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি হয়। এটি একটি দেশের এজেন্ডা চালানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পাদকীয় সাধারণত স্বাক্ষরবিহীন হয়। এটি জনমতকে প্রভাবিত করে, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা প্রচার করে, কখনও কখনও সম্পাদকীয় কোনও ইস্যু গ্রহণের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে বা অনুপ্রাণিত করে।

সম্পাদকীয় একটি সংবাদপত্রের প্রাণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সংবাদপত্রের নীতি এবং অবস্থান প্রতিফলিত করে। সম্পাদকীয়গুলি সমাজে বিরাজমান সমস্যাগুলির জন্য পরামর্শ এবং সমাধানও দেয়।

সম্পাদকের নামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হলেও সেগুলি সবসময় সম্পাদক নিজেই লেখেন না। একটি পত্রিকায় সাধারণত সম্পাদকীয় লেখকদের একটি প্যানেল থাকে যারা এই কাজটি সম্পন্ন করেন। সংবেদনশীল সমস্যাগুলি প্রায়শই সম্পাদক নিজে বা সংবাদপত্রের নীতিগুলির সাথে পরিচিত কেউ পরিচালনা করেন।

সম্পাদকীয় লেখাকে সর্বদা এমন একটি শিল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে যা অনুশীলন এবং ভাষার ন্যায়বিচারের ব্যবহারের মাধ্যমে আয়ত্ত করা দরকার। এটি কোনও সংবাদ প্রতিবেদনের স্টাইলে বা কোনও নিবন্ধের বিন্যাসে লেখা হয় না। একটি ভাল সম্পাদকীয় কেবল চিন্তার প্রক্রিয়াটিকেই উস্কে দেয় না, পাঠযোগ্যও হয়।

যদি আপনাকে কোনও বিষয়ে সম্পাদকীয় লিখতে বলা হয়, আপনার লেখার সময় এই উপাদানগুলি মাথায় রাখার চেষ্টা করা উচিত :

ক) সম্পাদকীয়টির অন্যান্য সংবাদের মতো একটি ভূমিকা, বডি এবং উপসংহার থাকতে হবে।

খ) এটি ইস্যুটির, বিশেষত জটিল সমস্যাগুলির একটি উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা সরবরাহ করা উচিত।

গ) এটি একটি সময়োচিত সংবাদ কোণ থাকা উচিত।

ঘ) পাঠকের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার জন্য সম্পাদকীয়টিরও বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির মতামত থাকতে হবে।

ঙ) সম্পাদকীয় ব্যক্তিত্ব নয়, ইস্যুতে পাঠকদের জড়িত করার চেষ্টা করা উচিত। আপনার নামকরণ বা প্ররোচিত করার ক্ষুদ্র কৌশলগুলি থেকে বিরত থাকা উচিত।

চ) সম্পাদকীয়তে সমালোচিত হওয়ার সমস্যা বা ইস্যুটির বিকল্প সমাধান সরবরাহ করা উচিত। পাঠকের দৃষ্টি আকষর্ণ করতে শুরুটিকে আকর্ষণীয় করে তুলুন। বেশিরভাগ সময় তৃতীয় ব্যক্তিকে লিখুন। প্রচারক হওয়ার চেষ্টা করবেন না। বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি ব্যবহার করুন এবং খাঁটি তথ্যসহ তাদের পেশ করুন।

ওপ-এড পৃষ্ঠা

মেরিয়াম-ওয়েবস্টার অভিধানে একটি ওপ-এড পৃষ্ঠার সংজ্ঞা দেয় ''সাধারণত একটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির একটি পৃষ্ঠা''।

ওপ-এড সমার্থকভাবে কোনও নিবন্ধ বা প্রবন্ধের জন্য কোনও ইস্যুতে কোনও লেখকের মতামত দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। অভিধানটি এটিকে সংজ্ঞায়িত করেছে, ''একটি সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধ যা লেখকের মতামত দেয় এবং এটি এমন কেউ লিখেছেন যিনি সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিন দ্বারা নিযুক্ত নয়।''

ওপ-এড লেখকদের জন্য টিপস

- একটি ওপ-এডের উদ্দেশ্যটি হল মতামত দেওয়া। এটি কোনও সংবাদ বিশ্লেষণ বা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠি নয়।
- কোনও পত্রিকা কলামের স্টাইলে কোনও ওপ-এড লেখা উচিত নয়। একটি ওপ-এড লেখক হলেন এমন বিশেষজ্ঞ যিনি কেবল বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন।
- আপনার যুক্তি সমর্থন করতে তথ্য, পরিসংখ্যান এবং অধ্যয়ন ব্যবহার করুন।
- পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রথমে সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ অনুচ্ছেদের সাথে ওপ-এডটি লিখুন।

The op-ed page

৩.৩.৭ ক্রোড়পত্র (Supplements)

সংবাদপত্রগুলি পাঠকদের ব্যস্ততা বাড়ানোর জন্য বিশেষ নিবন্ধ, উইকএন্ডের পুল-আউট এবং ক্রোড়পত্র নিয়ে আসে। বিশেষ নিবন্ধগুলি একটি বিশদ বিশ্লেষণের পাশাপাশি কোনও সমস্যা, একটি জায়গা এবং ইভেন্টের দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে। সাধারণত একটি বিশেষ নিবন্ধ পত্রিকার অভ্যন্তরে প্রকাশিত হয়, সপ্তাহান্তে পুল-আউট এবং পরিপূরক পাঠকদের বিভিন্ন স্বাদ পূরণ করে। সমস্ত বড় সংবাদপত্র সপ্তাহান্তে পুল-আউট এবং ক্রোড়পত্রগুলি নিয়মিত প্রকাশ করে।

বিশেষ নিবন্ধগুলির জন্য নীতি রচনাগুলি, উইকএন্ডের পুল-আউটস বা ক্রোড়পত্রগুলি কমবেশি একই থাকে। আপনাকে অবশ্যই একটি আকর্ষণীয় এবং সুস্পষ্ট পদ্ধতিতে লেখার চেষ্টা করতে হবে। আপনার উদ্দেশ্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

৩.৩.৮ সঙ্গীত সমালোচনা বা পর্যালোচনা

ইংরেজি 'মিউজিক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সংগীতবিদ্যা। আবার কবিতায় সুরারোপ করাও মিউজিকের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য মিউজিক রিভিউ বলতে এখানে সাম্প্রতিক সময়ের সংগীত রিভিউকে বোঝানো হল।

গান বা সঙ্গীত বিনোদনের এক বিশেষ মাধ্যম। গানের বিশাল বাজারকে সামনে রেখে ছোটবড় বহু কোম্পানি গড়ে উঠেছে। তৈরি হচ্ছে গানের সিডি। এইসব কোম্পানিগুলি সিডি এবং চিপস্ সংবাদপত্র অফিসে পাঠান রিভিউ-এর জন্য।

সমালোচনাকারী

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে সংবাদপত্রের সাংস্কৃতিক বা বিনোদনের পৃষ্ঠার দায়িত্বে থাকেন একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তাঁরা নিজে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে মিউজিক রিভিউ করিয়ে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সংবাদপত্র দফতরগুলিতে বহু সিডি আসে রিভিউ-এর জন্য। কিন্তু সবগুলিই রিভিউ করা সম্ভব হয় না। সংবাদপত্রগুলি তাই বেছে বেছে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী গুটিকয়েক মিউজিক রিভিউ করে থাকে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় মিউজিক রিভিউ খুব জনপ্রিয়।

সঙ্গীত সমালোচনা কী

মিউজিক রিভিউয়ে সিডির নাম কে বা কারা গেয়েছেন তাদের বয়স, প্রকাশক কোম্পানীর নাম এবং সিডির দাম উল্লেখ করতে হয়। সিডিতে কটি গান আছে সে কথাও তুলে ধরতে হয়। তবে ভাল মিউজিক রিভিউয়ে গায়কের কণ্ঠমাধুর্য, সুর তাল-লয়ের ওঠানামা প্রসঙ্গে সমালোচক তাঁর মতামত প্রকাশ করে থাকেন। নতুন শিল্পীদের দুর্বলতা যেমন তুলে ধরে, তেমনি শিল্পীর ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে একটা আভাস দেবার চেষ্টা করা হয়। মিউজিকের নতুন আঙ্গিক, গানের খামতি বা কোন গানটি আরো একটু ভালো করা যেত, এ বিষয়গুলিও সমালোচক তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন। এছাড়া প্রতিদিনই নানারকম সংগীতানুষ্ঠান হয়। সেই অনুষ্ঠানের কভারেজ থাকে সংগীতের পাতায়।

ছবির ব্যবহার

মিউজিকে সিডি, অ্যালবামের প্রচ্ছদের ছবি, গায়ক-গায়িকার ছবি দিয়ে সমালোচনাটিকে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়।

মিউজিক রিভিউ-এর প্রয়োজনীয়তা

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকস্তরে মিউজিক বা গানের একটা বড় বাজার রয়েছে। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক সংগীতপ্রিয় শ্রোতা রয়েছেন, যারা নতুন নতুন শিল্পী ও তাদের গান সম্পর্কে আগ্রহী। তাদের প্রিয়শিল্পীর নতুন সিডি অথবা ইউটিউবে নতুন কিছু প্রকাশিত হল কিনা তা জানতে চান। আবার নতুন শিল্পীরও সন্ধান করেন তরা।

মিউজিক রিভিউ শ্রোতাদের ওই চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে। এদিক থেকে বিচার করলে মিউজিক রিভিউ-এর সংবাদমূল্য কম নয়। পাঠক এই রিভিউ পড়ে সিডি কেনায় অথবা ইউটিউবে অনুষ্ঠান দেখায় আগ্রহ প্রকাশ করেন।

৩.৩.৯ পুস্তক সমালোচনা

পুস্তক সমালোচনা বা বুক রিভিউ-এর জন্য কোন পূর্বনির্ধারিত সর্বসম্মত বিধিনিয়ম নেই। রিভিউ-লেখকের নিজস্ব কুশলতা, কাগজের নীতি, বইয়ের ধরন, পাঠকের রুচি-চাহিদা—এসবের ওপর নির্ভর করে তা গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তাই বাঁধাছক অচল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমী দেশগুলিতে এবং সম্প্রতি আমাদের দেশে সীমিতভাবে বেতার, দূরদর্শনে পুস্তক সমালোচনার চল থাকলেও সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রেই তা জনপ্রিয়। চলতি রীতি অনুযায়ী দৈনিক সংবাদপত্রে বুক রিভিউ প্রকাশিত হয় সপ্তাহের কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে।

সমালোচনাকারী

বই রিভিউ করার জন্য অনেক সংবাদপত্রে নিজস্ব স্টাফ থাকে। তবে আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বই রিভিউ করানো হয়। অধ্যাপক, গবেষকরাই মূলত একাজ করে থাকেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা কাগজের বেতনভোগী নিয়মিত কর্মী নন। নির্দিষ্ট সমালোচনার ভিত্তিতে সংবাদপত্র থেকে অর্থ পেয়ে থাকেন।

সমালোচনা কী?

বুক রিভিউ বলতে বোঝায় কোনও বই সম্পর্কে সম্ভাব্য পাঠকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আনন্দবাজার পত্রিকার বুক রিভিউ সংক্রান্ত সাপ্তাহিক বিশেষ পাতাটির নামই দেওয়া হয়েছে 'পুস্তক পরিচয়'। বইয়ের বিষয়বস্তু, বইয়ের দাম, প্রকাশক, লেখকের স্টাইল ইত্যাদি সম্বন্ধে পাঠককে জানানো হয়। বিশেষজ্ঞ জন ড্রিউই তাঁর 'বুক রিভিউ' গ্রন্থে আদর্শ বুক রিভিউ বলতে তেমন লেখাকেই উল্লেখ করেছেন যে লেখায় একদিকে থাকবে বইটির প্রাথমিক পরিচয়, অন্যদিকে থাকবে রিভিউ লেখকের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যসমৃদ্ধি নিজস্ব মূল্যায়ন।

পাঠক কারা

সার্থকভাবে পুস্তক সমালোচনা করতে হলে তার পাঠকমহল এবং পাঠক চাহিদা সম্বন্ধেও স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। তা না হলে লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে বলা যায়—

(ক) সাধারণ পাঠক বা লাইব্রেরিওয়ালারা বইপত্র কেনার জন্যে রিভিউ পড়েন এবং পড়ে বই সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা তৈরি করেন।

(খ) অনেক পড়েন কোনও প্রকাশনা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা কী মনে করছে তা জানার জন্য।

(গ) অনেক সময় সব বই সকলের পক্ষে পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না, তাই রিভিউ পড়েই বইটি সম্পর্ক আপাত ধারণা করে নিতে চান।

(ঘ) আবার অনেকে পড়েন শুধুই পড়ার জন্য। সম্পদকীয়, ফিচার, কলাম বা সংবাদ প্রতিবেদন পড়ার মতন নেহাতই তাৎক্ষণিক আকর্ষণ।

পুস্তক সমালোচনার বৈশিষ্ট্য

সংবাদপত্র প্রকাশনার জন্য বুক রিভিউ করতে গেলে কিছু রীতি বা নিয়ম মেনে চলা উচিত—

(ক) একজন বিশেষজ্ঞের মতে—"The reviewer should convey to the reader the news of the book, the who, what, when, where and 'how' of the book and they way." অর্থাৎ বইটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

(খ) লেখকর পরিচয়।

(গ) একই বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশিত অন্যান্য লেখা এবং একই লেখকের অন্যান্য রচনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা।

(ঘ) লেখকের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর মত বা মূল্যায়নকে যুক্তিপূর্ণ স্পষ্টভাষায় পেশ করতে হয়।

(ঙ) রিভিউ লেখাটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লেখা হয়ে উঠতে হবে। রিভিউ-এ যে বইটি সম্বন্ধে লেখা সেই বইটির ওপর নির্ভরশীল হবে না। রিভিউ লেখাটি যেন সুখপাঠ্য হয়।

পুস্তক সমালোচনার নিয়ম

সঠিকভাবে বই নির্বাচন করা রিভিউ-এর ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। সংবাদপত্রগুলিতে বহু বই আসে সমালোচনার জন্য; কিন্তু সব বই বিভউ করা সম্ভব হয় না, তাই ঝাড়াই-বাছাই করতেই হয়।

শুধু বই নির্বাচন করলেই হল না, পেশাদারি সাফল্য অর্জন করতে গেলে আগাম প্রস্তুতি দরকার। নিয়মিত অনুশীলন ছাড়া তা সম্ভব নয়। এজন্য প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে বই এ প্রকাশনা জগৎ সম্বন্ধে যতটা সম্ভব ওয়াকিবহাল থাকা। সেজন্য গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক ও সাময়িক পত্রগুলির বই রিভিউ-সংক্রান্ত পাতাগুলি নিয়মিত পড়া দরকার। বই ও লেখকদের নিয়ে বেতার ও দূরদর্শন যে সকল অনুষ্ঠান করে তা শোনা ও দেখা প্রয়োজন। বই সম্বন্ধে সাম্প্রতিক তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার নিউজলেটার, বুলেটিন, বিজ্ঞাপন, প্রকাশন সমিতির মুখপত্রগুলি নিয়মিত পড়া দরকার। আর সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার অভ্যাসের গুরুত্ব তো রয়েছেই।

রিভিউ-এর প্রধান কাজই হচ্ছে বইটি ভালো করে পড়া। অভিযোগ, রিভিউ লেখকরা বহুক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ না পড়েই বই রিভিউ করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাতে কিছু খামতি থেকে যায়। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিভিউ প্রতিবেদনের একটি খসড়া তৈরি করে নেওয়া উচিত। সাথে সাথে পয়েন্টগুলো লিখে নেওয়া উচিত। এতে রিভিউ করতে সুবিধা হয়।

মাধ্যম নির্বাচন

রিভিউ কোন মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তা লেখায় হাত দেবার আগে বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ প্রতিটি

মাধ্যমেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। রিভিউ লেখককে দেখে নিতে হবে—কোনও পত্রিকার জন্য লিখছেন, না কি কোনও জনপ্রিয় সাময়িকপত্রের জন্য লিখছেন, না কি দৈনিক সংবাদপত্রের জন্য লিখছেন। এছাড়া বেতার, দূরদর্শনে বই রিভিউ সম্পূর্ণ আলাদা।

সমালোচনা লেখার পদ্ধতি

রিভিউ-এর বিষয়বস্তুকে খসড়া থেকে সাজিয়ে লেখার জন্য কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি দরকার। অনেকে মনে করেন লেখার আগে কিছুটা আত্মস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে। যা মানসিক দূরত্বের জন্য দরকার। 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এর ডঃ অ্যালেনসিন ক্লেয়ার উইলের কথা অনুযায়ী— "Sleep over your review. Do not attempt to write a review immediately upon completing a book. Think about the book and decide upon your approach before sitting down to typewriter."

শিরোনাম লেখা : প্রতিটি রিভিউ প্রতিবেদনেরই একটা উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া দরকার। লেখ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিরোনাম গঠন করতে হয়, যা হবে রিভিউ-এর সামগ্রিক মূল্যায়নের একটি চুম্বক। রিভিউ প্রতিবেদনের প্রথম ধাপ তার শিরোনাম, ফলে এমন শিরোনাম গঠন করতে হবে যা পাঠককে পুরো প্রতিবেদনটি পড়তে উৎসাহিত করে।

নির্দেশিকা ও ছবি : যে কোন রিভিউ লেখাতেই পাঠক যাতে এক ঝলকে জানতে পারেন, সেজন্য বইয়ের নাম, লেখকের নাম, বইয়ের দাম, প্রকাশকের নাম—ইত্যাদি বিষয়গুলি মোটা হরফে রিভিউ লেখার গোড়ায় বা সবশেষে জুড়ে দেওয়া হয়। এই অংশকে বলে নির্দেশিকা।

এছাড়া খবরের কাগজে ও ম্যাগাজিনে সংশ্লিষ্ট বইটির প্রচ্ছদের ছবি দেওয়াও প্রচলিত রীতি। এর ফলে পাঠক বইটির দৃশ্যরূপটিও পেয়ে যান। আবার অনেক সময় বইটির মধ্যে ব্যবহৃত কোনও ফটো বা স্কেচ প্রাসঙ্গিক মনে হলে রিভিউ-এর মধ্যে পুনঃমুদ্রিত করা হয়।

পুস্তক সমালোচনায় সাংবাদিকতা সুলভ লেখা

'রিভিউ' শব্দটির মধ্যে বিশেষজ্ঞ সুলভ গাম্ভীর্যের আভাস থাকলেও, তা বিশেষজ্ঞদের জন্য লেখা হয় না। তার লক্ষ্য যত বেশি সংখ্যক পাঠককে আকর্ষণ করা। তাই রিভিউ লিখন কৌশল সাংবাদিকতা সুলভ লেখার বাইরে নয়। সার্থক রিভিউ সাংবাদিকতারই অংশ। জন ড্রিউই-র মতে বই রিভিউতে সম্পাদকীয়, সংবাদ প্রতিবেদন এবং ফিচারের লক্ষণগুলি বর্তমান। রিভিউতে বর্ণনা করতে হয় সংবাদের ঘটনা, বিবরণী পেশ করার মতন। সম্পাদকীয়তে যেমন থাকে বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন—তেমনি থাকে রিভিউতেও। আবার লেখকের মতামতও এতে থাকে। ফলে রিভিউ অনেকটা কলাম লেখার মত।

রিভিউ লেখার শৈল্পিক কৌশল লেখকের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। সংশ্লিষ্ট বইটি পড়তে পাঠককে উৎসাহিত করার বিষয়টি তাকে বিবেচনায় রাখতে হয়।

প্রয়োজনীয় সতর্কতা : বই রিভিউ করার সময় কিছু সতর্কতা ও নীতি অবলম্বন করতে হয়—

(১) কখনো কোনও বন্ধু বা নিকটাত্মীয়ের লেখা বই রিভিউ করা উচিত নয়। তাহলে সঠিক বিচারের ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে।

(২) রিভিউতে কখনো ব্যক্তিগত আক্রমণ বা বিদ্বেষপ্রসূত কোনও সমালোচনা করা উচিত নয়।

(৩) উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বই রিভিউ লেখা অনুচিত।

৩.৩.১০ সিনেমা সমালোচনা

জনমানসে সিনেমা আজ বেশ জনপ্রিয়। স্বাভাবিক ভাবেই সাংবাদিকতায় এই জনপ্রিয় বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। টেলিভিশনের পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলিও সিনেমা-সংক্রান্ত ফিচার রিভিউ প্রকাশ করছে নিয়মিত।

সিনেমা সমালোচনা কী?

সিনেমা রিভিউ বলতে বোঝায় সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া কোন সিনেমা সম্পর্কে সম্ভাব্য দর্শককে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয় কিন্তু বহুমাত্রিক। গল্প, পরিচালক, নায়ক, নায়িকা থেকে শুরু করে টেকনিক্যাল বিষয়গুলিও তুলে ধরা হয় এই সমালোচনায়। এছাড়া থাকে সমালোচকের মতামত। এই মতামত কখনো সরাসরি, আবার কখনো প্রচ্ছন্ন থাকে।

সমালোচনাকারী

সংবাদপত্রগুলি তাদের বিশেষ ও দক্ষ সাংবাদিকদের দিয়ে সিনেমা রিভিউ করিয়ে থাকে। তবে আজকাল দক্ষ সিনেমা পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রীদের দিয়েই সিনেমা রিভিউ করিয়ে থাকে।

সমালোচনা শৈলী

সিনেমা রিভিউ-এর মধ্যে ফিচারের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। রিভিউ লেখকের লক্ষ্য হল যত বেশি সম্ভব পাঠকের কাছে সিনেমাটির বিষয়বস্তুকে তুলে ধরা। সিনেমার মূল আকর্ষণই হল বিনোদন। সেজন্য রিভিউকে গুরুগম্ভীর করে পরিবেশন করা উচিত নয়; আকর্ষণীয় ভাবে তাকে তুলে ধরতে হয়।

রিভিউ লেখার আকর্ষণীতাকে বজায় রেখেই রিভিউ-এ সিনেমার বহুমাত্রিক বিষয়কে সঠিক বিন্যাসে সাজাতে হয়। সংশ্লিষ্ট সিনেমার গল্প, অভিনয়, মিউজিক গান, ক্যামেরার কাজ ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। এরই সঙ্গে থাকে অন্যান্য দেশি-বিদেশি সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিনেমাটির তুলনামূলক আলোচনার নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রীর অভিনয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা অভিনয়কলার ইতিবাচক দিকটি রিভিউ লেখক তুলে ধরেন আকর্ষণীয়ভাবে। এমনকি সিনেমা হলের শ্রোতা দর্শকদের প্রতিক্রিয়া, হলগুলিতে শ্রোতা-দর্শকদের ভিড় ইত্যাদি তুলে ধরে রিভিউ লেখক সিনেমাটির সাফল্যের আগাম ধারণা তুলে ধরতে চান।

সমালোচনা করার নিয়ম

সিনেমা রিভিউ-এ পেশাদারি সাফল্য অর্জন করতে গেলে সিনেমা জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। সিনেমা রিভিউ বহুমাত্রিক কাজ, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই সিনেমা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরণের তথ্য জানা জরুরী। সিনেমা রিভিউ-এর প্রধান শর্তই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সিনেমাটি

খুঁটিয়ে দেখা। দেখতে দেখতেই সিনেমাটির রিভিউ কি হতে পারে সে ব্যাপারে একটা খসড়া পরিকল্পনা করে নিলে ভাল হয়। সিনেমাটির দেখার পর গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি লিখে নেওয়া দরকার। এতে রিভিউ লিখতে সুবিধা হয়।

এতো গেল একটা দিক। রিভিউ করতে গেলে সিনেমা রিভিউ এবং সিনেমা-সংক্রান্ত পত্রপত্রিকা ম্যাগাজিনগুলি পড়া দরকার। আজকাল বহু ভারতীয় সিনেমা বিদেশি সিনেমার ধাঁচে, পশ্চিমী লেখকদের গল্প, উপন্যাস অবলম্বনেও নির্মিত হচ্ছে। ফলে পশ্চিমী সিনেমা ও সেসব দেশের গল্প, উপন্যাস লেখকদের লেখা পত্র সম্পর্কে জানা থাকাটাও দরকার। আর এসব তথ্য আদতে রিভিউ লেখককে সাহায্য করে। পর্যাপ্ত তথ্য রিভিউ-এর বিন্যাসকে আকর্ষণীয় করে। পাঠকও পেয়ে যান নানা প্রকার অজানা তথ্য।

শিরোনাম লেখা : প্রতিটি সিনেমা রিভিউ প্রতিবেদনের একটা উপযুক্ত শিরোনাম দেওয়া দরকার। ফিল্ম সমালোচনার বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শিরোনাম লিখতে হয়। রিভিউ-এর মূল্যায়নটি প্রতিফলিত হয় এই শিরোনামের মধ্যে। কিন্তু দেখতে হবে শিরোনাম যেন পাঠককে টেনে নিয়ে যায় পুরো রিভিউটি পড়ার দিকে।

নির্দেশিকা ও ছবি : সিনেমার নাম, প্রধান প্রধান চরিত্রাভিনেতাদের নাম তুলে ধরা হয় এই নির্দেশিকায়। সিনেমাটিতে ওই ব্যক্তিরা কে কেমন অভিনয় করেছেন তা জানতে শ্রোতা-দর্শকের স্বাভাবিক কৌতূহল জাগে। রিভিউ পড়ে অনেকেই সংশ্লিষ্ট ছবিটি দেখার পরিকল্পনা করেন।

রিভিউকে আকর্ষণীয় করে তোলে সংশ্লিষ্ট সিনেমার ছবি। সিনেমার কোন বিশেষ মুহূর্তের ছবি এক্ষেত্রে উপযুক্ত। হিন্দী 'লগান' দলবদ্ধ অভিনেতার ছবির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ছবিটি 'লগান' সিনেমার লোগোতে পরিণত হয়েছিল।

জনপ্রিয়তার কারণ

গড়পরতা বেশিরভাগ মানুষের বিনোদনের উৎস সিনেমা। সিনেমা-সংক্রান্ত গান, মিউজিকে ইত্যাদির রমরমার দিকে নজর ফেললেই আন্দাজ করা যায় সিনেমার জনপ্রিয়তা ঠিক কোথায়। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ সিনেমা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। সিনেমা রিভিউ এই অভাব পূরণ করতে চায়।

সিনেমার দর্শক শ্রোতা রিভিউ পড়ে তার ভাল-লাগা-না-লাগার দিকটিতেও মিলিয়ে নিতে চান। আবার অনেকে রিভিউ পড়ে ছবিটি দেখার পরিকল্পনা করেন।

সিনেমা পরিচালক তার ছবির সাফল্য সম্পর্কে আগাম ধারণা করে নিতে পারেন। সিনেমার ত্রুটি-বিচ্যুতিও রিভিউ লেখক তুলে ধরেন। ফলে পরিচালক সেই সব ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে পারেন। নবাগত নায়ক-নায়িকার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আলোচনা করেন রিভিউ লেখক। অন্যান্য পরিচালক তাদের ছবিতে অভিনয় করানো বিষয়টি ভাবতে শুরু করেন। অর্থাৎ সিনেমা রিভিউ অন্য পরিচালকদের ভাবনার সূত্র জুগিয়ে দেয়।

৩.৩.১১ নাটক সমালোচনা

সংগীত, মিউজিকের মতো নাটকের বিশেষ আবেদন আছে সাধারণ মানুষের কাছে। পশ্চিমে দেশগুলিতে তো বটেই এমনকি আমাদের দেশেও নাটকের একটা ইতিহাস আছে। আছে নাট্যধারার উত্থান-পতন। অর্থাৎ আমাদের কাছে নাটকের যোগসূত্র ঐতিহাসিক ভাবে গড়ে উঠেছে। ফলে শুধুমাত্র নাটক-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকাগুলিই নয়, দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতেও নাটক-সংক্রান্ত আলোচনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করছে।

নাটক সমালোচনা কী ?

নাটক সমালোচনা বলতে নাট্য ঘটনাকে হুবহু বর্ণনকরা বোঝায় না। নাটকের মূল ভাবনা বা বক্তব্য, প্রধান চরিত্র ও তার প্রকাশভঙ্গির টানাপড়েন, নাটকের প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি নিয়েই নাট্যসমালোচনার বিন্যাস গড়ে ওঠে। সংবাদপত্রে বরাদ্দ পাতায় রিভিউকে যথার্থ ভাবে তুলে ধরতে হয়।

সমালোচনা করার নিয়ম

প্রতিটি বিনোদন মাধ্যমে নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা জানি আমাদের দেশে আধুনিক নাটকের সূচনা ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরেই। সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত নাট্যসাহিত্য প্রবাহিত হয়েছে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে। রিভিউ লেখককে এই উত্থান-পতন তথা নাট্য-ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়।

আজকের দিনে নাটক-সংক্রান্ত বহু পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। সেগুলি খুঁটিয়ে পড়া দরকার। রিভিউ লেখককে তাঁর লেখার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে আহরণ করে নিতে হয়। ফলে নাট্য-সংক্রান্ত বিষয়ে পড়াশুনার অভ্যাস না থাকলে একাজ সহজ নয়।

এই অভ্যাসের পাশাপাশি নিয়মিত নাটক দেখাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সমালোচক একজন সাধারণ দর্শক-শ্রোতা নন, তার দৃষ্টি থাকে অনেক গভীরে। যে নাটকটির রিভিউ লেখা হবে সেই নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য, নাট্যচরিত্র, নাটকের ভাবনা, পরিচালকের প্রায়োগিক দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক নজর থাকা দরকার।

নাটকের প্রেক্ষাপট, নাট্যকলার প্রয়োগ এবং বিভিন্ন আঙ্গিক যথাযথভাবে অনুধাবন করা জরুরী। বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে বহু নাটকের প্রেক্ষাপট, ঘটনা গড়ে উঠেছে ইতিহাসকে ঘিরে। কখনো বা নাটকে উঠে এসেছে কোনও একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা বা বৃত্তান্ত। লোকসংস্কৃতির নানা দিক নাটকে প্রয়োগ হতে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অন্ধকারে থেকে সার্থক রিভিউ সম্ভব নয়। ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও লোকসংস্কৃতি-সংক্রান্ত গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস রাখতে হয় রিভিউ লেখককে।

সমালোচনা লেখার কৌশল

নাটক দেখার পরে পরেই রিভিউ-এর চূড়ান্ত লেখায় হাত না দেওয়াই ভাল। লেখার পূর্বে বিষয়টি আত্মস্থ করে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। মূল ঘটনা, চরিত্রগুলি সম্পর্কে একটা খসড়াপত্র অর্থাৎ রিভিউ-এর বিন্যাসটি সাজিয়ে নিলে ভাল হয়।

নাট্যগোষ্ঠীর নাম, নাটকের নাম, মূলচরিত্র ইত্যাদি তথ্যকে গোড়াতেই তুলে ধরতে হয়। মূল চরিত্রকে সামনে রেখে নাট্যঘটনা কি ভাবে পড়তে পড়তে এগিয়ে গেল তা আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। কিন্তু প্রসঙ্গগুলি এমনভাবে উপস্থাপন ও শেষ করতে হয় যাতে পাঠক রিভিউ পড়েন এবং নাটকটি দেখার কৌতুহল বোধ করেন।

নাট্যপ্রসঙ্গ আলোচনা করার পাশাপাশি রিভিউ লেখক তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। এই মতামত কখনো স্পষ্ট, কখনো বা প্রচ্ছন্ন হতে পারে।

৩.৩.১২ শিল্প / প্রদর্শনী সমালোচনা

বুক রিভিউ, সিনেমা রিভিউ-এর মতো প্রদর্শনী রিভিউ আজকের সাংবাদিকতায় বিশেষ জনপ্রিয়। প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র, তা ইংরেজিই হোক আর বাংলা, নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট পাতায় নিয়মিত প্রদর্শনী রিভিউ প্রকাশ করে থাকে। যেমন, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতি শনিবার বুক রিভিউ প্রকাশ [পুস্তক পরিচয়] করার সাথে সাথে প্রদর্শনী রিভিউ প্রকাশ করে থাকে।

সমালোচনকারী

প্রদর্শনীর বিষয়, ধরন অনুযায়ী দক্ষ সাংবাদিকদের দিয়ে প্রদর্শনী রিভিউ করানো হয়। আজরে দিনে প্রদর্শনীর বিষয়গত বৈচিত্র্য বেড়েছে। চিত্রকলায় গঠন ও রঙ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সে বিষয়-সংক্রান্ত প্রদর্শনী রিভিউ করা শক্ত। আবার ভাস্কর্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে রিভিউ করা সহজ হয়।

এই রিভিউ-এ গোড়াতেই প্রদর্শনীর বিষয়, প্রদর্শনীটি কোথায় চলছে তুলে ধরতে হয়। এরপর রিভিউ লেখকের দায়িত্ব প্রদর্শনীকারের বা শিল্পীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। এই পরিচয়পর্বে প্রদর্শনীকারের নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট। সংক্ষেপে কিন্তু প্রাসঙ্গিক তত্য দিয়ে যতটা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেন রিভিউ লেখক। শিল্পীর জন্ম, শিল্পীর জীবন এবং প্রয়োজন শিল্পীর পারিবারিক ইতিহাসের সঙ্গেও পরিচয়সূত্র গড়ে তোলেন রিভিউ লেখক।

এইভাবে রিভিউ লেখক শিল্পীর শিল্পে বা প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুতে পাঠককে টেনে আনেন। প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ইত্যাদির মারফত শিল্পীর বা প্রদর্শনীকারের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরেন। দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাসঙ্গিকতা, সমকালীন প্রেক্ষিতে সেই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গেও রিভিউ লেখক তাঁর মতামত তুলে ধরেন।

চিত্রকলা গঠন ও রং প্রসঙ্গ

চিত্রকলায় নানা রঙের ব্যবহার, রঙের মাত্রাগত প্রয়োগ ও গঠন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। কেননা রঙের এই ব্যবহার বিশেষ অর্থবাহী। উষ্ণ ও উজ্জ্বল বর্ণের সংঘাত বিশেষ এক নান্দনিক পরিমণ্ডল রচনা করে। আবার শিল্পী প্রশান্ত রায় (১৯০৮-১৯৭৩) জলরঙেই কাজ করতেন। কালো কালি দিয়ে কালো ও সাদার মধ্যবর্তী অজস্র সুক্ষ্ম স্তরগুলি ফুটিয়ে তুলতে তাঁর মুন্সিয়ানা ছিল অতুলনীয়। স্বাভাবিক ভাবেই বলা

যায় যে চিত্রকলা-সংক্রান্ত কোনও প্রদর্শনী রিভিউ করতে গেলে রঙ সম্পর্কে ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে চিত্রকলা রিভিউ করা অসম্ভব। চিত্রকলার নিজস্ব গঠন আছে। এটাই তার জ্যামিতি সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন।

শিরোনাম ও ছবির ব্যবহার

প্রদর্শনী রিভিউকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিষয়ের দিক থেকে সামঞ্জস্য রেখে একটি শিরোনাম নির্বাচন করতে হয়। সাধারণ পাঠক যাতে রিভিউটি পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন সেজন্য প্রদর্শনীর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছবি রিভিউ প্রকাশের সঙ্গে তুলে ধরতে হয়, নিচে দিতে হয় শিল্পীর নাম।

৩.৩.১৩ ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং

ম্যাগাজিন গণজ্ঞাপনের একটি মাধ্যম যা সমসাময়িক বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খবরাখবর বিস্তৃত আকারে পাঠককে জানতে সাহায্য করে। ম্যাগাজিন যে কোনও খবরের পশ্চাৎপট এবং বিশ্লেষণ তুলে ধরে খবরের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও পাঠকের বিশ্লেষণমুখী মানসিকতাকে সন্তুষ্ট করে জনমত তৈরি করে। সাধারণভাবে ম্যাগাজিন পাঠকের অবসরের সঙ্গী। সোজা ব্যাপার হল, ম্যাগাজিনের মাধ্যমে পাঠক দৈনন্দিন হার্ড নিউজের জগৎ থেকে সরে এসে নিজেকে খবরের বিস্তারের স্রোতে গা ভাসাতে পারে। একই সঙ্গে পাঠক চায় একটু ভিন্ন স্বাদের খবরের আস্বাদন করতে। বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে সাধারণ ম্যাগাজিনের সঙ্গে 'ই-ম্যাগাজিন' ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

প্রাথমিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের ফারাক খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু সাংবাদিকের কাজের ধারা, সম্পাদনার রীতিনীতি, পরিবেশনার কৌশল ও পাঠকের চরিত্রের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। মনে রাখা প্রয়োজন, ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বা বাৎসরিক হতে পারে। ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় সংখ্যা সংবাদপত্রের থেকে বেশ কিছুটা বেশি হয়। ম্যাগাজিনে সাধারণভাবে ২৪ পাতা, ৩২ পাতা কিংবা ৫০ পাতার বেশি হয়।

প্রথমেই একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তু কী। অর্থাৎ ম্যাগাজিনটা কোন বিষয়ের। কারণ ম্যাগাজিনের নানারকম প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন রয়েছে, ফ্যাশন ম্যাগাজিন, ক্রীড়া ম্যাগাজিন, প্রযুক্তি ম্যাগাজিন, লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, শিক্ষা সংক্রান্ত ম্যাগাজিন, স্বাস্থ্য বিষয়ক ম্যাগাজিন-সহ আরও নানারকমের ম্যাগাজিন। উল্লেখযোগ্য ম্যাগাজিনের মধ্যে রয়েছে 'টাইম', 'ইণ্ডিয়া টুডে', 'আউটলুক', 'ফেমিনা', 'স্পোর্টসস্টার', 'আনন্দমেলা', 'দেশ', 'আনন্দলোক', 'সুখী গৃহকোণ', 'কর্মক্ষেত্র', 'ভ্রমণ'।

সংবাদপত্রের মতোই ম্যাগাজিনেও সাংবাদিক থাকে। অনেক নামী ইংরেজি ম্যাগাজিনের যেমন দেশের খবর দেওয়ার জন্য দিল্লিতে সাংবাদিক থাকে। বিদেশের খবর দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেমন, লন্ডন, ওয়াশিংটন, বেজিংয়ে 'ফরেন করসপনডেন্ট' থাকে। তবে অধিকাংশ ম্যাগাজিনেই আলাদা করে বার্তা বা রিপোর্টিং বিভাগ থাকে না। বেশিরভাগ ম্যাগাজিনে থাকে সম্পাদকীয় বা 'এডিটোরিয়াল' বিভাগ।

সেখানেই যারা থাকে তারা একাধারে যেমন খবরও সংগ্রহ করে তেমনই একই সঙ্গে সম্পাদনা বা এডিটিংয়ের কাজও করে। আসলে, সংবাদপত্রের থেকে ম্যাগাজিনে অনেক কম কর্মী থাক। তাই ম্যাগাজিনে সম্পাদকীয় বিভাগেই রিপোর্টার তথা সাব এডিটরও থাকে। পাশাপাশি, এটা জানা প্রয়োজন, যে ম্যাগাজিনগুলিতে দেশ ও বিদেশের খবর দেওয়ার জন্য সাংবাদিক রয়েছে এবং ওই প্রতিবেদকদের 'কপি' বা প্রতিবেদনও ঠিক হয়েছে কি না, তার কোনওরকম সংশোধন প্রয়োজন কি না সমস্ত দিকই সংশ্লিষ্ট ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় অফিসে থাকা সম্পাদকীয় দফতরের কর্মীরাই করে। আবার এমনও হয় যে, দেশ বা বিদেশের সংবাদদাতারা কোনও খবরের সূত্র দিলে তা প্রতিবেদন আকারে লিখতে হয় সম্পাদকীয় অফিসে থাকা কর্মীদেরই। সেই কারণে, ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে সম্পাদকীয় বিভাগে থাকা রিপোর্টার তথা সাব এডিটরদের বিশাল দায়িত্ব পালন করতে হয়।

৩.৩.১৪ সারাংশ

এই এককে আমরা যে বিষয়ে জানলাম সেগুলো হলো :

- সংগীত সমালোচনা
- পুস্তক সমালোচনা
- সিনেমা সমালোচনা
- নাটক সমালোচনা
- শিল্প সমালোচনা
- ম্যাগাজিনে রিপোর্টিং

৩.৩.১৫ অনুশীলনী

● ছোট প্রশ্ন :

ক) একজন বুক রিভিউয়ার হিসেবে আপনি কোন কোন নিয়ম মেনে চলবেন?

খ) ভিডিও, সিডি প্রকাশের যুগে সিনেমা রিভিউ কী জরুরী বা কার এবং কেন সিনেমা রিভিউ পড়েন?

গ) মিউজিক রিভিউ কী?

ঘ) নাটক দেখার পরে পরেই চূড়ান্ত রিভিউ লেখা উচিত নয়—এ বিষয়ে যুক্তি দিন।

● বড় প্রশ্ন :

ক) অভিযোগ বই-পাঠকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। তবুও বড় বড় সংবাদপত্রগুলি নিয়মিত বুক রিভিউ প্রকাশ করছে কেন? এ বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

খ) একজন রিভিউয়ার কীভাবে প্রদর্শনী রিভিউ করবেন?

গ) নাট্যসমালোচক বা রিভিউয়ার হিসেবে আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী?

৩.৩.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

অবশ্য পাঠ্য :

১. রিপোর্টিং—সুধাংশু শেখর রায়

২. সাংবাদিকতা, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র—সুধাংশু শেখর রায়

৩. সাংবাদিকতা পরিচিতি—সম্পাদনা : রোল্যান্ড ই উলস্‌লে

৪. ফটো সাংবাদিকতা—নীরোদ রায়

৫. *The Professional Journalism*—John Hohenberg (Henryhat and Company, New York)

৬. *Professional Journalism*—M. V. Kamath S. Chand

৭. *Book Reviewing*—Drewry John Eldrige : Westport, Conn. Greenwood Press.

৮. *Film*—Heinzkill Richard

৯. *Guide Book to the Drama*—Vargas Lais

১০. *Writing the Feature Article*—Steigleman, Walter Allen

১১. *Writing and selling Feature Articles*—Patterson Hallen Marguerite : New York : Prentice-Hall

১২. আধুনিক গণমাধ্যম—ড. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. *Here is the News*— Partha Sarathi Rangswami

২. *News Reporting and Press Photography*—Amar Nath

৩. *The Publishing and Review of Reference Sources*—Bill Katz and Robin Kinder.

৪. *(The) Book Review Digest*—H. W. Wilson [Bronx. N. Y.) : H. W. Wilson Co.

৫. *Figures of Light*—Kauffmann Stanley

৬. *A Guide to Critical Reviews*—Salem James M.

মডিউল ৩ ঃ সম্পাদন

সম্পাদকীয় নীতি

এখানে সম্পাদকীয় নীতি বলতে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র বুঝতে হবে। এই নীতিগুলি মেনে চললে সম্পাদনার কাজটি সহজ হয়। এগুলি হল :

(১) সঠিকতা (Accuracy) : সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে পরিবেশিত সংবাদকে সর্বদা সঠিক হতে হবে। কারণ পাঠকরা সংবাদকে সত্য বলে ধরে নেয়। এখানেই নিহিত থাকে সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা। এম.ভি. চার্নলি (M.V. Charnley) বলেছেন অধিকাংশ পাঠক গণমাধ্যম পরিবেশিত ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নেয়। (Most news consumers accept most of the facts the media offer without question)। সংবাদপত্রকে তাই সর্বদাই চেষ্টা করতে হয় সংবাদের সঠিকতা যেন বজায় থাকে। এই জন্যই সংবাদ গুরুত্ব পায়। পাঠক জানে কাগজে বা সাময়িকপত্রে যা বেরোচ্ছে তা সত্য, কোনও মতেই তা গল্প-কাহিনী নয়। সঠিকতা বজায় রাখার জন্য সম্পাদনার সময় দেখতে হয় যাতে নাম, তারিখ, সময়, উদ্ধৃতিতে যেন কোনও ভুল না থাকে। ঠিক যখন যা ঘটেছে, যা বলা হয়েছে তাই যেন ছাপা হয়। এটা হলেই সঠিকতা বজায় রাখা যাবে।

(২) সময়োপযোগিতা (Timeliness) : সংবাদের সঙ্গে সময়ের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। একেবারে এখনই ঘটে যাওয়া খবরই হল তাজা খবর। সাংবাদিকতার পরিভাষায় ঘড়ির কাঁটা যত এগোতে থাকে সংবাদের মূল্যও তত হ্রাস পায়। Ken Metzler বলেছেন সংবাদকে সবসময়ই নতুন হতে হবে (news must be new)। দেরি হলে গুরুত্ব কমবে। সময়ের সঙ্গে মানুষের এই আগ্রহের যোগের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন M.V. Charnley, তিনি বলেছেন 'people are aware of the transistory nature of existence', অর্থাৎ মানুষ জানে তার অস্তিত্ব খুব অল্প সময়ের। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব পাল্টে যাচ্ছে আর এই পরিবর্তনের ধারা উঠে আসছে সংবাদপত্রের পাতায়, টুকরো টুকরো সংবাদের মধ্য দিয়ে। নির্বাচনের ফল মানুষ সঙ্গে সঙ্গে জানতে চায়। দুর্ঘটনা ঘটলে কী ঘটলো। কেন ঘটল এসব জানতে আগ্রহী হয়। Carl Lindstorm বলেছেন, 'The news room clock is the master of us all', অর্থাৎ সংবাদ বিভাগের ঘড়ির কাঁটাই আমাদের পরিচালিত করে।

(৩) অভিনবত্ব (Novelty) : সম্পাদনার সময় মাথায় রাখতে হবে সংবাদটির মধ্যে অভিনবত্ব আছে কিনা। অনেকে ঘুরিয়ে বলেন সংবাদকে unusual হতে হবে। মানুষ যদি কুকুরকে কামরায় তখনই তা সংবাদ হবার যোগ্যতা পায়। কারণ সেটা unusual, একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। এই জন্যই এভারেস্ট বড় খবর হয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন খবরের পাতায় জায়গা পায়।

(৪) কোন পক্ষপাত যেন না থাকে (Impartiality) : সংবাদ পরিবেশনে সর্বদাই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অনেকে বলেন সংবাদ পরিবেশন হবে বস্তুনিষ্ঠ, কোনরকম পক্ষপাত সেখানে থাকবে না।

M.V. Charnley-র কথায় "The fact must be reported impartially, as they occurred—এর মানে হল সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে কোনরকম পক্ষপাত থাকবে না। যিনি সংবাদ লিখছেন তাঁর মতামত থাকবে না প্রতিবেদনে। এটা যদি করা যায়, সম্পাদনার সময় তাহলে পক্ষপাতহীনতা বা impartiality-কে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

তবে গবেষণা করে দেখা গেছে পুরোপুরি পক্ষপাতহীনতা প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। লেখা হবে এবং সেখানে কোনরকম মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে না, এটা খুব শক্ত। যিনি লিখছেন তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি, বিবেচনা আবেগ লেখার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। তবে তা কখনই পক্ষপাতহীনতার বা impartiality-কে উপেক্ষা করবে না।

তবে গবেষণা করে দেখা গেছে পুরোপুরি পক্ষপাতহীনতা প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। লেখা হবে এবং সেখানে কোনরকম মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে না, এটা খুব শক্ত। যিনি লিখছেন তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি, বিবেচনা আবেগ লেখার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। তবে তা কখনই পক্ষপাতহীনতার বা impartiality-কে উপেক্ষা করবে না।

তবে গবেষণা করে দেখা গেছে পুরোপুরি পক্ষপাতহীনতা প্রতিষ্ঠা করা প্রায় অসম্ভব। লেখা হবে এবং সেখানে কোনরকম মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে না, এটা খুব শক্ত। যিনি লিখছেন তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি, বিবেচনা আবেগ লেখার মধ্যে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক। তবে তা কখনোই পক্ষপাতহীনতার ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করবে না।

(৫) উদ্ধৃতি (Attribution) : সম্পাদনার সময় দেখতে হবে ঠিকমতো উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে কিনা, যে কোনও ঘটনা ঘটুক না কেন, ওই ঘটনা সম্পর্কে উদ্ধৃতি থাকবেই। এই উদ্ধৃতি প্রমাণ করে সাংবাদিক মনগড়া কোনও কথা বলছেন না। কোনও অপরাধের ঘটনা ঘটলে পুলিসি উদ্ধৃতি থাকবেই। পুলিস কী বলছে ঐ ঘটনা সম্পর্কে এটাই হল ঘটনাটির বিশ্বাসযোগ্যতার সূত্র। পুলিস কী বলছে, আদালত কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এগুলি উদ্ধৃতির মারফৎ জানানো হয়। রাজনৈতিক খবরে রাজনৈতিক নেতাদের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়, রাজনৈতিক দলের মুখপাত্ররা কী বলছেন তা উঠে আসে উদ্ধৃতির মাধ্যমে।

(৬) সংক্ষিপ্ততা (Brevity) : প্রয়োজনীয় নিউজ পয়েন্টগুলো ঠিকঠাক রেখে খুব সংক্ষেপে সংবাদ পরিবেশন করতে হয় অল্পকথায় দ্রুত কোনও বিষয়কে প্রকাশ করাই হল ভালো সাংবাদিকতার লক্ষণ। সম্পাদনার অন্যতম উদ্দেশ্যই হল আধিক্যকে ছেঁটে ফেলা। একেবারে যেটুকু দরকার তাই লিখতে হবে। এখানেই সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখার গুরুত্ব সম্পাদনার গুণমান বাড়ায়। খুব অল্প জায়গার মধ্যে বেশি কিছু বলতে হবে, এটাই ভালো সাংবাদিকতা।

(৭) স্বচ্ছতা (Clarity) : লেখার মধ্যে থাকবে স্বচ্ছতা, একবার পড়েই বিষয়বস্তু সহজে বোঝা যাবে। লেখার মধ্যে এই ব্যাপারটাকে সম্পাদনার সময় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সহজ লেখার অন্যতম নীতি হল 'যেমন কথা বল তেমনি লেখ' (write as you talk), কথাবার্তা বলার সময় যে স্বচ্ছতা থাকে তাকেই তুলে আনতে হবে লেখায়। ডেইলি এক্সপ্রেসের সম্পাদক Arthur Christiansen বলেছিলেন আমি খবরকে এত সরলীকৃত করেছি যে ফরেন সেক্রেটারি ও একজন ঝাড়ুদার দুজনেই সমান বুঝতে পারে। সংবাদ রচনায় তাই সহজ সরল ব্যাপারটা নিয়ে আসতে হবে।

(৮) পাঠযোগ্যতা (Readability) : সম্পাদনা নীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পাঠযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করা। পাঠক কোনরকম হোঁচট খাবেন না পড়তে গিয়ে, এটা নিয়ে আসতে হবে লেখার মধ্যে। একেই বলে পাঠযোগ্যতা বা Readability, তরতর করে সংবাদ রচনা পড়তে হবে। এটা তখনই সম্ভব যখন পাঠযোগ্যতাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বাক্যবিন্যাস সহজ হবে, ছোট ছোট বাক্যে একেবারে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে লিখতে হবে। দুর্বোধ্যতাকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন শৈলীর ব্যবহার (Different style for different media)

গণমাধ্যম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র হল বিভিন্ন ধরণের গণমাধ্যম। এদের সম্পাদনা শৈলীও আলাদা। এর আগে আমরা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সম্পাদনা শৈলী নিয়ে আলোচনা করেছি। সম্পাদনা নীতির মধ্যেই শৈলী নিহিত আছে।

বেতার হল শ্রুতিমাধ্যম। বেতার হল কথার তাজমহল। শুধুমাত্র কথা দিয়ে ছবি তৈরি হবে। কণ্ঠস্বরের যাদুতে নাটকীয়তা নিয়ে এসে হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান পরিবেশনা করা সম্ভব। এই বেতার অনুষ্ঠান প্রযোজনায় সম্পাদনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে সংবাদ, নাটক বা কথিকা যাই হোক না কেন প্রতিটি অনুষ্ঠানেই প্রয়োজন সম্পাদনা। সংবাদ পরিবেশনার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে খুব সামান্য কথায় টুকরো টুকরো সংবাদকে তুলে ধরতে হবে সংবাদ বুলেটিনে। প্রয়োজনমতো ভয়েস ওভার যোগ করতে হবে। বেতার প্রতিবেদক ঘটনাস্থল থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারেন। সেটা ভয়েসওভারে যোগ করতে হবে। তারপর আবার ফিরে আসতে হবে সংবাদপাঠে। একটা দশ মিনিটের সংবাদ ক্যাপসুলে অনেকগুলি টুকরো খবরের কথা বলা হবে। সংবাদপত্রে যে খবর ২০০ শব্দে লেখা হয়, বেতার সংবাদে তা বলা হয় মাত্র চল্লিশটি শব্দে। টুকরো টুকরো সংবাদ দিয়ে একটা সংবাদমালার ক্যানভাস তৈরি হয়। সংবাদপাঠক পরিষ্কার উচ্চারণে সেগুলি পড়ে যান।

অনেক সময় নাটক বা কথায় সুরে বিচিত্রাঅনুষ্ঠান তৈরি হয় বেতারে। নাটকের হাতিয়ার সংলাপ, উপযুক্ত স্বরক্ষেপণ এবং ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। ভালো সম্পাদনা তৈরি করতে পারে উচ্চমানের বেতার সিকোয়েন্স যা কণ্ঠ অভিনয়ের যাদুতে মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মহালয়ার দিন ভোরবেলায় পরিবেশিত হয় এক ভীষণ জনপ্রিয় অনুষ্ঠান মহিষাসুরমর্দিনী। বহুদিনের পুরনো অনুষ্ঠান, কিন্তু এখনও তার আকর্ষণ কণামাত্র কমেনি। অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের কাছেও এই অনুষ্ঠান খুব জনপ্রিয়। এই অনুষ্ঠান পাঠ, গান, স্তোত্রপাঠ এবং নেপথ্য সংগীতের সমন্বয়ে তৈরি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর যাদুতে আজও বাঙালী মোহিত। এই অনুষ্ঠানের স্ক্রীপট লিখেছিলেন বাণীকুমার, সংগীত পরিচালনা করেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে ছিলেন দিকপাল গায়ক-গায়িকারা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গুণী শিল্পীরা। অনুষ্ঠানটি এখনও মনে করা হয় বাতাসের তাজমহল। এই তাজমহল নির্মাণে সম্পাদনার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টেলিভিশন অনুষ্ঠান তৈরিতেও সম্পাদনার প্রয়োজন। এই সম্পাদনা অনেক বেশি প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই সম্পাদনার কাজ করা হচ্ছে। টেলিভিশনের নতুন মাত্রাটি হল দেখা ও শোনা। আগে ছিল পড়া এবং শোনা, এখন একই সঙ্গে দেখাশোনা সম্ভব হল। যেমন ঘটছে তেমনটি দেখতে পাওয়া যায়। নানান ভঙ্গী, ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ, শব্দ ও কথার অনুষঙ্গ যে অডিও ভিসুয়াল যাদু তৈরি করে তা দর্শককে দেয় এক অনন্য সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা। বিষয়ের চেয়ে বিষয়ের উপস্থাপনই বেশি প্রভাব বিস্তার করে দর্শকের ওপরে।

টেলিভিশন সংবাদের আর একটি নতুন দিক হল লাইভ কভারেজ। আগে সংবাদ বলতে বুঝতাম একটু আগে যা ঘটে গেছে। এখন টেলিভিশনের দৌলতে যা ঘটছে তাও সরাসরি সংবাদ হচ্ছে। লাইভ কভারেজের ক্লিপিংস ধরিয়ে দেওয়া হয় সংবাদ পাঠের সময় সংবাদ পাঠক বা পাঠিকা বলে দেন এখন আপনারা সরাসরি দেখুন, চলে আসে লাইভ কভারেজ, দর্শকের মনোযোগ আরও বেড়ে যায়। এই যে সংবাদ পাঠ করতে করতে ভয়েস ওভার চলে আসছে, এটা সম্ভব করছে সম্পাদনা। সম্পাদনা হচ্ছে যুক্ত এবং বাদ দেওয়া, পরিবেশনার স্বার্থে এই কাজ করা হয়, আর এটাই হল সম্পাদনা।

চলচ্চিত্রেও সম্পাদনা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনার মাধ্যমেই নির্মিত হয় একটি চলচ্চিত্র। রাশপ্রিন্ট যা তোলা হয় তার মধ্য থেকে অল্প কিছু সম্পাদনার মাধ্যমে নির্বাচিত হয় পরিবেশনার জন্য। সংলাপ ডাবিং-এর মাধ্যমে যুক্ত হয়। নেপথ্য সংগীত দৃশ্য নির্মাণকে সম্পূর্ণতা দেয়। যে কোনও চলচ্চিত্র নির্মাণে প্রয়োজন একজন দক্ষ সম্পাদকের এখানে সম্পাদনার শর্তই হল দৃশ্য নির্মাণকে বোধগম্য এবং শিল্পসম্মত করে তোলা। সত্যজিৎ রায়ের প্রতিটি ছবিতে ছিলেন দুলাল দত্তের মতো দক্ষ সম্পাদক, যার হাতের ছোঁয়ায় ‘পথের পাঁচালী’ থেকে ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ আমাদের কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

সম্পাদনায় ব্যবহৃত শব্দবন্ধ (Terminology used in the editing)

কিছু শব্দ প্রকৃতভাবে ব্যবহৃত হয় সম্পাদনা সময়। এই শব্দগুলির কারিগরী তাৎপর্য আছে। মুদ্রণ থেকে অন্যান্য গণমাধ্যমে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় তা নীচে দেওয়া হল—

মুদ্রণ মাধ্যম :

১। বীট, যেখানে রিপোর্টারদের ডিউটি পড়ে। ইনট্রো/লীড, সংবাদের সূচনা। পেজ মেক আপ বা পেজিনেশান। সংবাদপত্রে পৃষ্ঠাসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি পৃষ্ঠাকে আলাদা করে সাজাতে হয়। সম্পাদনার একটি অংশ হল এই পেজ মেকআপ বা পেজিনেশন। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে পৃষ্ঠা তৈরি করার পদ্ধতিকে বলে পেজিনেশন।

ডেট লাইন, ডেডলাইন, বাই লাইন, মাস্ট হেড, অ্যাঙ্কর, এডিট পেজ, কলাম, কলামনিষ্ট, ফিচার, পোষ্ট এডিট, প্রিন্টারস লাইন, সোলাস অ্যাড, ব্যানার হেডলাইন, ইনভারটেড পিরামিড, স্টপ প্রেস, এজেন্সি কপি, প্রুফরিডিং, সাপ্লিমেন্টারি পেজ, পেজ থ্রি ডামি, ফার্স্ট লীড, সেকেন্ড লীড প্রভৃতি হল বহুল ব্যবহৃত সংবাদ প্রকাশনার ক্ষেত্রে।

ডেটলাইন : যে তারিখে প্রতিবেদন লেখা হয়েছে সেই তারিখ। ১৫ সেপ্টেম্বরের কাগজে ডেটলাইন হবে ১৪ সেপ্টেম্বর।

ডেডলাইন : সংবাদের কপি জমা দেবার শেষ সময়, প্রতিবেদকদের সবসময় মাথায় রাখতে হয় ঐ সময়সীমা তা না হলে দেরি হয়ে যাবে। আর সম্পাদক, বার্তা সম্পাদককেও ডেডলাইন মেনে চলতে হয়, সংবাদপত্র সময় মতো ছাপার জন্য এটা জরুরী।

বাইলাইন : কিছু কিছু সংবাদ সাংবাদিকদের নাম দিয়ে বেরোয়। একে বলে বাইলাইন। প্রতিবেদনের মাথায় নাম থাকলেই সেটাকে বলে বাইলাইন।

মাষ্ট হেড : প্রথম পৃষ্ঠার একবোরে মাথায় থাকে কাগজের নাম। বিশেষ এক ক্যালিগ্রাফিতে নামটা লেখা হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল, এই নামগুলি হল মাষ্ট হেড।

অ্যাঙ্কর : প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে তলায় থাকে চার বা পাঁচ কলামের একটি সংবাদ একে বলে অ্যাঙ্কর স্টোরি (Anchor story)। আজকাল সব কাগজেই এই সংবাদ দেখা যায়।

এডিট পেজ : সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার ছোট নাম এডিট পেজ। আনন্দবাজার পত্রিকায় চার নম্বর পাতা হল এডিট পেজ। এই পাতার সম্পাদকের মতামত, চিঠিপত্র ও বিশেষ প্রবন্ধ থাকে।

পেজিনেশন : পৃষ্ঠা তৈরির কমপিউটার ভিত্তিক প্রক্রিয়ার নাম পেজিনেশন। পাতা সাজানোর ব্যাপারটা এখন পিসিতে বা ল্যাপটপে করা হয়। আধুনিক সফটওয়ারকে আশ্রয় করে পেজিনেশন কাজ সারা হয়।

কলাম : কলাম হল একটি নির্দিষ্ট আয়তম, প্রস্থে ৪.৫ থেকে ৫ সেন্টিমিটার। সংবাদপত্রের পাতায় এই আয়তন নিয়ে তৈরি হয় কলাম। লম্বালম্বি নেমে যায় উপর থেকে নীচে। প্রস্থে একটি সংবাদপত্র আট কলামের হয়। আজকাল অবশ্য অনেক কাগজ ছ কলামেও হচ্ছে।

কলামনিষ্ট : সংবাদপত্রে এবং সাময়িকপত্রে ব্যক্তিগত নির্ভর এক ধরনের রচনা প্রকাশিত হয়। এগুলো একেবারে ব্যক্তিগত (personalised) রচনা। খুব অল্প পরিসরে তীক্ষ্ণ স্যাটায়ার, হিউমার ও বিশ্লেষণ সহযোগে এই কলাম লেখা হয়। যিনি লেখেন তাকে বলা হয় কলামনিষ্ট। খুসবন্ত সিং, বরুন সেনগুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত কলামনিষ্ট। আর্ট বাখওয়াল্ড (Art Bachwald) ছিলেন Washington Post -এর বিখ্যাত কলামনিষ্ট।

ফিচার : একধরনের রচনা যা সংবাদপত্রে ও সমায়িকপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। মোটামুটি হাজার, দেড় হাজার শব্দ থাকে এই রচনায়। সঙ্গে থাকে ছবি। তথ্য, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, সবকিছুই ফিচারে থাকে। ফিচার পড়ে পাঠক অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। ফিচারের মধ্যে সামান্য বিনোদনের ছোঁয়া থাকে। রচনার আঙ্গিক সাহিত্যধর্মী। ভ্রমণের ওপর ফিচার খুব জনপ্রিয়। বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়েও ফিচার লেখা হয়।

পোষ্ট-এডিট : বাংলায় এর নাম উত্তর সম্পাদকীয়। এর জায়গা এডিট পেজের মাঝখানে। এটিকে বিশেষ নিবন্ধও বলা যায়। সাধারণত হাজার থেকে বারোশো শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এই রচনা। অভিজ্ঞ সাংবাদিক ও লেখকরা এই রচনা লেখেন।

প্রিন্টারস্ লাইন : সংবাদপত্রের একদম শেষ পাতায় একেবারে নীচে দেওয়া থাকে সম্পাদক, মুদ্রক এবং প্রকাশকের নাম ঠিকানা এবং সংবাদপত্রের রেজিস্ট্রেন নম্বর। এটা দেওয়া আইনত বাধ্যতামূলক।

সোলাস অ্যাড : প্রথম পৃষ্ঠার তলায় একেবারে ডান দিকে থাকে যে বিজ্ঞাপন তাকেই বলা হয় Solus Advertisement. এই জায়গাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ । তাই এর দামও বেশি।

ব্যানার হেডলাইন : প্রথম পৃষ্ঠার আট কলাম জুড়ে এই শিরোনাম তৈরি হয়। খুব বড় হরফে লেখা হয়। খুব গুরুত্বপূর্ণ খবরের শিরোনাম ব্যানারে করা হয়। পাঠক দেখেই বুঝতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর এটি।

অ্যাডোব ইন ডিজাইন : পাতা সাজানোর একটি সফট্ওয়ার। মুদ্রণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে এই সফটওয়ারের সাহায্যে সুন্দর পাতা সাজানোর কাজ করা যায়। গ্রাফিক্সের ব্যবহারও করা যায় এখানে।

ইনভারটেড পিরামিড : সংবাদ রচনার সবচেয়ে প্রচলিত আঙ্গিক হল ইনভারটেড পিরামিড। বাংলায় উল্টো পিরামিড। একটি পিরামিড আকৃতিতে উল্টে দিলেই পাওয়া যাবে এই আঙ্গিক, যা inverted pyramid নামে পরিচিত। ওপরদিকটা হবে বড়, তলার দিকটা ছোট। এবং তারপর কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিবেশিত হবে। শেষে এমন একটা জায়গা আসবে যেখানে বলার কিছুই থাকবে না। পিরামিডের দুই পার্শ্বরেখা সেখানে মিলিত হচ্ছে। দ্রুত জ্ঞাপনকার্যে এর গুরুত্ব রয়েছে।

স্টপ প্রেস : গভীর রাতে যদি ভুবন কাঁপানো কোনও খবর এসে পৌঁছয় তখন ছাপা থামিয়ে নতুন কপি ছাপতে দিতে হয়। এ অবস্থাকে বলা হয় স্টপ প্রেস। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহুদুর শাস্ত্রী গভীর রাতে মারা গিয়েছিলেন তাশখন্দে তখন কলকাতার বহু কাগজকেই স্টপ প্রেস করে নতুন করে সংবাদ পরিবেশন করতে হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম কাগজ ছিল দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান।

এজেন্সি কপি : সংবাদসংস্থা যে সংবাদ পাঠায় তাকে বলা হয় এজেন্সি কপি। আগে এ খবর আসতো টেলিপ্রিন্টারে। এখন আসে ইন্টারনেট মারফৎ ই-মেলে। পিটিআই, ইউএন আই, এপি, রয়টারস প্রভৃতি এজেন্সি দিবারাত্র খবর পাঠাচ্ছে। এই সব খবরের কপিকেই বলে এজেন্সি কপি।

প্রুফরিডিং : ছাপা হওয়ার আগে একটা দুটো ছাপা তুলে ত্রুটি সংশোধন করা হয়, এর নাম প্রুফরিডিং। প্রুফরিডিং বিশেষ দক্ষতার দাবী রাখে। যারা প্রুফ দেখেন তাদের বলা হয় প্রুফরিডার। তারা কম্পোজ হওয়া কপির ভুলত্রুটি শুধরে দেন। আজকাল কমপিউটার সফটওয়ারই বলে দেয় কোথায় ভুল। তাই সহজেই সংশোধন করা যাচ্ছে।

সাপ্লিমেন্টারি পেজ : মূল সংবাদপত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত চার পাতা বা ছ পাতার যে কাগজ দেওয়া হয় তাকে বলে সাপ্লিমেন্টারি পেজ (Supplementary page)। বিশেষ কোনও বিষয়ের ওপর অথবা বিনোদনমূলক সংবাদই এখানে থাকে। রবিবার প্রায় প্রত্যেক কাগজই সাহিত্য বিষয়ে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা দেয়। একে বলে লিটারারি সাপ্লিমেন্ট (Literary supplement)।

পেজ থ্রি সংবাদিকতা (Page Three Journalism): এক নম্বর পৃষ্ঠা সংবাদের জন্য, দু নম্বর পৃষ্ঠা সম্পাদকীয় মতামতের জন্য, আর তিন নম্বর পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ বিনোদন সংবাদের জন্য। এই তিন নম্বর পৃষ্ঠাই হল পেজ থ্রি সাংবাদিকতার পরিসর। বর্তমানে এই পেজ থ্রি বিষয়টি ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে। এখানে ফ্যাশন সিনেমা পপমিউজিক আর বিশিষ্ট তারকাদের খবর থাকে। টেলিগ্রাফে টি টু, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার Calcutta Times হল পেজ থ্রি পেজ।

ডামি : পৃষ্ঠা সজ্জার নকল রূপ হল ডামি। আগে এই ডামি শীটের ওপর পৃষ্ঠা সজ্জার নকসা করা হত। এখন সেটা কমপিউটার পর্দায় সফটওয়ারের সাহায্যে করা হয়।

ফাস্ট লীড : প্রথম পৃষ্ঠার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে বলা হয় ফার্স্টলীড। এটা বাঁ দিক অথবা ডান দিকে থাকতে পারে।

সেকেন্ড লীড : প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে বলা হয় সেকেন্ড লীড। এর অবস্থানও পৃষ্ঠা সজ্জার নকশা অনুযায়ী ডান, বাঁ অথবা মধ্যস্থানে হতে পারে।

বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্পাদনা

বেতার

১। অ্যাড-লিব (Ad-lib): কোনও স্বতস্ফূর্ত ভাষণের অথবা বক্তব্য পেশকে অ্যাডলিব বলা হয়। এই বিষয় আগে থেকে তৈরি থাকে না।

২। ঘোষক (Announcer): কোনও অনুষ্ঠানের আগে অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে অল্প কথায় যিনি পরিচিতি দেন তিনি হলেন ঘোষক। সুন্দর পরিষ্কার উচ্চারণে তিনি অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে ঘোষণা করেন।

৩। ভয়েস ওভার (Voice Over): সংবাদপাঠক সংবাদ পড়তে পড়তে অনেক সময় রিপোর্টারকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে বলেন, রিপোর্টার যা দেখছেন শুনছেন তা অল্প কথায় বলেন, এটাই হল ভয়েস ওভার।

৪। প্রযোজক (Producer): সংবাদ বা কোনও বেতার অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। পরিবেশনার যে প্রক্রিয়া চলে তার তত্ত্বাবধান করেন। সংবাদ বিভাগেও প্রযোজক থাকেন। আবার নাটক বিভাগেও প্রযোজক থাকেন।

৫। ট্রিমিং (Triming): সম্পাদনায় এটা খুব জরুরী। অপ্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দেওয়ার পদ্ধতি হল ট্রিমিং। যা দরকার তা থাকবে, বাকীটুকু ট্রিম করা হবে, অর্থাৎ বাদ দেওয়া হবে।

৬। অ্যাকচুয়ালিটি (Actuality): স্টুডিওর বাইরে অনেক সময় রেকর্ডিং করতে হয়। Act কথাটা থেকে এসেছে Actuality, যা শব্দ গ্রহণ করা হচ্ছে তাই অ্যাকচুয়ালিটি।

৭। ব্লাইন্ড ইনটারভিউ (Blind Inerview): সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য অনেক সময়ই রিপোর্টারদের অনেক মানুষের কথা বলতে হয়। যদি যাদের সঙ্গে কথা হলা হচ্ছে তাদের পরিচিতি না দেওয়া হয় তাহলে ঐ সাক্ষাৎকারকে বলা হবে ব্লাইন্ড ইনটারভিউ।

টেলিভিশন

১। অ্যাঙ্কর (Anchor): তিনি একজন সাংবাদিক। যে কোনও একটি বিষয়কে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেন। অল্প কথায় সূত্র ধরিয়ে দেন বিষয়টির ক্যামেরার সামনে। পরিষ্কার উচ্চারণে সাবলীল ভাবে

যে কোনও বিষয়কে উপস্থাপন করার ক্ষমতার অধিকারী হবেন। প্রায়শই আমরা টিভিতে হাতে বুম নিয়ে অ্যাঙ্করদের দেখি।

২। **ফিড (Feed):** উপগ্রহ মারফৎ অথবা মাইক্রোওয়েভ দ্বারা যে ট্রান্সমিশন হয় তাই হল ফিড। লাইভ কভারেজে সময় এই ফিডের ব্যবহার হয়।

৩। **টেলিপ্রম্পটার (Teleprompter):** এটি হল একটি ডিসপ্লে ডিভাইস যা সংবাদপাঠক বা অন্য কোনও ব্যক্তি যিনি ক্যামেরার সামনে কিছু বলছেন তাকে সাহায্য করে। ক্যামেরার তলায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লেখা ফুটে ওঠে, যিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলছেন তিনি ঐ লেখা থেকে কিউ পেয়ে যান।

দৈনিক সংবাদপত্র রবিবারের সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্র— পার্থক্যসমূহ (১) শৈলী (২) আঙ্গিক (৩) প্রেক্ষিত (৪) পন্থা (Difference between daily and sunday newspaper and magazines in (i) style, (ii) format (iii) perspective and (iv) approaches.

দৈনিক সংবাদপত্র, রবিবারের সংবাদপত্র (Daily newspaper and Sunday newspaper) : দৈনিক সংবাদপত্র প্রতিদিন বেরোয়। প্রদানত ব্রডশীট কাগজ, ব্রডশীট কাজ প্রস্থ আট কলাম। দৈর্ঘ্যে ৫০ থেকে ৫২ সেন্টিমিটার। যেমন আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া। সন্মার্গ ইত্যাদি। Edwin Emery সংবাদপত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইভাবে (ক) সংবাদপত্রটি অবশ্যই মুদ্রিত হতে হবে। (খ) নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হবে (গ) ক্রয়যোগ্য হবে (ঘ) মানুষ জানতে চায় এমন বিষয় সহজ ভাষায় ছাপবে। এই হল আধুনিক সংবাদপত্রের পরিচয়। যে কাগজ দৈনিক বেরোয়, মানে ২৪ ঘন্টা অন্তর প্রকাশিত হয় তা হল দৈনিক সংবাদপত্র। হার্ড নিউজ ছাপাই যার প্রধান উদ্দেশ্য।

দৈনিক সংবাদপত্রে অঙ্গ হল রবিবারের সংবাদপত্র, যেখানে অতিরিক্ত চার, ছয় পৃষ্ঠা থাকে রবিবাসরীয়। রবিবারোয়ারি অথবা শুধু রোববার নামে। একেকটি কাগজে একেক নাম, লেখায় ছবিতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তৈরি হয় এই লিটারারি সাপ্লিমেন্ট। রবিবার ছুটির দিন। পাঠকের হাতে সময় বেশি। ধীরেসুস্থে অবসরমতো কাগজ পড়া যায়। সংবাদপত্র পরিচালকরা জানেন, পাঠক ছুটির দিনে থাকেন ছুটির মেজাজে, তাই বিনোদন, সাহিত্য, শিল্প নিয়ে বর্ণময় প্যাকেজ তৈরি করেন।

রবিবারের সাপ্লিমেন্টে যে বিষয়গুলি সাধারণত থাকে তার মধ্যে অন্যতম হল ছোট গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, কলাম, এবং একটি লীড ফিচার যেটি একেবারে প্রথম পাতায় ছবিসহ থাকে। ফিচারের শিরোনাম খুব আকর্ষণীয় হয়, একটু নাটকীয় হলে দ্রুত পাঠকদের মনযোগ আকর্ষণ করা যায়। রবিবারের পাতার মূল উদ্দেশ্যই হল পাঠককে আনন্দ দেওয়া। তার অবসরের মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয় নির্বাচন করা। আজকাল অনেক কাগজ আলাদা একটি ম্যাগাজিন দেওয়াও শুরু করেছে, যেমন প্রতিদিন কাগজ 'রোববার' নামে একটি পত্রিকা কাগজের সঙ্গে দেয়।

শৈলী

সংবাদপত্রে উল্টো পিরামিড আঙ্গিকে সংবাদ লেখা হয়। যদিও আজকাল নাটকীয়তা আনার জন্য প্রতিবেদন রচনাও একটু আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে। কিন্তু সংবাদ পরিবেশনের মূল ব্যাপারটি কিন্তু উল্টো পিরামিড রীতি অনুযায়ী লেখা হয়।

সংবাদ রচনার ভাষা হয় খুব সহজ সরল। বিশেষণের আধিক্য সেখানে থাকে না। শুধু কী গুরুত্বপূর্ণ ঘটেছে সেটা জানানোই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। সংবাদ রচনার তথ্যই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই সঠিক তথ্য পরিবেশনের ওপরই জোর দেওয়া হয়। শিরোনামও হয় সোজাসাপটা। একবার চোখ বোলালেই যাতে মূল খবরগুলির হদিশটুকু পাওয়া যায়।

সংবাদ রচনার মূল শৈলীই হল সহজভাবে কোন বিষয়কে প্রকাশ করা। সংবাদে মূল বক্তব্য থাকে একেবারে প্রথমে। তারপর ধীরে ধীরে অল্প গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ পরিবেশিত হয়। ধাঁচটা উল্টো পিরামিডের মতো। শেষে এমন একটা জায়গা আসে যেখানে বলার মতো কিছু আর থাকে না। উদাহরণ হিসেবে অমর্ত্য সেনের নোবেল পাবার খবর কলকাতার কাগজগুলো এইভাবে পরিবেশন করেছিল :

''রবীন্দ্রনাথের পর নির্ভেজাল বাঙালি হিসেবে আবার নোবেল পুরস্কার পেলেন অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। অর্থনীতিতে চলতি বছরের নোবেল পুরস্কারের জন্য আজ রয়াল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স এই বঙ্গ সন্তানকেই বেছে নিয়েছেন।''—বর্তমান

''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর ৮৫ বছর পরে নোবেল পুরস্কারের আলোয় জগৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন দ্বিতীয় বাঙালী অমর্ত্য সেন। দুনিয়াজুড়ে সমীহ জাগানো বিলেতের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের 'মাস্টার' অমর্ত্য সেন ৬৪ বছর বয়েসে এই দুর্লভ সম্মান প্রাপ্তির অনেকদিন আগে থেকেই অবশ্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ বিশ্ব অর্থনীতির বিবেক হিসেবেই অর্থনীতিবিদদের আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতি।''—আজকাল

''অমত্য সেন পুরস্কার পেলেন। তাঁর এই পুরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির মূল স্রোতে ফিরে এল মানুষ, অধিকার ও জনকল্যাণ শব্দত্রয়ী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর তিনিই দ্বিতীয় বাঙালী যিনি এই সম্মানে ভূষিত হলেন।''—আনন্দবাজার পত্রিকা

তিনটি রিপোর্টের শুরুতেই মূল কথা বলা হয়েছে। তারপর অমর্ত্য সেনের পরিচয় উঠে এসেছে। যারা সম্মান দিয়েছেন তাদের কথাও উল্লেখ হয়েছে। এসেছে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ আর একটি কমন ফ্যাক্টর—বাঙালী। তথ্য পরিবেশনই এখানে মুখ্য, সঙ্গে সামান্য ব্যাখ্যা। আদর্শ প্রতিবেদন রচনার শুরু এভাবেই হয়।

ম্যাগাজিন বা সাময়িকপত্রের লেখার শৈলী সংবাদ রচনার শৈলীর থেকে আলাদা। এখানে পিরামিড সূত্রকেই মেনে চলা হয়। প্রথমেই মূল কথা বলে দেওয়া হয় না। সাসপেন্সকে ধরে রাখা হয়। বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে মূল বক্তব্যের দিকে অগ্রসর হন লেখক। মূল কথা আসে একেবারে শেষে। পুরোটা না পড়লে বোঝা যায় না আসল বক্তব্য কী। এ শৈলী সাহিত্য রচনার শৈলীর কাছাকাছি।

সাময়িকপত্রের রচনা ফিচার বা কলাম রচনার নীতি অনুসরণ করে। সাময়িকপত্রে গদ্যরচনা হবে ঝড়ঝড়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে crisp prose, একেবারে মুচমুচে যা যে কোনও রচনার পাঠযোগ্যতা

বাড়িয়ে দেয়। লেখক সহজ সরল বাক্যবন্ধ ও সঠিক উপমা ব্যবহারে রচনায় গতি আনবেন। উপস্থাপনায় থাকবে নাটকীয়তা, একটু চমক, মাঝে মাঝে কৌতুক রস ঝিলিক দিয়ে উঠবে। একটু পড়ে আরও একটু পড়তে চাইবেন পাঠক। খিদে উসকে দেওয়ার মতো রচনশৈলী আরও করতে হবে লেখককে।

আঙ্গিক (Format)

আগেই বলা হয়েছে সংবাদ প্রতিবেদনের আঙ্গিক উল্টো পিরামিড রীতি মেনে লেখা হবে। শিরোনামের পরে থাকবে লীড। অল্প কথায় সংবাদের মূল বিষয়বস্তু জানিয়ে দেওয়া হবে। তারপর আসবে বডি। ছোট ছোট অনুচ্ছেদে সংবাদের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু পরিবেশিত হবে।

ম্যাগাজিনে উল্টো পিরামিড রীতি মেনে চলার প্রয়োজন হয় না। কোন অ্যানেকডোট দিয়ে বা উদ্ধৃতি দিয়ে একটা সাসপেন্স তৈরি করে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা হয়। প্রথম বা দ্বিতীয় লাইন পড়ে পাঠক বিষয়বস্তুর সন্ধান পাবেন না। হালকা আভাষমাত্র পেতে পারেন। সাহিত্য রচনারীতির সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কোন অবস্থাতেই তা সাহিত্য হবে না। রূপক, অলংকার হয়তো সামান্য থাকবে, কিন্তু তা কখনই শিল্প নির্মাণের ধার কাছ দিয়েও যাবে না।

সুসংহত, সুন্দর গদ্যরচনার কৌশলই সাময়িকপত্রের রচনায় প্রাণসঞ্চার করতে পারে। সাময়িকপত্রের সমস্ত রচনাকেই বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। প্রতিটি বাক্যই পাঠককে আবিষ্ট করবে, ব্যাঙ্গে, সরসতার মজিয়ে রাখবে। খুব অল্প পরিসরে এমন অভিজ্ঞতা পাঠককে দেবেন যাতে সে একটা নতুন কিছু পায়। তবেই পাঠক বাক্যের পর বাক্য পেরিয়ে যাবেন, একেবারে শেষে তৃপ্তি বোধ করবেন। James M Neal এবং Suzanne S. Brown সাংবাদিক সুলভ রচনায় অনিবার্য বলে মনে করেছেন ‘depth of thought and persuasive presentation’ -কে। তাঁরা মনে করেছেন লেখায় যদি ভাবনার গভীরতা না থাকে, তাহলে তা পাঠকের মনে দাগ কাটতে পারে না।

প্রতিবেদন রচনায় ভাষার এতো দখলের প্রয়োজন হয় না। যা ঘটছে তা সরাসরি সহজ ভাষার জানালেই কাজ শেষ। ঘটনার টাটকা ভাবটা শুধু বজায় রাখতে হবে। সে জন্য যথাসম্ভব কর্তৃবাচ্যে বা active voice -এ বাক্য লেখা দরকার। রূপক বা আলংকারিক শব্দ প্রয়োগের সুযোগ সেখানে নেই। মতামত দেবারও কথা নয়। শুধুমাত্র সঠিক তথ্যকে সংবাদরচনার আঙ্গিকে পরিবেশন করতে হবে।

প্রেক্ষা ও পন্থা (Perspective and Approaches) : সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র রচনার প্রেক্ষাপট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রেক্ষার মধ্যে সময়, সমাজবাস্তবতা এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিহিত থাকে। রচনা যাই হোক না কেন, তা সৃষ্টি হয় বিশেষ এক প্রেক্ষাপটের মধ্য থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে প্রেক্ষাপট ছিল, আজ আর তা নেই। ইউরোপ, এশিয়া যে ধ্বংসলীলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল তা হাতে গোনা কিছু মানুষ স্মরণ করতে পারে। সেই সময়ের বাস্তবতা আর যে সময়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তার প্রেক্ষিত একেবারে আলাদা। রচনা যে রকমই হোক না কেন এই প্রেক্ষিতের প্রভাবটি অস্বীকার করা যাবে না। আজকের প্রেক্ষিত হল বিশ্বায়নের নলেজ নির্ভর দ্রুত অর্থনৈতিক রূপান্তরে। রচনার ওপর তার ছাপ পড়বেই।

পন্থা বলতে বুঝি পথ যা রচনার দিশা তৈরি করে। প্রতিষ্ঠানের নীতির সঙ্গে যোগ রয়েছে পন্থার। সংবাদপত্র

যদি উদার হয়, অর্থাৎ উদারনীতি দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে সংবাদ অন্যান্য রচনা নির্বাচনে তার প্রভাব পড়বে। মার্কিনযুক্ত এবং পশ্চিম ইউরোপের গণমাধ্যমগুলি এই উদারনীতিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। সংবাদপত্র, বেতার এবং টেলিভিশনের কাজে উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়।

প্রতিটি গণমাধ্যম তার নিজস্ব নীতি অনুযায়ী চলে। সামাজিক প্রেক্ষায় সে নীতি উদারনীতিক হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারে, অথবা চূড়ান্ত রক্ষণশীল হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। নিউইয়র্ক টাইমস, CNN, BBC, আমাদের দেশের এনডি টিভি, ইন্ডিয়া টুডে, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া যে নীতি মেনে চলে তার সময় চীনের পিপলস্ ডেইলি অথবা পশ্চিম এশিয়ার আলজারিরার বিস্তর ফারাক। কেন? এর উত্তর হল গণমাধ্যমগুলির নীতি এবং তার থেকে উদ্ভুত পন্থা বা approach একেবারে আলাদা। প্রত্যেকেই নিজের মতো করে সত্যকে সন্ধান করছে। সন্ধানের রাস্তা আলাদা, তাই পন্থাও ভিন্ন হতে বাধ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত কাগজ Christian Science Monitors-এ কেউ মারা গেলে 'Died' কথাটা লিখতো না, লিখতো 'passed away'। এটা পুরোপুরি ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপার, কাগজের নীতির সঙ্গে এই বিশ্বাস যুক্ত হয়ে ছিল, এটাই ছিল কাগজের পন্থা বা approach, লিখন ভঙ্গীমাকে যা প্রভাবিত করতো।

৩.১.৮ সারাংশ

সম্পাদনার নীতি আলোচনা করা হয়েছে। একেকটি মাধ্যমের শৈলী আলাদা। প্রত্যেকটি মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বিশেষ শব্দমালা—যা দিয়ে চেনা যায় মাধ্যমের বিশেষত্ব, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সম্পাদনা বুঝতে হবে। দৈনিক সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের সম্পাদনার চরিত্র আলাদা। এই পার্থক্য প্রতিফলিত হয় শৈলী, আঙ্গিক, প্রেক্ষাপটএবং দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী।

৩.১.৯ অনুশীলনী

ছোট প্রশ্ন :

১। সম্পাদনা কী? অল্পকথায় লিখুন।

২। পেজিনেশন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

বড় প্রশ্ন :

১। সম্পাদকীয় নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। দৈনিক কাগজ এবং সাময়িকপত্রের সম্পাদনা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। সমায়িকপত্রের শৈলী ও আঙ্গিক নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করুন।

৩.১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। *সমাচার সম্পাদনা*— সৌরীন ব্যানার্জী—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

২। *সংবাদ প্রতিবেদন*— ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য— লিপিকা

৩। *সংবাদবিদ্যা*— ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

৪। *News Editing and Practices*— Dr. Sourin Bandrjee

মডিউল ৪ ঃ সম্পাদনা প্রক্রিয়া

সংবাদ নির্বাচন : সংবাদ মান এবং অন্যান্য পরিমিতি

কুট লিউইনের গবেষণার মধ্যে নিহিত আছে দ্বার রক্ষার ধারণাটি। লিউইন ছিলেন একজন সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ। ১৯৪৭ সালের আয়াওয়া শহরের গৃহকর্ত্রীদের খাদ্য সামগ্রী কেনার বিষয় নিয়ে গবেষমা চালিয়েছিলেন। বাজারে পরিবারের গিন্নি গেছেন জিনিস কিনতে। কি কিনবেন তিনি? লেউইনের পর্যবেক্ষণ বলছে তিনি একটি নির্দিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবেন। খাদ্য সামগ্রী কেনার সময় গিন্নি বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখেন। ভেবে দেখেন কি কিনলে পরিবারের সদস্যদের পছন্দ হবে, স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হবে ইত্যাদি। বিভিন্ন তথ্য যুক্ত থাকে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে। তথ্য বিশ্লেষণ করে ঠিক হয় কি কেনা হবে আর কি কেনা হবে না। যে পর্যায়ে এই নির্বাচনের কাজটি হয় লেউইন তাকে দ্বার অঞ্চল বলে বর্ণনা করেছেন। লেউইনের এই গবেষণা পরবর্তীকালে গণমাধ্যম চর্চাতে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে।

১৯৫০ সালে ডেভিড মেনিং মেনিং হোয়াইট (David Manning White) গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা কিভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা আলোচিত হয়। সাংবাদিকতার অধ্যাপক হোয়াইট আঞ্চলিক কাগজের সম্পাদকের সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর গবেষণা চালান। তিনি দেখেন সম্পাদকের টেবিলে বিশাল সংবাদ প্রবাহ এসে জমা হচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ আসছে, নিছক সংবাদদাতা, সরকারি প্রেস রিলিজ, সংবাদ সংস্থার পাঠানো কপি। সিটি এডিটররা এই বিপুল সংবাদ প্রবাহ থেকে অল্প কিছু বেছে নিচ্ছেন। আর বেশিরভাগটাই ফেলে দিচ্ছেন। হোয়াইট চেনা কিছু আঞ্চলিক কাগজের সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখলেন সম্পাদকরা সেই সমস্ত সংবাদই বেছে নিচ্ছেন যেগুলি কাগজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। পাঠকের চাহিদা ও সম্পাদকের পছন্দকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয় এই প্রয়োজন। তিনি দেখলেন সম্পাদকের বিচারে মানবিক আগ্রহমূলক সংবাদই বেশি। হোয়াইট সম্পাদকের ''মিস্টার গেট'' বলে অভিহিত করেছিলেন। সম্পাদকরা তাকে এক বাক্যে জানিয়েছিলেন "We, go for human interest stories in a big way." হোয়াইট জানিয়েছেন তার এই গবেষণায় লিউইনের গবেষণা সাহায্য করেছিল।

সুইডার (Suider) নামের এক গবেষক ১৯৬৭ সালে একই বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন বিষয়টি আগের মতই আছে অর্থাৎ সম্পাদকরা পাঠকদের রুচি পছন্দ ও কাগজের নীতির দ্বারাই প্রভাবিত হচ্ছেন। এর পরে গবেষকরা সংবাদ নির্বাচনে শুধুমাত্র সম্পাদকের ভূমিকার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি। স্যাম্পলিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দ্বার রক্ষার কাজে আরো বহু ব্যক্তিকে যুক্ত করেছেন। যেমন নির্বাহী সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, বিভাগীয় সম্পাদক প্রভৃতি নির্বাচকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সংবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়া হল এক দলীয় কার্যক্রম।

Shoemaker এবং Reise বলেছেন দ্বার রক্ষার কাজ কতগুলি নির্দিষ্ট বিষয় দ্বারা প্রবাভিত হয়। তাদের বক্তব্য হলো পাঠকদের চাহিদা ও বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গড়ে ওঠা সহমত দ্বার রক্ষার কাজকে

পরিচালিত করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে তারা গুরুত্বপূর্ক বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। নির্বাচকরা যে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে করে ওঠেন তার প্রভাব তাদের সিদ্ধান্তের ওপর পড়ে।

Shoemaker এবং Reise দ্বার রক্ষার তত্ত্বে মূল্যবোধকে যুক্ত করেছেন। পাঠকদের চাহিদা, পছন্দের সঙ্গেও মূল্যবোধের যোগ রয়েছে। যে সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে পাঠকরা গড়ে ওঠেন তার প্রভাব তাদের চাহিদার ওপরেও পড়ে। নির্বাচকরা সবসময়ই চাইবেন পাঠকদের চাহিদামাফিক চলতে। অর্থাৎ পাঠকদের রুচি, পছন্দ, মূল্যবোধকে বিবেচনা করে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ভারতের পাঠকদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠকের চাহিদা অবশ্যই আলাদা হবে।

Galtung এবং Ruge দ্বার রক্ষা নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে দেখেছেন সাংগঠনিক ও আবেগগত বিষয়ক সংবাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। নরওয়ের সংবাদপত্রে বিদেশি সংবাদ কিভাবে নির্বাচিত হয় তা অনুসন্ধান করার সময় এই দুই গবেষক লক্ষ্য করেন নির্বাচকরা সংবাদমূল্য দিয়েই সংবাদ বাছছেন। যে সংবাদমূল্য নির্বাচকদের নিজস্ব পছন্দের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সেই সংবাদকে তারা গ্রহণ করেন। সাংগঠনিক নীতি ও আদর্শগত অবস্থান নির্বাচকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে তারা পশ্চি মী কাগজে, পশ্চি মী মূল্যবোধের কথা উল্লেখ করেছেন।

Fishman বলেছেন সংবাদ এর মধ্যে যে বাস্তবতা রয়েছে তা নির্বাচকদের বাস্তব আন্তরিকতার সঙ্গে কতটা খাপ খাচ্ছে সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদমাধ্যমের কাছে যে সংবাদ আসছে, নির্বাচকদের ওপরে কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। Fishman-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো নির্বাচকদের চাহিদা, অপছন্দ সংবাদ নির্বাচনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রয়োজন হলে সংবাদমাধ্যম উদ্যোগ নিয়ে সংবাদ তৈরি করতেও এগিয়ে আসে (at times it also has to be internally manufactured or constructed)।

সংবাদ নির্বাচনের সময় যে বিষয়গুলি সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়, সেগুলি হল মানুষ (people), স্থান (place) এবং সময় (time)।

সংবাদ মান এবং অন্যান্য পরিমিতি ঃ

খবরের মূল্য, সাংবাদিকদের, সম্পাদক, সংবাদকর্মীদের বিচারবোধ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। যে সংবাদগুলি অন্যান্য, প্রধান অ্যাঙ্কর স্টোরি, ব্লার্বস এবং স্নিপেটগুলির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোন সংবাদ চালানো উচিত সেগুলি সিদ্ধান্ত সংম্পাদকীয় ড়েস্ককে নিয়মিত গ্রহণ করতে হয়। যদিও এই উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সরল কোনও 'নিয়ম-পুস্তক' না থাকলেও এটি ড়েস্কের রাজনৈতিক অবস্থান বা আদর্শ বা কাগজের অগ্রাধিকার এবং দৈনিক এজেন্ডা-সেটিং অনুযায়ী পারস্পরি বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে কাজ করে।

নিউজ তৈরির মূল দিকগুলি—

বিভাগগুলি এবং ড়েস্কগুলির আমলাতান্ত্রিক আদেশ যা সংবাদকে শ্রেণিবদ্ধ করে।

সংবাদ-মানের একটি সেট যা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ টুকরো থেকে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি ফিল্টার করে।

অর্থবহ সংবাদ—সংজ্ঞাবদ্ধ করা এবং প্রতিবেদকের শব্দভাণ্ডারের কাঠামোর মধ্যে সংজ্ঞায়িত ইভেন্টগুলি আনা।

অন্যান্য পরিমিতি ঃ

সংবাদ সূচনা : সরল কথায়, সংবাদ বা তথ্যগুলির একটি নতুন অংশকে বর্তমান পাঠকদের পছন্দ অনুযায়ী নির্মাণ করার চেষ্টা করা।

আপেক্ষিক গুরুত্ব : কাগজে একটি নিউজ আইটেমের স্থান বরাদ্দ আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী ঠিক হয়। জনপ্রিয় নৈতিকতা এবং সংস্কৃতি কোনও সংবাদ আইটেমের নির্বাচন প্রক্রিয়াতে আধিপত্য বিস্তার করে।

সংবাদ প্যাটার্নস : সংবাদমাধ্যমগুলি প্রায়শই যে সংবাদ পেতে চায় তা জনসাধারণকে দেওয়ার চেষ্টা করে। বেশিরভাগ মাধ্যম একটি প্রাক-সেট সূত্র অনুসরণ করে। কখনও কখনও পৃষ্ঠার বিন্যাসে বরাদ্দ করা জায়গার ফিট করার জন্য শব্দ গণনা করা হয়।

মানহানি : প্রেস এবং রেডিওতে মানহানি আইন কার্যকরী। অপমানিত ব্যক্তি কাগজের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। সম্পাদকীয় ডেস্ককে কাগজটিকে কোনও সম্ভাব্য মানহানিকর মামলা থেকে রক্ষা করতে হবে।

সংবাদ কপি সম্পাদনা পদ্ধতি

সংবাদ কপি সম্পাদনার কাজ সামাল দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিপুল সংবাদ প্রবাহ এসে জমানো হয় সংবাদ কক্ষে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংবাদ আসতে থাকে। সংবাদদাতাদের পাঠানো কপি, সংবাদ-সংস্থার কপি, সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের থেকে আসা প্রেস বিজ্ঞপ্তি এসে হাজির হয় নিউজ ডেস্কে। এই বিপুল সংবাদ প্রবাহকে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ সংবাদ মাধ্যমের পরিসর সীমিত। এ যেন 'ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট এ তরী' অবস্থা। তাই নির্বাচন করতে হয়, বার্তা সম্পাদক ও অন্যান্য সহকারিদের সাহায্য নিয়ে কী ছাপা হবে অথবা কী পরিবেশিত হবে তা ঠিক করেন।

দক্ষ হাতে এই সম্পাদনার কাজ করতে হয়। কপির কাজ সামলানো খুব সহজ কাজ নয়। প্রাথমিক কাজই হল বিপুল কপির মধ্য থেকে উপযুক্ত কপিকে বাছা। বার্তা সম্পাদক, মুখ্য অবর সম্পাদক তাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝে নেন কোন কপি ছাপার উপযুক্ত। তার কাগজের পাঠকরা কী চাইছে সেটা বার্তা সম্পাদক জানেন। এই অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি ঠিক করেন কোন কপিগুলি ছাপা হবে। তারপর সেই কপিগুলির সম্পাদনার ব্যবস্থা করেন। মুখ্য অবর সম্পাদককে দায়িত্ব দেন কপিগুলিকে অবর সম্পাদকের মধ্যে বিতরণ করতে সম্পাদনার জন্য।

লেসলি সেলার্স (Leslie Sellers) কপি সম্পাদনার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা বলেছেন। সেলার্স দীর্ঘদিন লন্ডন টাইমস্-এর সম্পাদনার দায়িত্ব সামলেছেন। তিনি বলেছেন 'a sub editor must be obsessed with accuracy', যে কোনো ধরনের ভুল ধরার জন্য তিনি সবসময়ই সতর্ক থাকেন। প্রতিবেদন রচনার সময় তাড়া থাকে, ডেডলাইনের মধ্যে খবর পাঠাতে হবে। এ অবস্থার ভুল হবার সম্ভাবনা বেশি। অবর সম্পাদক মাউস ক্লিক করে ভুলগুলি সংশোধন করেন।

সম্পাদনার আর একটি দিক হল অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে কপিকে উন্নত করা। এরকম হতে পারে একই কথা বার বার ফিরে আসছে। তখন বাহুল্য অংশ বাদ দিতে হবে। ভেবেচিন্তে কাজটি করবেন অবর সম্পাদক।

সম্পাদনার সময় খেয়াল রাখতে হবে কপি যেন সহজবোধ্য ও বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে ওঠে। কপিকে পাঠযোগ্য করে তুলতে হবে। খুব সাধারণ শিক্ষা ও বোধবুদ্ধি নিয়ে মানুষ কাগজ পড়ে। শব্দ ব্যবহার এবং বাক্যবিন্যাসকে করতে হবে যথাসম্ভব সহজ সরল। একবার চোখ বোলালেই পাঠক বুঝে যাবেন সংবাদের বিষয়বস্তু এবং তর তর করে পড়ে যাবেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাগজ পড়া শেষ হয়। সাধারণত পাঠক ৪৫ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে কাগজ পড়া শেষ করেন। এটা সম্ভব হয় দক্ষ সম্পাদনার গুণে।

প্রেস আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্পাদনার সময় এ বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। মানহানি, আদালত অবমাননা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে-কোনো সময় মামলা হতে পারে। সাম্প্রতিককালে Fake News একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য সরকার বা বিচারব্যবস্থা কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। তাই সংবাদ যাচাই করার বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাই সম্পাদনার সময় আইনগত দিকগুলি বিবেচনা করা দরকার।

সম্পাদনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সংবাদের মূল্যায়ন। যিনি সম্পাদনা করছেন তাঁকে অবশ্যই সংবাদের মূল্যায়ন করতে হবে। এটা করতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে পাঠকের চাহিদা, রুচি পছন্দ। খবর বাছার ক্ষেত্রে এই তথ্য তাকে সাহায্য করবে। Charnley বলেছেন, "The newsman must first decide which events and information are of primary importance to a large proportion of the people that his medium reaches", মূল্যায়নের মূল্য কথাটাই এখানে ধরা আছে। দেশ, কাল, সামাজিক অবস্থান এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

মূল্যায়নের বিষয়টি আবার সকল সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে একরকম হয় না। সিরিয়াস সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যেরকম হবে মূল্যায়নের মাপকাঠি, পপুলার ট্যাবলয়েড সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে তা হবে অন্যরকম। প্রত্যেকটি কাগজের সম্পাদকেরা জানেন কারা তাদের কাগজের পাঠক। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তারা মূল্যায়নের কাজ সারেন।

মূল্যায়নের কাজে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে সংবাদের উপাদানগুলি, যেমন নৈকট্য, নতুনত্ব, সময়োপযোগিতা এবং গুরুত্ব। সম্পাদকরা এইসব উপাদানের কথা মাথায় রেখেই সম্পাদনার কাজ করেন।

দৃষ্টিকোণ : সংবাদ সম্পাদনার সঙ্গে দৃষ্টিকোণেরও যোগ রয়েছে। এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। মূল্যবোধ, নীতিবোধ তৈরি করে এই দৃষ্টিকোণ। ইংরেজিতে একে বলা হচ্ছে 'Framing', একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাই হল 'Framing', যা ঘটেছে তা দেখার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিকোণ গুরুত্বপূর্ণ।

যা ঘটেছে তার হুবহু ছবি আমরা কখনই পাই না। কারণ প্রতিবেদক যা লিখেছেন তা সম্পাদিত হবার পর ছাপা হয়েছে। সম্পাদনার সময় সংযোজিত হয়েছে দৃষ্টিকোণ। সংবাদপত্রের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে এই দৃষ্টিকোণের। এই দৃষ্টিকোণ ঠিক করে দিচ্ছে আমরা কী পড়ব।

সাংবাদিকের নিজস্ববোধ, পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নীতি তৈরি করে দৃষ্টিকোণ বা frame, আমরা এই দৃষ্টিকোণের মধ্য দিয়ে সংবাদ পাই।

এই দৃষ্টিকোণের বিষয়টি শুধুমাত্র সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম টেলিভিশন এবং সাম্প্রতিক অনলাইন মাধ্যমের ক্ষেত্রেও প্রসারিত। বর্তমানে দৃষ্টিকোণের গুরুত্ব

সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠার নীতি মেনে সংবাদ পরিবেশনের দিন শেষ। আগে সংবাদ জানার জন্য আমরা নির্ভর করতাম সংবাদপত্রের ওপরে। এখন বেতার, টেলিভিশন, অনলাইন নিউজ পোর্টাল রাতদিন সংবাদের আপডেট দিচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটিয়ে দিয়েছে তথ্য বিস্ফোরণ। জানার চেয়ে জানার বোঝা বহন করাই কঠিন কাজ হয়ে উঠেছে।

এ অবস্থায় সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের অন্যতম দায়িত্ব হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষকে যে-কোনও বিষয় ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করা। তাই সংবাদ পরিবেশনে দৃষ্টিকোণের প্রাসঙ্গিকতা বেশি উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

সংবাদ রচনা (পরিকল্পনা এবং দৃশ্যায়ন)

সম্পাদনা পর্যায়ে সংবাদ রচনা মুদ্রণ উপযোগী হয়ে ওঠে। কতটা জায়গা নিয়ে রচনাটি ছাপা হবে তা ঠিক হয়ে যায়। প্রস্থে পাঁচ কলাম জায়গা পেতে পারে, দু কলাম, আবার এক কলামও হতে পারে। সংবাদের গুরত্ব অনুযায়ী জায়গা ঠিক হয়। লম্বায় পনেরো, কুড়ি সেন্টিমিটার হতে পারে। সাধারণত এরকমই হয়ে থাকে। অনেক সময় এক কলামে লম্বালম্বি তিন চারটি সংবাদ পরিবেশন করা হয়, একে বলে চিমনি কলাম।

কোন সংবাদ কোন পাতায় জায়গা পাবে সেটাও ঠিক হয় সম্পাদনার সময়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসে প্রথম পাতায়। সাধারণত পাঁচ-ছটি খবর থাকে প্রথম পাতায়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূণ৪ খবর হবে প্রথম লীড, তারপর ক্রমান্বয়ে আসবে দ্বিতীয়, তৃতীয় লীড। একটি খবর হবে অ্যাঙ্কর স্টোরি, একেবারে নীচে থাকবে তিন, চার কলাম জায়গা নিয়ে। একেবারে বাঁদিকে অথবা ডানদিকে এক কলামে ছোট ছোট কয়েকটি সংবাদ থাকবে। একে বলে চিমনি কলাম।

সংবাদ কতটা জায়গা পাচ্ছে সেটা ঠিক করার সময় শিরোনামকেও ধরা হয়। শিরোনাম সিঙ্গল ডেক হতে পারে আবার ডাবল ডেক অথবা মাল্টি ডেকও হতে পারে।

প্রথম পৃষ্ঠা থেকে ভিতরের সব পৃষ্ঠাগুলিকে সাজাতে হয়, এটি হল সম্পাদনার অঙ্গ। কখনও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বক্স-এর মধ্যে রাখা হয়। এতে জ্ঞাপন ও পৃষ্ঠাসজ্জার সৌন্দর্য দুটিই সাধিত হয়। দৃশ্যায়ন ব্যাপারটি পৃষ্ঠাসজ্জার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি পৃষ্ঠায় দুটি বক্স রাখলে অক্ষরের ধূসরতা কমে। পাঠকের চোখ বিশ্রাম পায়। পৃষ্ঠাসজ্জাও আকর্ষণীয় হয়। সম্পাদনা পর্বে পরিকল্পনার যথেষ্ট অবকাশ আছে। দৃশ্যায়নের ব্যাপারটি পরিকল্পনার অঙ্গ হয়ে ওঠে। কীভাবে নিউজ স্টোরিগুলিকে সাজালে জ্ঞাপন এবং সৌন্দর্যায়নকে মেলানো যায় তার জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়।

সম্পাদনার সময় সংবাদ রচনা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সেটা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। সংবাদ রচনা সাধারণ রচনার থেকে একটু আলাদা। সাধারণ রচনায় সাসপেন্সকে ধরে রাখা হয়। বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে মূল বক্তব্যের দিকে অগ্রসর হন লেখক। চূড়ান্ত পরিণতি থাকে একেবারে শেষে। পুরোটা না পড়লে বোঝা যায় না আসল বক্তব্য কী। গল্প রচনায় আসল চমক থাকে একেবারে শেষে। তা জানার জন্য পাঠককে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতেই হবে। 'বিনোদিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই'। এটা বুঝতে শেষ লাইনে আসতেই হবে।

সংবাদ রচনায় ঠিক এর উল্টো রীতি মেনে চলা হয়। সংবাদে মূল বক্তব্য থাকে একেবারে প্রথমে। একেবারে গোড়াতেই তা বলে দেওয়া হয়। সাধারণ রচনা হল পিরামিডের মতো। ওপর দিকটা সরু, তলার দিকটা চওড়া। যত নীচে নামবে পাঠক ততো বেশি জানবে। কিন্তু সংবাদ রচনার গঠন উল্টো পিরামিডের মতো। ওপর দিকটা চওড়া, তলার দিকটা সরু। মূল বক্তব্য থাকে একেবারে প্রথমে। যত নিচের দিকে যাওয়া যায় তত কম গুরুত্বপূর্ণ অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। শেষে এমন একটা জায়গা আসে যখন আর কিছুই বলার থাকে না।

সংবাদ শুরুর অংশকে বলে লীড। অল্প কথায় সংবাদের মূল বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হয়। সংবাদ রচনার কৌশল অনুযায়ী একেবারে প্রথমেই বলে দেওয়া হয় আসল কথাটা। কোনও রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যু হলে অথবা সরকার পদত্যাগ করলে সূচনাতেই মূল ঘটনাটি জানাতে হয়। লীডটুকু পড়লেই পাঠক জেনে যান কী ঘটেছে। সম্পাদনার সময় খেয়াল রাখতে হয় অল্প কথায় সহজভাবে লীড লিখতে হবে। লীডটুকু পড়েই আন্দাজ পাওয়া যাবে সংবাদের মূল কথাটা কী।

সংবাদ রচনার ভাষা হবে সহজ। এমন শব্দ ও বিন্যাস ব্যবহার করতে হবে যাতে একবার পড়েই অল্প শিক্ষিত মানুষও বুঝতে পারে। ছোট ছোট বাক্যে যথাসম্ভব কর্তৃবাচ্যে লিখতে হবে। ক্রিয়াপদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সংবাদটির তাৎক্ষণিকতা বজায় থাকে। পড়ে মনে হবে যেন একটু আগেই ঘটনাটা ঘটেছে। পাঠকের মনে হবে একেবারে টাটকা খবর পড়ছেন।

সম্পাদনার সময় যখন পৃষ্ঠাসজ্জার পরিকল্পনা হবে তখন সেখানে ছবি এবং শিরোনামের ব্যবহার থাকবে। বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম এবং ছবি পৃষ্ঠাসজ্জাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। যত দিন যাচ্ছে পৃষ্ঠাসজ্জার চিত্রময়তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক সময় এর জন্য পেশাদার শিল্পীদের সাহায্য নেওয়া হয়। আজকাল পৃষ্ঠাসজ্জায় গ্রাফিক্সের ব্যবহারও হচ্ছে। প্রিন্ট গ্রাফিক্স পৃষ্ঠাসজ্জাকে করে তুলছে স্মার্ট ও দৃষ্টিনন্দন।

সারাংশ

সম্পাদনা সংবাদকে মুদ্রণযোগ্য করে তোলে। দক্ষ হাতে নিউজ কপির গুণমান উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত হয়। সংবাদ রচনার নির্দিষ্ট আঙ্গিক আছে। এর নাম উল্টো পিরামিড। সংবাদের মূল বিষয়টি একেবারে প্রথমে বলে দিতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশিত হবে।

সঠিকভাবে সংবাদ পরিবেশনের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন। সম্পাদনা কার্য নির্ভর করে এই পরিকল্পনার ওপরে। শিরোনাম ও ছবি দিয়ে পাতা সাজাতে হয়। সংবাদ রচনার লীডের গুরুত্ব আছে। উল্টো পিরামিড সূত্রে লীডের মধ্যেই মূল বক্তব্য পরিবেশিত হয়। সম্পাদনার সময় সবসময়ই পৃষ্ঠাকে দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলার চেষ্টা থাকে।

উদ্ভব

সংবাদপত্রের প্রথম যুগে শিরোনামের ব্যবহার ছিল না। উলম্বভাবে পর পর সাজানো থাকতো কিছু লেখা। লেখার মাথায় থাকতো লেবেল, যা বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত দিত। সিরোনাম না থাকার দরুণ একটা লেখা থেকে আরেকটি লেখা আলাদা করা কঠিন হত। শিরোনামের ব্যবহার প্রথম শুরু হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি কাগজ মেক্সিকো যুদ্ধের (১৮৪৬-৪৮) খবর শিরোনাম সহযোগে প্রকাশ করতে শুরু করে। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বড় হরফে শিরোনাম তৈরি করে খবরের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হত। তবে প্রথমদিকে কেবলমাত্র দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্যই এই ব্যবস্থা থাকত। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬১-৬৫) সময় থেকেই শিরোনামের বহুল প্রচলন দেখা যায়। এরপর আসে স্পেনের যুদ্ধ (এপ্রিল ১৮৯৮ - আগষ্ট ১৮৯৮)। যুদ্ধের খবরকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করার তাগিদ থেকে শিরোনাম বিন্যাসে এল আমূল পরিবর্তন। ঠিক এই সময়ই আবার ঘটেছিল চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতার সেই যুগান্তকারী প্রতিযোগিতা। হার্সটের নিউ ইয়র্ক মর্নিং জার্নাল ও পুলিৎজারের নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড শিরোনামকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছিল। এরপর যতদিন গেছে শিরোনামের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব বেড়েছে।

অক্ষরের মাপ

শিরোনাম লেখার সময় অক্ষরের মাপ সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। অক্ষরকে ইউনিট দিয়ে মাপা হয়। ইংরেজিতে বড় হাতের ও ছোট হাতের অক্ষর আছে। বাংলায় শুধু বড় হাতের অক্ষর। ব্যঞ্জনবর্ণের কিছু অক্ষর আকারে মোটা হয়। যেমন আকার, ইকার, ঈকার, একার, ওকার ও ঔকার যুক্ত অক্ষরগুলিষ। ক হচ্ছে এক ইউনিট, কা দেড় ইউনিট, আর কো, কৌ হবে দু-ইউনিট। অক্ষর গোনার সঙ্গে যোগ করতে হয় দুটি শব্দের মধ্যে সাদা জায়গাকে, সাদা জায়গার একক হল এক ইউনিট। বাংলা ক হল এক ইউনিট। ইউনিট কাউন্ট করলেই বোঝা যাবে কোন্ শিরোনামের মাপ কত।

টাইপেরও মাপ আছে। পয়েন্টে দিয়ে টাইপ মাপা হয়। এক পয়েন্ট হল এক ইঞ্চির বাহাত্তর ভাগের এক ভাগ। ওপরে নিচে বাহাত্তরটি বিন্দু বসালে এক ইঞ্চির দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে। পয়েন্ট দিয়ে টাইপের দৈর্ঘ্য মাপা হয়। টাইপের প্রস্থ মাপা হয় এম দিয়ে। একটি ইংরেজি এম অক্ষর ১২ পয়েন্টের।

শিরোনাম তৈরি হয় সংবাদের নির্যাস দিয়ে। সংবাদের লীডের মধ্যেই থাকে এই নির্যাস। লীডটি ভালোবাবে পড়লেই শিরোনামের আইডিয়া পাওয়া যাবে। দেখতে হবে কোন বিষয়টি সংবাদের মূল বিষয়। তারপর ঐ বিষয়টিকে যথাসম্ভব অ্যাকশন সমেত তুলে আনতে হবে শিরোনামে। মনে রাখতে হবে শিরোনাম পড়েই যেন পাঠক মূল সংবাদের হদিশ পান এবং প্রতিবেদনটি পড়ার জন্য আগ্রহ বোধ করেন। বাক্য গঠনে যদি নাটকীয়তা থাকে, মানবিক আবেদনের স্পর্শ থাকে, তাহলে তা অবশ্যই আকর্ষণীয় হবে। একটি পাতায় অনেকগুলি সংবাদ প্রতিবেদন থাকে, প্রতিটি প্রতিবেদনের ওপরে থাকে শিরোনাম। প্রতিটি শিরোনাম চেষ্টা করে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে। এ এক নীরব প্রতিযোগিতা, পাঠক পড়ার সময় এর সামান্য আঁচটুকুও পান না। কিন্তু প্রতিযোগিতা জারি থাকে, নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে পাঠকের মন জয় করার লক্ষ্যে।

বিভিন্ন শিরোনাম

শিরোনাম বিভিন্ন রকমের হতে পারে। দেখার দৃষ্টিকোণ থেকে শিরোনামের শ্রেণী বিভাজন করা হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একটি পাতায় বিভিন্ন শিরোনাম বিন্যাস দেখা যায়। এই বৈচিত্র পৃষ্ঠাসজ্জাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

ব্যানার শিরোনাম (Banner Headline) হল খুব জনপ্রিয় শিরোনাম। খুব গুরুত্বপূর্ণ অথবা দিনের সেরা খবরের শিরোনাম আট কলাম জুড়ে খুব বড় হরফে করা হয়। একে বলে ব্যানার শিরোনাম। প্রযুক্তির কল্যাণে এই শিরোনাম আজকাল সব কাগজই করছে।

উল্টো পিরামিড হল একটি শিরোনাম। এর আকৃতি উল্টো পিরামিডের মতোন। প্রথম লাইন চওড়া, তার পরের লাইন অপেক্ষাকৃত ছোট, তারপরের লাইন আরও ছোট। দুই, বা তিন লাইন নিয়ে গঠিত হয়। নীচের দিকটা ক্রমশ ছোট হওয়ার ফলে উল্টো পিরামিডের আকৃতি নেয়।

ক্রশ লাইন হল আরেক রকমের শিরোনাম। একটি মাত্র লাইন নিয়ে গঠিত হয়। কলামের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বিস্তৃত হয়। সাধারণত তিন, চার অথবা পাঁচ কলাম জায়গা নিয়ে থাকে। বাঁ দিকে এবং ডান দিকে সমান ফাঁক বিশিষ্ট কেন্দ্রিভূত (indented) একটি লাইন তৈরি হয় ক্রস (cross) লাইন। সম্প্রতি এই ক্রসলাইনের ব্যবহার বেড়েছে। প্রথম পাতার অ্যাঙ্করে ক্রস লাইন নিয়মিত দেখা যায়। ভিতরের পাতাতেও ক্রস লাইনের ব্যবহার বেড়েছে। এই শিরোনাম পৃষ্ঠাসজ্জায় তীক্ষ্ণতা বা sharpness নিয়ে আসে। পৃষ্ঠাসজ্জা হয়ে ওঠে স্মার্ট।

পিরামিড আকারেও শিরোনাম তৈরি হয়। এখানে ওপরের লাইন ছোট, আর তলার লাইন একটু বড় হয়। প্রায়শই এই শিরোনাম আমরা দেখতে পাই।

বৈচিত্র্য আনার জন্য অনেক সময় ছোট ও বড় হরফের সমন্বয়ে তৈরি হয় কিকার (Kicker) শিরোনাম। বড় হরফে যে লাইন লেখা হবে ঠিক তার বাঁদিকে ওপরে ছোট হরফের খুব অল্প জায়গা নিয়ে একটি লাইন থাকবে। বড় হরফ যা হবে ছোট হরফ তার অর্ধেক হওয়া উচিত।

কিকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ওভারলাইন (overline) এবং আন্ডারলাইন (underline) শিরোনাম। কিকারের মতোই ছোট ও বড় দুই ধরনের হরফের সমন্বয়ে এই শিরোনাম তৈরি হবে। ছোট হরফ যে মাপের হবে, বড় হরফ তার দ্বিগুণ মাপের হওয়া উচিত। ওভারলাইনের ক্ষেত্রে ছোট হরফ ওপরে থাকবে, আর আন্ডারলাইনের ক্ষেত্রে বড় হরফ ওপরে থাকবে। এদের স্ট্র্যাপলাইন (strapline) বা শোল্ডার (shoulder) বলেও অভিহিত করা হয়।

কিকারের বিপরীত ধরনের শিরোনাম হল হ্যামার (Hammer), আমাদের দেশে এর ব্যবহার খুব কম। তবে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে এই শিরোনাম খুব কার্যকরী। ওপরে থাকবে বড় হরফ আর তলায় থাকবে ছোট হরফ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে একটা হাতুরির আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিরোনামের আর একটি রূপ হল কটি রেখা (waist line)। তিনটি লাইন অবশ্যই এখানে থাকবে। ওপরের আর তৃতীয় লাইনটি সমমাপের হবে। মধ্যিখানের লাইনটি হবে ছোট। কোমরের আকৃতি পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদনের মধ্যে অনেক সময় অনু শিরোনাম (Sub-heading) দেখা যায়। লেখার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এই ছোট বা অনু শিরোনাম দেওয়া হয়। পাঠকের বিষয়বস্তু বুঝতে সুবিধা হয়। তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে সাহায্য করে এই শিরোনাম। বডি টাইপের ধূসরতাও ভেঙে দিয়ে পাঠকের চোখকে আরাম দেয়।

কম্পিউটার গ্রাফিক্সের ব্যবহার শিরোনাম রচনায় বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে শিরোনাম তৈরি করাও এখন অনেক সহজ। সবসময়ই যে প্রথাগত নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে এমন নয়। ইচ্ছে হলে উদ্ভাবনের সাহায্যও নেওয়া যায়। শিরোনামের বৈচিত্র্য পৃষ্ঠাসজ্জাকেও আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

সূচনা (Intro)

সংবাদের মূল বিষয়বস্তুকে অল্প কথায় একেবারে শুরুতে লিখতে হয়। শিরোনামের পরেই থাকে সূচনা বা Intro, উল্টো পিরামিডের সূত্রে সংবাদের মূল বক্তব্যকে নিয়ে আসা হয় শুরুতে।

পাঠক জানতে চায়। দ্রুত তাকে জানাতে হবে। কীভাবে তা সম্ভব? উত্তর হল সূচনায় বা Intro-তে দু-এক কথায় মূল ঘটনাটি জানিয়ে দিতে হবে। পাঠক সূচনা পড়েই কী ঘটেছে সে সম্পর্কে জানতে পারবে। পুরো খবর না পড়লেও চলবে। সুচনার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, সূচনা সর্বদাই মূল সংবাদের কথা বলবে। দ্বিতীয়ত, সূচনা অত্যন্ত সংক্ষেপে লেখা হবে। তৃতীয়ত, সূচনায় অল্পকথায় অনেক বেশি বলার প্রচেষ্টা থাকবে। চতুর্থত, পাঁচ ডবলু এবং ওয়ান এইচকে ধরে রাখবে। পঞ্চমত, পুরো সংবাদকে পাঠ করতে উৎসাহী করবে সূচনা। পাঠকের পড়ার খিদে বাড়িয়ে দেবে।

এম ভি চার্ণলি (M.V. Charnley) তাঁর Reporting বইতে একটি কেন্দ্রিয় ভাবনার উল্লেখ করেছেন। সূচনা লেখা হবে এই কেন্দ্রিয় ভাবনার ওপর ভিত্তি করে। তাঁর মতে প্রত্যেক সংবাদেরই একটি কেন্দ্রিয় ভাবনা থাকে, যাকে আশ্রয় করে তৈরি হয় সূচনা।

সংবাদে জানানোর ব্যাপারটাই প্রধান। নতুন তথ্য দিয়ে পাঠককে জানাতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আসতে হবে সূচনায়, যাতে পাঠক সূচনাটুকু পড়েই মূল খবরটুকুর আন্দাজ পায়। সংবাদের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটকে ধরতে হবে ছোট সূছনায়। কাজটি করতে গেলে দক্ষতার প্রয়োজন।

প্রথাগত ফর্মুলা অনুসারে সূচনায় পাঁচ ডবলু এবং ওয়ান এচিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। বাস্তবে দেখা গেছে এতে তথ্যের আধিক্যে স্বচ্ছতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই অনেক সংবাদপত্র মনে করে এর আর প্রয়োজন নেই। New York Times-এর Managing Editor Turner Catledge বলেছেন “We feel it is no longer necessary and perhaps it never was, to wrap up in one sentence or paragraph, all the traditional Five Ws and One H.” Catledge-এর কথায় যুক্তি আছে। ছোট সূচনার মধ্যে এতগুলো কথা বলতে গিয়ে সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে যায়। সবচেয়ে ভাল হয় যদি একটি, দুটি W এবং এক H নিয়ে আসা যায় সূচনায়। যেমন—নয়াদিল্লি ২২ ফেব্রুয়ারী—লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজাল আজ দিল্লির বিধানসভা ভেঙে দিয়েছেন। এখানে কে, কী, কখন উল্লিখিত হয়েছে।

কে—লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজাল

কী—দিল্লির বিধানসভা

কখন—আজ ২২ ফেব্রুয়ারি

সূচনা শিরোনাম লিখতে সাহায্য করে। শিরোনাম লেখার জন্য পুরো লেখা পড়ার দরকার হয় না। সূচনাটুকু পড়েই জানা যায় সংবাদের বিষয়বস্তু কী। সম্পাদনার সময়ের গুরুত্ব বেশি। অল্প সময়ে শিরোনাম লেখা গেলে কাজের সুবিধা।

বিভিন্ন ধরনের সূচনা

ক্লাইম্যাক্স সূচনা (Climax Intro) : যে কোনও ঘটনারই এক চূড়ান্ত পর্যায় থাকে। যাকে বলে Climax, সূচনার যদি এই Climax-কে ধরা হয় তাহলে ওই সূচনাকে বলা হবে ক্লাইম্যাক্স সূচনা। হার্ড নিউজের ক্ষেত্রে ঐ সূচনা বেশি দেখা যায়। যেমন—

"চিংড়িহাটা থেকে সেক্টর ফাইভ হয়ে নিউটাউন পর্যন্ত নতুন উড়ালপুল বানানোর পরিকল্পনা নিয়েছে কেএমডিএ।" (এইসময়)

উড়ালপুল নিয়ে এটাই ক্লাইম্যাক্স এবং সেটা নিয়ে আসা হয়েছে সূচনায়।

বর্ণনাত্মক সূচনা (Descriptive Intro) : একটি পরিস্থিতিকে বর্ণনা করে সূচনা। বর্ণনা পড়ে পাঠক সংবাদটির সামগ্রিক রূপটি পায়। একেবারে ছবির মতো উঠে আসে ঘটনা। সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মরণে হুল উৎসবের ওপর একটি সংবাদের সূচনা ছিল এইরকম—

"পাহাড় অরণ্য জেগে উঠল দুন্দুভির দ্রিম্‌দ্রিম্ রবে। সাঁওতাল পল্লী থেকে বেরিয়ে এল তরুণ-তরুণীরা। মুখে তাদের বিপ্লবের গান, পায়ে বিদ্রোহের ছন্দ।" (আনন্দবাজার পত্রিকা)

বুলেট সূচনা (Bullet Intro) : এই সূচনায় সংবাদ বুলেটের মতো এসে বিদ্ধ করে পাঠককে। একটি ছোট বাক্য দিয়ে তৈরি হয় এই সূচনা। বাক্যটি ছোট হবে কিন্তু তার প্রভাব হবে বিশাল। এ যেন বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে ধরার চেষ্টা।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পরে বুলেট সূচনা হয়েছিল। 'নেহেরু আর নেই'। প্রধানমন্ত্রী মারা গেলে সূচনা হতে পারে—

'প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত।' এতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

বিলম্বিত সূচনা (Delayed Intro) : গল্পের রহস্য ধরে রাখার মতো সংবাদ সূচনাতেও মূল বক্তব্য না বলে সামান্য আভাষ দেওয়া হয়। এতে সাসপেন্স তৈরি হয়। পাঠকের আগ্রহ বাড়ে। উদ্দেশ্য পাঠকের পড়ার খিদে তৈরি করা। কয়েক লাইন পড়ার পর পাঠক আসল বক্তব্যের সন্ধান পায়। সূচনা রচনার এই রীতি সাহিত্য রচনার কাছাকাছি, গল্পের মেজাজ পাওয়া যায়।

"লখনউ: 'শুনছেন, কেউ কি রয়েছেন?' সাহায্যের আর্জি জানিয়ে চিৎকার করছেন ছেলে। কিন্তু

জনপ্রাণী দূরের কথা, জবারে টুঁ শব্দটিও করেননি কেউ। এদিকে ছটফট করছেন মা। খানিক পড়েই থেমে যায় কাতরানি, গোঙানি।" (এইসময়)

উত্তর প্রদেশের হরদৌই জেলার ঘটনা। অসহায় ছেলের বিলাপ নিয়ে একটি মর্মস্পর্শী প্রতিবেদনের সূচনা এটি। এই ধরনের সূচনা আজকাল সংখ্যায় বেশি দেখা যাচ্ছে। কারণ হার্ড নিউজ-এর সবটাই চলে আসছে টেলিভিশনে। সকালে কাগজ পাবার অনেক আগেই মানুষ বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জেনে যায় টেলিভিশনে। কী ঘটেছে সবাই জানে, জানা বিষয়কে কীভাবে নতুনভাবে জানানো যায় এটাই চ্যালেঞ্জ। আসছে গল্পের আঙ্গিক, সাসপেন্স বজায় রেখে নাটকীয়ভাবে সংবাদ লেখার প্রবণতা। এভাবেই বিলম্বিত সূচনার জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

ছোট ছোট বাক্য দিয়ে তৈরি সূচনা (Staccato Intro) : একের পর এক ছোট বাক্য দিয়ে এই সূচনা তৈরি হয়। বাক্যগুলো এমনভাবে লেখা হয় যাতে একটা ছন্দ থাকে। মূল ভাবনাটি ধরা থাকে এই ছন্দের মধ্যে। বাক্যগুলো তৈরি করে এক কোলাজ। একটি দুর্ঘটনার সূচনা লেখা হচ্ছে এভাবে—

"চোখ ধাঁধানো আলো। গগনবিদারি চিৎকার। ভেঙে পড়া দেয়াল। ভাঙা কাঁচ। রক্ত, মৃত্যু"। টুকরো টুকরো বাক্যগুলি একটি দুর্ঘটনার কথা বলছে বোঝা যাচ্ছে। প্রচণ্ড নাটকীয়তা আছে এই সূচনায়।

কালক্রমানুসারী সূচনা (Chronological Intro) : এই ধরনের সূচনায় পর পর ঘটনাকে উল্লেখ করা হয়। এক একটি বাক্য এক একটি দৃশ্য উন্মোচন করে। পাঠক ক্রমশ ঘটনাসমূহের সামগ্রিক রূপটি দেখতে পায়। যেমন—

"বুধবার রাতে সল্টলেক থানায় ডিডি ব্লকে একটি পেট্রোল পাম্পে ডাকাতি হয়। ৪ ডাকাত পাম্প থেকে ৮০ হাজার টাকা, তিনটি মোবাইল ও একটি সোনার চেন নিয়ে চম্পট দেয়। বিনা রক্তপাতে ২০ মিনিটের মধ্যে ডাকাতি করে বোমা ফাটিয়ে চলে যায় ডাকাতরা। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।" (আজকাল), লক্ষণীয় এখানে পর পর ঘটনা উল্লেখ করে সূচনা তৈরি করা হয়েছে।

ইনট্রো ও লীডের বিশেষ পার্থক্য নেই। আমেরিকানরা ইনট্রোকে বলে লীড। সংবাদকে দ্রুত মানুষের কাছে সহজভাবে পৌঁছে দিতে ইনট্রো বা সূচনার কোন বিকল্প নেই। হার্ড নিউজের ক্ষেত্রে ক্লাইম্যাক্স সূচনার ব্যবহার হলেও সফ্‌ট নিউজের ক্ষেত্রে কিন্তু বিলম্বিত সূচনাই প্রাধান্য পাচ্ছে।

প্রুফ রিডিং (Proof Reading)

যে কোনও মুদ্রণের আগে প্রুফ দেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রুফ মানে যে কোনও বিষয় প্রথম কম্পোজ হবার পর ছাপা হলে তৈরি হয় প্রথম প্রুফ। মূল লেখার মিলিয়ে ঐ প্রুফ সংশোধন করতে হয়। যে কোন মুদ্রণেরই এটি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যে কোন ছাপার ক্ষেত্রে সেকেন্ড প্রুফ অতি আবশ্যিক। প্রচুর ভুল থাকে, সেগুলি সংশোধন করে দিতে হয়। এই সংশোধন প্রক্রিয়ার কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন কিছু বাদ দিতে হলে d এই চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়। অতিরিক্ত কিছু কোথাও সংযোজন করতে হলে h এই চিহ্ন দিতে হয়। কোথাও জায়গা বা space দিতে হলে # এই চিহ্ন দিতে হবে। এরকম বহু চিহ্নের ব্যবহার হয় প্রুফ রিডিং-এ।

সংবাদপত্র প্রকাশনাতেও প্রুফ একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ম্যাটার কম্পোজ হয়ে গেলে প্রুফে সংশোধন করা হত। তারপর পিটিএস পদ্ধতি আসার পর প্রথম ছাপার কপিকে সংশোধনের ব্যবস্থা ছিল। প্রুফ সংশোধনের পর ম্যাটার ছাপার জন্য তৈরি হয়।

বর্তমানে কম্পোজ হয় কম্পিউটারে। হয় পিসি অথবা ল্যাপটপে। কম্পিউটারের পর্দাতেই যাবতীয় সংশোধন-এর কাজ সম্পন্ন হয়। যারা সম্পাদনা করছেন তারাই প্রুফ দেখার কাজ করে দেন। আলাদাভাবে প্রুফ দেখার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। সংশোধনের জন্য সফট্ওয়ারও আছে।

সারাংশ

শিরোনাম সংবাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। কাগজ হাতে তুলে নিয়েই পাঠক প্রথমে পড়ে শিরোনাম। প্রথম পৃষ্ঠায় চার-পাঁচটি শিরোনাম। কোনটা বড়, কোনটা ছোট, আবার কোনটা সামারি মাপের। বিভিন্ন সাইজের এবং বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম পৃষ্ঠাসজ্জায় বৈচিত্র্য আনে। লেবেল আর শিরোনামের মধ্যে পার্থক্য আছে। শিরোনাম লেখার জন্য সঠিক শব্দ চয়ন দরকার। কতটা জায়গা নিতে পারে সেটাও জরুরী। ক্রিয়াপদের ব্যবহারও শিরোনামকে গতি দেয়। শিরোনামের উদ্ভব হয় আমেরিকার চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতার যুগে। শিরোনাম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে শিরোনামের ধরনও পাল্টায়।

শিরোনামের পরেই থাকে সূচনা বা ইনট্রো (Intro)। আমেরিকান বলে লীড। এখন লীড কথাটাই বেশি চালু। সংবাদের নির্যাসটুকু পাওয়া যায় সূচনায়। সূচনা শিরোনাম লিখতে সাহায্য করে। ব্যস্ত পাঠক শুধু সূচনা পড়েই কাগজ পাঠ শেষ করতে পারেন, কারণ প্রত্যেকটি সূচনাই সংবাদের মূল বক্তব্য পেশ করে। সূচনা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সূচনার প্রকাশভঙ্গী অনুযায়ী সূচনার বিভিন্ন নাম হয়। যেমন ক্লাইম্যাক্স সূচনা। হার্ড নিউজের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সফট নিউজের জন্য হয় বিলম্বিত সূচনা।

প্রুফ রিডিং প্রকাশনার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ছাপার আগে মূল লেখার সঙ্গে মিলিয়ে ত্রুটি সংশোধন করাই হল প্রুফ রিডিং। বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে প্রুফ দেখতে হয়।

ম্যাগাজিন/সাময়িকী সম্পাদনা

আমরা দু ধরনের সাময়িকীর সঙ্গে পরিচিত। বিভিন্ন খবরের কাগজের রবিবারের সংস্করণের সঙ্গে বাড়তি কয়েক পাতার একটি ক্রোড়পত্র বিতরণ করা হয়। এই ক্রোড়পত্রকে ম্যাগাজিন (Magazine) বা সাময়িকী বলা হয়।

তা ছাড়া অনেক পত্রিকা আছে যেগুলি রোজ প্রকাশিত হয় না। সাতদিন, দু'সপ্তাহ বা এক মাস অন্তর পাঠকদের হাতে যায়। সেগুলিও ম্যাগাজিন বা সাময়িক পত্রিকা বলে অভিহিত হয়।

আমরা এই অনুচ্ছেদে খবরের কাগজের রবিবারের ক্রোড়পত্রে বা সাময়িকী সম্পাদনার বিষয়টি

আলোচনা করব। খবরের কাগজের সাময়িকী তৈরির ভার একজন সহকারী সম্পাদকের ওপর থাকে। কিন্তু তিনি ম্যাগাজিন এডিটর বলেই পরিচিত হন।

ম্যাগাজিন এডিটর দু'তিনজন সাব-এডিটরের সাহায্যে সাময়িকী সম্পাদনা করেন। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে খবরে কাগজের সাময়িকীতে সাহিত্য সম্পর্কিত লেখা প্রকাশিত হয়। ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী, রসরচনা, পুস্তক সমালোচনা থাকত এই সব সাময়িকীতে।

সংবাদপত্রের সাময়িকীতে রোজ রোজ যা যা ঘটে তার বিবরণ থাকে না। তবে গুরুতর সংবাদের পটভূমি ও পার্শ্বকাহিনী সাময়িকীতে প্রকাশের সুযোগ আছে। তাকে প্রচ্ছদ কাহিনী বলা হয়।

সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য এই সব বিষয়কেন্দ্রিক লেখা যোগাড়ের ব্যবস্থা করবেন সম্পাদক।

এইসব লেখা যোগাড় করার জন্য সাময়িকীর সম্পাদক দ্রুতগতিতে লোক লাগিয়ে (assignment) দেবেন। বিভাগের কোন সাব এডিটরকে কাগজের পুরানো ফাইল ঘেঁটে একটি লেখা তৈরির দায়িত্ব দেবেন। কোন ফ্রিল্যান্স ফিচার লেখকের কাছে আর একটি লেখা চাইবেন। বার্তা সম্পাদকের মাধ্যমে দিল্লির সংবাদদাতাকে একটি লেখা দেবার জন্য নির্দেশ পাঠাবেন।

লেখার দায়িত্ব বন্টনের সময় কবে, ক'ঘন্টার মধ্যে লেখা জমা দিতে হবে তাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে কোন গড়িমসি খবরের কাগজ সহ্য করে না।

খবরের কাগজের সাময়িকী মূল কাগজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে না। করার চেষ্টা করলেও তাতে এঁটে উঠতে পারবে না। কারণ দৈনিক প্রকাশিত খবরের কাগজে কালকের ঘটা সব গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রতিদিনের সংখ্যায় পাওয়া যায়। কিন্তু সাময়িকী প্রকাশিত হয় প্রতি সপ্তাহের সপ্তম দিনে। তাই টাটকা ঘটনার খবরের বোঝা সাময়িকীতে থাকে না। সেই জন্যই সাময়িকীকে সাহিত্যধর্মী রচনা এবং সংবাদের বিস্তারিত পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতের রচনাগুচ্ছের ওপর নির্ভর করতে হয়।

আমেরিকার পেন্টাগন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসবাদী বিমান হানার খবর বিস্তারিতভাবে খবরের কাগজে পরদিন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেই খবরের মধ্যে পেন্টাগন এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের খুঁটিনাটি বর্ণনা খুঁজতে গেলে পাঠক হতাশ হবেন। তাঁদের এই ব্যাপারে কৌতূহল মেটাতে পারে সাময়িকী। সেই জন্যই সম্পাদকরা জানেন, সাময়িকী মূল কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

তাই বলে ধরে নেবেন না, সব খবরের কাগজই তার সাময়িকীতে সংবাদের পটভূমি নিয়ে রচনাগুচ্ছ প্রকাশের পথে পা দিয়েছে। কোন কোন কাগজের সাময়িকী এখনও সাহিত্যধর্মী রচনা প্রকাশের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিক খবরের কাগজের সাময়িকী সম্পর্কে আপনাদের কয়েকটি কথা জানাই।

আনন্দবাজার পত্রিকার সাময়িকীর নাম ''রবিবাসরীয়''। ১৮ অগস্ট, ২০০২ সালে ''রবিবাসরীয়'' ছটি পাতা নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে শেষ পাতাটি কিশোরদের জন্য সংরক্ষিত নিয়মিত পত্রিকা। বিভাগটির নাম ''আনন্দমেলা''।

প্রথম পাতায় রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে রাজারামের সম্পর্ক নিয়ে একটি গবেষণামূলক লেখা। তাতে তিনটি প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান করা হয়েছে— ''রাজারাম রামমোহন রায়ের পুত্র? না, পোষ্যপুত্র? দত্তক? কে এই রাজারাম?''

দ্বিতীয় লেখাটি একটি ছোটগল্প।

তৃতীয় ও শেষ লেখাটি একটি ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাসের একটি অধ্যায়।

লক্ষ্য করুন, আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবারের এই সাময়িকীতে চলতি ঘটনা নিয়ে কোন লেখাকে স্থান দেওয়া হয়নি।

ম্যাগাজিনকে আমরা 'সাময়িকপত্র' বলেও থাকি। অর্থাৎ মনে রাখতে হবে সংবাদপত্র যেমন প্রত্যেকদিন প্রকাশিত হয়। পাঠক যেমন সংবাদপত্র বা খবরের কাগজের মাধ্যমে আগেরদিনে খবর পায়, ম্যাগাজিন কিন্তু একটা সময় অন্তর প্রকাশিত হয়। ম্যাগাজিন সাপ্তাহিক, কোনও ম্যাগাজিন পাক্ষিক বা কোনওটা মাসে একবার প্রকাশিত হয়। উদাহরণ দিয়ে বোঝলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে, যেমন বাংলা সংবাদপত্রর 'বর্তমান'-এর অন্যতম জনপ্রিয় ম্যাগাজিন হল 'বর্তমান সাপ্তাহিক'। এটি সপ্তাহে একবার করে প্রকাশিত হয়। ঠিক তেমনই 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর সঙ্গে প্রতি রবিবারে বিনামূল্যে 'রোববার' ম্যাগাজিন পাঠক পড়ার সুযোগ পায়। আবার 'বর্তমান' খবরের কাগজেরই 'সুখী গৃহকোণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা সংবাদপত্রের বিনোদনমূলক ম্যাগাজিন 'আনন্দলোক', সাহিত্যমূলক ম্যাগাজিন 'দেশ', লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন 'সানন্দা' মাসে দু'বার অর্থাৎ ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ এই ম্যাগাজিনগুলি পাক্ষিক।

মনে রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেকটি ম্যাগাজিনের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই যেমন, 'আনন্দলোক', ম্যাগাজিনে টলিউড, বলিউড ও হলিউডের নানান বিনোদনের খবর থাকে। 'বর্তমান' সংবাদপত্রের 'শরীর ও স্বাস্থ্য' নামের ম্যাগাজিনে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে লেখা বা ডাক্তারদের পরামর্শ থাকে। আবার, 'সুখী গৃহকোণ' ম্যাগাজিনে যেমন মহিলাদের সাজগোজ, ঘর সাজানো, নানা রান্নার রেসিপির খবর দেওয়া হয়। একই ধরনের বিষয় লক্ষ্য রাখা যায় 'সানন্দা' ম্যাগাজিনেও। পাশাপাশি, বাংলাতেই ভ্রমণ বিষয়ক, চাকরির খবরাখবর সংক্রান্ত ম্যাগাজিনও প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ম্যাগাজিনগুলির মধ্যে অনেকগুলি তো পূজাবার্ষিকী প্রকাশ করে।

আসলে, ম্যাগাজিন গণজ্ঞাপনের একটি মাধ্যম, যা সমসাময়িক অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সামাজিক বিষয়ের খবরাখবর বিস্তৃত আকারে পাঠককে জানাতে সাহায্য করে। উল্লেখযোগ্য হল, পাঠক সংবাদপত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অল্প শব্দে জেনেছে, ম্যাগাজিনের মাধ্যমে তাঁরাই বেশি করে জানতে চান। এমনকি, ওই বিষয়ে যদি অজানা তথ্য কিংবা ছবি পাঠকের সামনে হাজির করা যায়, তাহলে অল্পদিনের মধ্যে ওই সাময়িকপত্রটি পাঠকদের ভাল লাগতে বাধ্য।

সাধারণভাবে, ম্যাগাজিন পাঠকের অবসরের সঙ্গী। পাঠক সংবাদপত্রের 'হার্ড নিউজ'-এর জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে খবরের নতুন দিক বা তথ্য, বিশ্লেষণ, গুরুগম্ভীর বিষয়কে বাদ দিয়ে একটু হালকাধর্মী খবর, গল্পের স্বাদ খুঁজে পায় ম্যাগাজিনের মাধ্যমে।

তবে সংবাদপত্রের মতো ম্যাগাজিনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল, পাঠককে খবর জানানো, আনন্দ দেওয়া

ও প্রভাবিত করা। একটু ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, অন্যতম প্রাচীন ম্যাগাজিন ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড কাভে সম্পাদিত লন্ডনের 'জেন্টলম্যান ম্যাগাজিন'। এই পত্রিকাই প্রথম ম্যাগাজিন শব্দটি ব্যবহার করে।

প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় প্রেস কমিশনের সুপারিশ ছিল, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ সরকারের প্রেস ও পুস্তক নিবন্ধন সম্পর্কিত আইনের আওতায় সব ধরনের সংবাদ প্রকাশনকে এনে তিনটি বিভাগ করা হোক। তিনটি বিভাগ হল সংবাদপত্র, সংবাদ ম্যাগাজিন বা সাময়িকপত্র এবং পর্যাবৃত্ত।

ম্যাগাজিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রচনারীতি ও রচনাশৈলী। মনে রাখা জরুরি, ম্যাগাজিনের রচনারীতি হবে সহজপাঠ্য, অতি অবশ্যই অতিরঞ্জনবিহীন। লেখার মধ্যে থাকবে একটা টানটানভাব, বর্ণময়তা। ম্যাগাজিনের লেখা মানেই গবেষণার আধার। উল্লেখ্য, ম্যাগাজিনে যেহেতু একটি বিষয়ে একটু বেশি লেখা থাকে, তাই দীর্ঘ লেখাকে বিভিন্ন 'সাব হেডিং-এ ভাগ করা থাকলে, পাঠকের পড়তেও সুবিধা হয়। সেই কারণে, এ বিষয়ে ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। প্রসঙ্গত, ম্যাগাজিনের লেখাগুলি বেশিরভাগই 'ফিচারধর্মী' হয়ে থাকে।

সাময়িকপত্র বা ম্যাগাজিনের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবসময় 'টাটকা' ও 'আকর্ষণীয়' বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয়। যাতে করে পাঠক ম্যাগাজিনের বিষয়গুলি পড়ার আগ্রহ খুঁজে পায়। পাশাপাশি, ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাসজ্জার ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হয়। মনে রাখা জরুরি, ম্যাগাজিনের পেজ লে-আউট যত আকর্ষণীয় হবে, তত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেই কারণে, ম্যাগাজিনে কোনও বিষয়ের লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছবি ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব পায়। পরিশেষে মনে রাখা প্রয়োজন, ম্যাগাজিনে যেমন বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র্য থাকতে হবে, ঠিক তেমন প্রচ্ছদে চমক থাকা আবশ্যিক।

৪.৪.৫ অনুশীলনী

- **ছোট প্রশ্ন :**

১। সংবাদপত্রের রবিবারের ক্রোড়পত্রকে কী ?

২। 'সংবাদ প্রতিদিন'-এর সঙ্গে প্রতি রবিবারে বিনামূল্যে .... ম্যাগাজিন পাঠক পড়ার সুযোগ পায়।

- **বড় প্রশ্ন :**

১। সংবাদপত্রের সাময়িকীতে কি ধরনের রচনা স্থান পায়?

২। সাময়িকী মূল কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়— ব্যাখ্যা করুন।

৪.৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। *আধুনিক ভারতে সংবাদিকতা*, রোনাল্ড ই উলসলে কর্তৃক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ১৯৮১। সাঁইত্রিশ টাকা।

২। *দাদাঠাকুর*, নলিনীকান্ত সরকার।

৩। *News Editing*, Bruce Westley, Oxford and IBH Publishing Co. Kolkata : New Delhi.

Notes	Notes

৩.৪ বেতার ও টেলিভিশনের বিষয়বস্তুর লিখনরীতি

বেতারের জন্য লেখালেখি

৩.৪.১ উদ্দেশ্য
৩.৪.২ প্রস্তাবনা
৩.৪.৩ কথিত ভাষার লিপিরূপ
৩.৪.৪ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য স্ক্রিপ্ট
৩.৪.৫ বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানের জন্য স্ক্রিপ্ট
৩.৪.৬ কণ্ঠের ব্যবহার
৩.৪.৭ ঘোষক, উপস্থাপকের কাঙ্খিত গুণাবলী

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়ার পর নিম্নলিখিত বিষয় জানতে পারবেন শিক্ষার্থী—

- বেতার অনুষ্ঠানের জন্য স্ক্রিপ্ট লেখার প্রয়োজনীয়তা
- স্ক্রিপ্টে ব্যবহৃত বেতার উপযোগী ভাষা
- বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠানের জন্য স্ক্রিপ্ট
- কণ্ঠের ব্যবহার
- ঘোষক ও উপস্থাপকের কাঙ্খিত গুণাবলী

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

বেতারে কথা বলা হয়। এটা শব্দের মাধ্যম, কথ্য ভাষার মাধ্যম। তাহলে তা বলা যায় যে এই মাধ্যমের জন্য মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলাটাই যথেষ্ট, সেটাই রেকর্ড করে বা সরাসরি সম্প্রচার করা যায়।

কোনও কিছু লেখার প্রয়োজনীয়তা চট করে মনে আসে না এমন মাধ্যমের জন্য। কিন্তু বাস্তব অন্য রকম। বেতারের জন্য স্ক্রিপ্ট লেখা অত্যন্ত জরুরী। স্ক্রিপ্ট হুবহু অনুসরণ করে বক্তাকে কথা বলতে হবে এমন নয় কিন্তু স্ক্রিপ্ট ও রেকর্ডিংয়ের জন্য বক্তব্য যতটা কাছাকাছি হয় ততই ভালো। এর জন্য বেতার উপযোগী ভাষা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। স্ক্রিপ্টের নির্মাণ সময়সাপেক্ষে, তাড়াহুড়ো করে লিখলে তা বক্তা বা প্রযোজকের পক্ষে সহায়ক হয় না।

লিখিত স্ক্রিপ্ট নিয়ে বিশেষজ্ঞ পড়বেন, শ্রোতা শুনবেন তাঁর পরিবেশিত তথ্য এবং তাঁর মতামত। এখানে কণ্ঠের মাধুর্য বা পাঠের শৈলী খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। লেখার চলন, তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদি হল প্রধান। যখন ঘোষক বা উপস্থাপক অন্যের বা নিজের লেখা স্ক্রিপ্ট পাঠ করেন অথবা অনুষ্ঠানের আগে ও পরে ঘোষণা দেন তখন কণ্ঠচালনা হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবৃত্তি বা পাঠের ধরাবাঁধা রীতি ছেড়ে অনুষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী কণ্ঠের ওঠানামা নিয়ন্ত্রিত করতে হবে ঘোষক-ঘোষিকাকে। ঘোষকের জন্য স্বরক্ষেপের সাধারণ কিছু নিয়ম এবং মাইক্রোফোন সম্পর্কিত আচরণবিধি অবশ্য পালনীয়।

৩.৪.৩ কথিত ভাষার লিপিরূপ

নাটক বা ফিচারের জন্য স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনীয়তা আলাদা করে বোঝানোর দরকার পড়ে না। সংলাপ লেখা না থাকলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পক্ষে তা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। ফিচারের ভাষ্যের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষ্য তৈরি হয় না। গবেষণা করে, লিখে তবেই ভাষ্যের কাঠামো নির্মাণ সম্ভব। যেখানে একজন বক্তা একটা কথিকা (talk) শোনাবেন সেখানেও স্ক্রিপ্ট লিখে আনা জরুরী। তার কারণগুলো এইরকম—

(১) বক্তা কী বলবেন তার রূপরেখা তৈরি হয়ে যায়। কী বলবেন তিনি তা সামনে থাকায় আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, কীভাবে বলবেন তা নিজের ভাবনা অনুযায়ী ঠিক করে নিতে পারেন। এটা এক ধরনের সুরক্ষা-বর্ম।

(২) উপযুক্ত একটা স্ক্রিপ্ট এটা নিশ্চিত করে যে বক্তব্য বিষয়ের কোনও কিছুই বাদ থাকবে না বলতে। বিষয়ের ক্রম বা শৃঙ্খলাও নির্দিষ্ট করা থাকে স্ক্রিপ্টে। এই শৃঙ্খলা কথোপকথনের ক্ষেত্রে জরুরী। ছাপা মাধ্যমে যেমন সংবাদপত্রে শৃঙ্খলার কিছু এদিক-ওদিক হলে সমস্যা হয় না। পাঠক সুযোগ পান দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার লেখাটা পড়ে নিয়ে বিষয়টা উপলব্ধি করার। শ্রাব্য মাধ্যমে সে সুযোগ থাকে না।

(৩) যতটা সময় বরাদ্দ সেই অনুযায়ী বক্তব্যের দৈর্ঘ্য নিশ্চিত করে স্ক্রিপ্ট। শব্দসংখ্যা দেখে প্রযোজক বুঝতে পারেন যে সময়সীমার মধ্যে বক্তব্য থাকবে কিনা। সেই অনুযায়ী তিনি বক্তাকে স্ক্রিপ্ট ছোট বা বড় করার পরামর্শ দিতে পারেন।

(৪) বক্তা নিজের কথা লিখে আনবেন, এমন নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট তাঁর পথপ্রদর্শক।

(৫) বক্তব্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জমা করা থাকে। সেটা আবার শোনা যায় ঠিকই কিন্তু তুলনামূলকভাবে লিখিত স্ক্রিপ্ট একটা স্থায়ী রূপ দেয় কথিকাকে।

বেতার স্ক্রিপ্টের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবেই যা ছাপা মাধ্যমের স্ক্রিপ্ট থেকে একেবারেই আলাদা। যে কোনও ক্ষেত্রের মতই এখানে প্রথমে ঠিক করে নিতে হবে যে ঠিক কী বলতে চান বক্তা, কেমন ছাপ রাখতে চান শ্রোতার মনে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তা লিখছেন তা একশো শতাংশ সফল হবে এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু চোখের সামনে বিষয়ের একটা রূপরেখা থাকলে কথা বলতে সুবিধা হয়। এই যাবতীয় লেখালেখি শ্রোতাকে মনে রেখে করা দরকার। মনশ্চক্ষে যেন শ্রোতাকে দেখে নিতে পারেন কথক—তিনি হতে পারেন একজন ব্যবসায়ী, একজন স্কুলের ছাত্রী, গৃহবধূ, প্রবীণ ভদ্রলোক ইত্যাদি। এটা একবার করে নিতে পারলে শ্রোতার সমস্তরে থেকে তাঁকে কিছু বলা যায়। নিজেকে পণ্ডিত ভেবে নিয়ে শ্রোতাকে জ্ঞানদান করা বা উচ্চ স্তরের সদস্য ভেবে তাঁর কাছে কুণ্ঠিতভাবে নিজের তথ্য নিবেদন করা থেকে মুক্ত হতে পারেন বক্তা। এই 'দর্শন' করা সম্ভব হলে সঠিক শব্দের চয়নও সম্ভব হয়। বোঝানো যাবে কিনা এই ভয়ে বক্তা অযথা কঠিন শব্দ ব্যবহার করে বসেন। যে শব্দ ছাপা মাধ্যমে মানায় তা বেতারের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে। উপযুক্ত চলিত শব্দ ব্যবহার করলে বিষয় বোঝাতে কোনও সমস্যা থাকে না। শ্রোতা যেন বুঝতে পারেন তেমন লক্ষ্য নিয়ে এগোনো উচিত, নিজের পাণ্ডিত্য দিয়ে তাঁকে মোহিত করে দেওয়া যেন বক্তার উদ্দেশ্য না হয়।

বেতারের স্ক্রিপ্ট লেখার ক্ষেত্রে আর একটা বিষয় মনে রাখা খুব দরকার। যদিও এটা গণমাধ্যম, যদিও সম্প্রচার পৌঁছয় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তবু শ্রোতাকে মনে করতে হবে একজন ব্যক্তি হিসাবে। এই বেতার অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। 'যাঁরা এই অনুষ্ঠান শুনছেন', এটা বলার থেকে 'এই যে আপনি আমার কথা শুনছেন' বলাটা বেতারে অনেক আকর্ষণীয়। এতে শ্রোতা এবং কথকের মধ্যে সরাসরি অন্তরঙ্গ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

ছোট্ট বেতার গ্রাহক যন্ত্রটা খুব সহজেই সুইচ অফ করে দিতে পারেন শ্রোতা, সরে যেতে পারেন অ্যাপ থেকে যদি বক্তার বলার ধরণটা তাঁর পছন্দ না হয়। তাই শুরু থেকেই সতর্ক হতে হয় পরিবেশন সম্পর্কে। বেতার স্ক্রিপ্টের কিছু অলিখিত নিয়ম আছে যার মধ্যে একটা হল বাক্যের ব্যবহার সম্পর্কে। সেখানে বলা হয়— স্ক্রিপ্টের প্রথম বাক্য যেন আকর্ষণ করে শ্রোতাকে আর দ্বিতীয় বাক্য যেন তাঁকে অবহিত করে তথ্য দিয়ে। কিন্তু এখানেই তো করণীয় বিষয়ের তালিকা শেষ হয়ে গেল না! একটা বিষয় থেকে আর একটা বিষয়ে যাওয়ার সময় বক্তাকে কিছু নির্দেশক (signpost) রেখে যেতে হবে। তিনি হয়ত বলতে পারেন, 'এবার দেখা যাক এই বিষয়টাকে কীভাবে আরও স্পষ্ট করে তোলা যায়' বা 'পরবর্তী বিষয়টা একটু ভিন্ন, সেখানে জড়িত রয়েছে অর্থনীতি'। এভাবে বললে শ্রোতার পক্ষে বিষয়ের পরিবেশন বুঝতে অসুবিধা হয় না। অন্যথায় তিনি হারিয়ে ফেলতে পারেন বক্তার বিষয়-বিস্তারের পথটা।

বেতারের স্ক্রিপ্টের সাফল্যের আর একটা সূত্র হল, লিখতে-লিখতে পাঠ করা। লিখিত লিপিকে কথায় রূপান্তরিত করলে বক্তা বুঝতে পারবেন যে তাঁর বক্তব্য চলিত ভাষায় হচ্ছে কিনা। এই উচ্চারণে তিনি বুঝতে পারবেন যে বাক্যকে ছোট করে নেওয়ার অবকাশ কোথায়-কোথায় আছে, দুটো শব্দকে জুড়ে একটায় রূপান্তরিত করার সুযোগ আছে কোন পঙক্তিতে। একজন সম্প্রচারকারীকে (broad-caster) অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করতে হয় এই বোধ। নিজের লেখা পাঠ করে নিলে তিনি এমন সব জায়গা আবিষ্কার করবেন যেখানে চেনা শব্দের সজ্জার মধ্যে অবাঞ্ছিত কিছু অর্থ লুকিয়ে রয়েছে। যা বলতে চান না বক্তা তাও কিন্তু তৈরি হয়ে যেতে পারে তাঁর কলম চালনায়। পাঠ করার সময় শব্দের পুনর্বিন্যাস করে নিতে পারবেন তিনি,

একইসঙ্গে বাদ দিতে পারবেন জটিল উচ্চারণের শব্দগুলোকে। নিজের প্রকাশের ইচ্ছে অনুযায়ী যতিচিহ্ন বসানোও সম্ভব হবে তাঁর পক্ষে।

৩.৪.৪ বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য স্ক্রিপ্ট

এই কথাগুলো মনে রেখে বেতারের বিশেষ বিশেষ পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট লেখার নিয়মগুলো আলোচনা করা যেতে পারে।

ক) নিউজ বুলেটিন : বেতারের অন্য যে কোনও অনুষ্ঠানের মতই সংবাদ শোনার সময় শ্রোতা পিছনে ফিরে যেতে পারবেন না। আগে সম্প্রচার হয়ে যাওয়া কথাগুলো দ্বিতীয়বার শোনার সুযোগ থাকে না তাঁর। তাই বক্তব্য প্রকাশে আড়ষ্টতা বা দীর্ঘায়িত করার প্রবণতা বাঞ্ছনীয় নয়। বাক্য হতে হবে ছোট, সরল। প্রকাশের ভঙ্গী হবে আবিলতা মুক্ত। যতটা সম্ভব বর্তমান কালে কথা বলতে হবে। এক মিনিটে কতগুলো শব্দ পড়া যায় তার আন্দাজ থাকাও দরকার। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এক মিনিটে মোটামুটিভাবে ১২০ থেকে ১২৫টা শব্দ পাঠ করা যায়। সেভাবে একটা পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিটের সংবাদ বুলেটিনের স্ক্রিপ্ট তৈরি করা দরকার। সংবাদের স্ক্রিপ্ট সাধারণভাবে অন্যান্য রচনার অভিমুখের উল্টো দিকে যায়। যে কোনও প্রবন্ধে প্রথমে আসে ভূমিকা, তারপর বিষয়ের বিস্তার এবং সবশেষে সিদ্ধান্ত। সংবাদের ক্ষেত্রে প্রথমেই (lead) আসবে শেষ অংশটা অর্থাৎ নির্যাস যা সিদ্ধান্তের সমতুল। এরপর অন্যান্য অংশ আসবে একে একে, হ্রাসমান গুরুত্বের ক্রমে। সংবাদ সংস্থা বা নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো সংবাদ বারবার পড়ে আবিষ্কার করতে হবে যে এই লীড ঠিক কোনটা। এরপর বাকি অংশ লিখে ফেলা কঠিন হবে না। সংবাদের সঙ্গে জুড়ে থাকা কিছু অংশ যা আবশ্যিক নয় তা রাখতে হবে শেষে যাতে সময়ে টান পড়লে সেগুলো বাদ দেওয়া যায়।

খ) ডকুমেন্টারি/ফিচার : কোনও একটা বিষয়ের খুঁটিনাটি তুলে আনে বেতারের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান। ফিচারে বিস্তারের সুযোগ অনেক বেশি। সঙ্গীত, শব্দানুষঙ্গ (sound effects), সংলাপ ইত্যাদি ব্যবহার করে পরিবেশনকে অনেক বেশি আবেদনময় করে তোলার সুযোগ থাকে এখানে। তার জন্য অবশ্যই ভালো একটা স্ক্রিপ্ট দরকার। ধীরে-ধীরে বিষয়টা বিকশিত হবে সেখানে, বজায় থাকবে প্রকাশের সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলা। উপযুক্ত জায়গায় স্থাপিত হবে সাক্ষাৎকার এবং সংলাপ। স্ক্রিপ্টে ভাষ্যের পাশে উল্লিখিত হবে যে সঙ্গীত বা শব্দানুষঙ্গ কোথায় ব্যবহৃত হবে। এই যাবতীয় কাজের জন্য লেখককে বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে, প্রয়োজনে ঘুরে আসত হবে সংশ্লিষ্ট স্থান। বিষয় সম্পর্কে একটা অনুভব গড়ে উঠলে লেখা গতি পায়, ঝরঝরে হয়।

গ) বেতার নাটক : এখানেও বেতার স্ক্রিপ্টের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখা দরকার। সংলাপ অযথা দীর্ঘ যেন না হয়। সংলাপের মধ্যে দিয়ে যেন একটা দৃশ্যপট, চরিত্রের আদল ফুটে ওঠে শ্রোতার মনে। সঙ্গীত ও শব্দানুষঙ্গ ঠিক জায়গায় ব্যবত হতে পারবে স্ক্রিপ্টে উল্লেখ থাকলে। অনেক সময় নাট্যকারের পাঠানো স্ক্রিপ্টকে সংশোধন করে, উপযুক্ত উপাদানের সমাবেশ করে প্রযোজককে আদর্শ স্ক্রিপ্ট তৈরি করে নিতে হয়।

৩.৪.৫ বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানের জন্য স্ক্রিপ্ট

বেতারে বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানের অবকাশ থাকে। বিজ্ঞাপনদাতা কয়েক সেকেণ্ড বা দু'এক মিনিটের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সেই সময়টুকু বেতার কেন্দ্রের দেওয়া দর (Rate Chart) অনুযায়ী কিনে নিতে পারেন তিনি। অর্থ এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার পর বাকি থাকে স্বল্প সময়ের বেতার অনুষ্ঠান (Audio capsule) তৈরি করা। এর জন্য প্রথমেই দরকার একটা স্ক্রিপ্ট (radio copy). দক্ষ লেখক ছাড়া এই স্বল্প সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব করে তুলতে পারবেন না। সাধারণভাবে দেখা যায় যে কোনও অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত পেশাদার এই লেখার কাজটা করেন। এর পর সেই লেখাকে রূপ দেয় বিশেষজ্ঞ প্রোডাকশন হাউজ। বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠান পৌঁছয় সিডি-তে মাইক্রোচিপ বা ইমেল মারফৎ। তবে প্রযোজকদের এমন অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব নিতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় মনে রাখতে হবে।

১) যে শ্রোতাগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছনো দরকার (target audience)—কাদের জন্য এই অনুষ্ঠান?

২) সংশ্লিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা—এগুলোর কোন বিশিষ্টতা তুলে ধরতে চাওয়া হচ্ছে?

৩) লিখিত ভাষ্য (script)—কেমন বিষয়বস্তু (content) এবং শৈলী (style) উপযুক্ত হবে?

৪) ব্যবহৃত কণ্ঠ—কেমন কণ্ঠে শৈলী ফুটে উঠবে ঠিকঠাক?

৫) আবহ—সঙ্গীত (music) বা শব্দানুষঙ্গ (sound effects), কোনটা আবহ হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন?

প্রত্যেক বেতার কেন্দ্রের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে যা মেনে তবে বিজ্ঞাপনের ভাষ্য তৈরি করতে হয়। আকাশবাণীর ক্ষেত্রে একটা আচরণীয় কোড রয়েছে (AIR Code) এছাড়াও বিজ্ঞাপনের জন্য আলাদা করে কিছু নিয়মবিধি আছে যা পালনীয়। এগুলো সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে প্রযোজককে। আকাশবাণী এবং দূরদর্শন যে বিধিবদ্ধ সংস্থার অধীনে সেই প্রসার ভারতী কিছু নিয়ম তৈরি করেছে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের জন্য। সেখানে বলা আছে যে বিজ্ঞাপনদাতাদের দেশের কিছু প্রয়োজনীয় আইনের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। এই তালিকার মধ্যে রয়েছে ১৯৪০ সালের ড্রাগস অ্যাণ্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট, ১৯৫৭ সালের কপিরাইট অ্যাক্ট, ১৯৫৪ সালের প্রিভেনশন অফ ফুড অ্যাডাল্টারেশন অ্যাক্ট, ১৯৮৬ সালের কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট প্রভৃতি। এছাড়াও বিজ্ঞাপন শিল্পে সাধারণভাবে অনুসরণীয় কিছু বিধি যেমন বম্বের অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া প্রকাশিত আচরণবিধি মেনে চলা দরকার। কতগুলো নিয়ম প্রসার ভারতী নিজেও নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে সেই সব শর্ত যা লঙ্ঘন করলে বিজ্ঞাপন অনুমোদন করা হবে না। শর্তগুলো নিষেধমূলক এবং সেগুলো এইরকম :

— জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশীয় পরিচিতি এবং ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি বা অন্য কোনও ধারার প্রতি বিদ্বেষমূলক মন্তব্য।

— জনসাধারণকে আইনভঙ্গ করতে উস্কানি দেওয়া অথবা আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং অশ্লীলতা গৌরবান্বিত করা।

— অপরাধকে বাঞ্ছনীয় হিসাবে উপস্থিত করা।

— বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে খারাপভাবে প্রভাবিত করা।

— জাতীয় প্রতীক, সংবিধানের যে কোনও অংশের অপপ্রয়োগ, জাতীয় নেতা বা সম্মানিত কোনও ব্যক্তির মানহানি করা।

— সিগারেট, মদ বা অন্য কোনও নেশার দ্রব্যকে বিজ্ঞাপিত করা।

উপরে বলা যে কোনও একটা কাজ করলে বিজ্ঞাপন অনুমোদন করবে না প্রসার ভারতী। এই সব নিয়ম ও শর্ত মেনে স্ক্রিপ্টকে রূপ দিতে হবে কপিরাইটারকে। তাঁর প্রথম বাক্যেই যেন আগ্রহ সৃষ্টি হয় শ্রোতার মনে, পণ্য বা পরিষেবার প্রতি মনযোগ আকৃষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনে সময় কম আর তাই অহেতুক শব্দ ব্যবহার করে স্ক্রিপ্টের আবেদন নষ্ট করা যাবে না। যদিও বেতার শব্দ মাধ্যম তবু স্ক্রিপ্টের লক্ষ্য হবে বিষয়বস্তুকে শ্রোতার সামনে 'দৃশ্যমান' করে তোলা। বিজ্ঞাপন সম্প্রচার হয়ে যাওয়ার পরেও যেন শ্রোতার মনে একটা রেশ থেকে যায় বিজ্ঞাপনের বার্তা সম্পর্কে তা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য চলিত ভাষায় কিছু দৃশ্যকল্প তৈরি করে দিতে হবে।

৩.৪.৬ কণ্ঠের ব্যবহার (Voice Designing)

ঘোষক-ঘোষিকা বা উপস্থাপক-উপস্থাপিকা বেতার কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রোতাদের কাছে। প্রতিষ্ঠান এবং শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে তাঁরাই সেতুবন্ধনের কাজ করেন। প্রতিষ্ঠান থাকে আড়ালে, শ্রোতারা ঘোষকের কণ্ঠের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যান, তাঁকেই প্রতিষ্ঠানের মুখ বলে গ্রহণ করেন। সুণ্ঠের অধিকারী ঘোষক বা উপস্থাপক জনপ্রিয় হয়ে যান অচিরেই। এটা ধরে নেওয়া হয় যে ঘোষক তাঁর নির্ধারিত অধিবেশনের সব অনুষ্ঠান সম্পর্ক জানবেন এবং উপযুক্ত ঘোষণায় সেগুলো করাবেন শ্রোতাদের কাছে। এই শ্রোতারা কোনও একটা নির্দিষ্টি বয়সের, সামাজিক বা অর্থনৈতিক শ্রেণীর নন। বৈচিত্র্য রয়েছে তাঁদের পরিচিতির মধ্যে। সময়ের সঙ্গে নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বদল এসেছে তাঁদের মানসিকতায়। এই সবকিছুর আন্দাজ রেখে ঘোষককে নিজের উপস্থাপন তৈরি করতে হবে। প্রত্যেকের আগ্রহ মেটানো সহজ কাজ নয় ঠিকই কিন্তু নিজের কণ্ঠকে উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করতে পারেন যে ঘোষক, যিনি বেতারের বৈশিষ্ট্য মেনে আন্তরিক হয়ে উঠতে পারেন অদেখা শ্রোতার সঙ্গে, তিনি সহজেই সাফল্য পান নিজের কাজে। তাঁর অনুষ্ঠান শ্রোতাকে বেঁধে রাখে গোটা অধিবেশনের জন্য। সুকণ্ঠ অবশ্যই তাঁর কাজের একটা বাঞ্ছিত উপাদান কিন্তু সুনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান অনুযায়ী তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু প্রত্যাশা থাকে।

ক) সংবাদ পাঠক (News Reader) : সম্প্রচারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সংবাদ। সংবাদ পাঠক সংবাদ বিভাগের সম্পাদক (News Editor) এবং তাঁর অধীনে থাকা অন্যান্যদের তৈরি করে দেওয়া স্ক্রিপ্ট পাঠ করেন। কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁকে নিজেই স্ক্রিপ্ট তৈরি করে নিতে হয়। পাঠ করার সময় পাঠকের কণ্ঠের প্রয়োগ সংবাদকে আকর্ষণীয় বা নেহাৎই মামুলি করে তুলতে পারে। তাঁর কণ্ঠের আবেদন থাকতে হবে, সেটা যেন অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ বা ভাঙা-ভাঙা না হয়। উপযুক্ত উচ্চারণে, সঠিক গতিতে, প্রয়োজনীয় জায়গায় থেমে এবং কণ্ঠের বাঞ্ছিত তীক্ষ্ণতা রক্ষা করে সংবাদ পাঠ করতে যেন সমর্থ থাকেন তিনি। পড়ার সময় যেন আত্মবিশ্বাস ধ্বনিত হয় প্রত্যেকটা বাক্যে এবং সেটা তখনই সম্ভব যখন তাঁর পরিচয় থাকে প্রত্যেকটা শব্দের

সঙ্গে। আগেভাগে স্ক্রিপ্ট পড়ে নিলে তবেই এই লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার অভ্যাস এই আত্মবিশ্বাস তৈরিতে সাহায্য করে। হঠাৎ করে কোনও অপ্রত্যাশিত সংবাদ এসে পড়লে তাঁর পাঠকে সুস্থিত রাখতে সাহায্য করবে এই জ্ঞান। এখানে আরও একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার—অন্যান্য অনুষ্ঠানের উপস্থাপনের সঙ্গে সংবাদ পাঠের মূল পার্থক্য হল, সংবাদ পড়া হয় আবেগ বর্জন করে নির্মোহ ভঙ্গীতে, বিষয় অনুযায়ী প্রাবল্য এবং গতির ওঠানামা করে (objective style).

খ) ঘোষক (Announcer) : একটা গোটা অধিবেশনে ঘোষক বা ঘোষিকাকে নানা ধরণের অনুষ্ঠান শোনাতে হয় শ্রোতাদের। যদি অনুষ্ঠান হয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তাহলে শিল্পী, সঙ্গীতকারের নাম বলার পাশাপাশি রাগ ও তালের উল্লেখ করতে হবে ঘোষককে। লঘু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘোষণার সময় ঘোষিকা ভজনের প্রথম পঙক্তিটা উল্লেখ করতে পারেন আকর্ষণ তৈরি করার জন্য। এই কাজটা করার সময় তাঁর পরিবেশন যেন প্রাণবন্ত থাকে। শুধুমাত্র গলার গাম্ভীর্য বা মিহি ভাব এই আকর্ষণ তৈরি করতে পারবে না। প্রাণ সঞ্চার হবে সঠিক শৈলীতে। তেমনি নাটকের ঘোষণার সময় নাটকের, নাট্যকারের, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের, আবহসঙ্গীত সৃষ্টিকারের, পরিচালকের নাম বলাটা ঘোষকের প্রাথমিক কর্তব্য। এটা করার সময় তিনি কণ্ঠের ওঠানামায় আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারেন শ্রোতার মনে। মামুলিভাবে পড়ে গেলে একটা ভালো নাটকও উপযুক্ত আদর পাবে না শ্রোতার কাছ থেকে। নাটকের নাম উচ্চারণের মধ্যেও নিজস্বতার ছাপ রাখতে পারেন ঘোষক-ঘোষিকা। বস্তুতপক্ষে রেকর্ড করা অনুষ্ঠান এমনভাবে পরিবেশন করা সম্ভব যাতে তা সরাসরি সম্প্রচার বলে মনে হয়।

গ) উপস্থাপক (Compere) : ঘোষকের থেকে ভিন্নতর দায়িত্ব পালন করতে হয় উপস্থাপককে। এদের কাজের মধ্যে কিছু বিভাজন আছে। উপযুক্ত বাংলা শব্দের অভাবে বিভাজনগুলো ইংরেজিতেই দেওয়া যাক—ডিস্ক জকি বা রেডিও জকি, বিশেষ শ্রোতাগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানের (Special Audience Programme) কম্পিয়ার এবং মাস্টার অফ সেরিমনি। ডিস্ক জকি, এই পরিভাষার চল এখন আর নেই বেতারে। এটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে ডিস্কো থেক বা বিভিন্ন বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে। বেতারে রেডিও জকি শব্দটা এখন বেশী প্রচলিত। এফ এম প্রচারতরঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠানের সম্প্রচার বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও জকি বা আর জে কথাটা চেনা হয়ে গেছে সবার কাছে। পছন্দের গান শোনানোর পাশাপাশি আর জে কথা বলেন এমনভাবে যাতে তরুণ শ্রোতারা আকৃষ্ট হয়। সেই কথার মধ্যে থাকে মজাদার কাহিনীর উল্লেখ (interesting anecdotes), একই অক্ষর দিয়ে শুরু বা শেষ হওয়া শব্দের পরপর উচ্চারণ (punning), গানের কথা (lyrics) নিয়ে খেলা ইত্যাদি। আর জে ততক্ষণই জনপ্রিয় যতক্ষণ তিনি প্রাণবন্তভাবে কথা বলতে পারেন, ফোন-ইন অনুষ্ঠানে শ্রোতার সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে পারেন এবং গান সহ যাবতীয় উপাদান বাজাতে পারেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। তাঁর কথা বলা যেন একটানা এবং একঘেয়ে না হয়, কণ্ঠের ওঠানামা (modulation) যেন বন্ধ না হয়। অন্যদিকে, বিশেষ শ্রোতাগোষ্ঠী যেমন মহিলা, শিশু, শ্রমিক, কৃষক, সেনাবাহিনীর সদস্য প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠানে যিনি কম্পিয়ার থাকবেন তাঁকে রেকর্ড করা নানা অনুষ্ঠান বাজাতে হয় যার মধ্যে কথাপ্রধান (Spoken Word) অনুষ্ঠানই বেশি থাকে। এছাড়াও মনোরঞ্জনের জন্য গান বাজাতে হয় তাঁকে। কারা সেই বিশেষ শ্রোতা তা মনে রেখে কণ্ঠের আবেদন পরিবর্তন করতে হয় কম্পিয়ারকে। মাস্টার অফ সেরিমনি তাঁকেই বলা হয় যিনি আমন্ত্রিত দর্শকদের সামনে

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার হয় বা রেকর্ড করে পরে বাজানো হয়। অনুষ্ঠান চলাকালীন মাস্টার অফ সেরিমনির বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশন, মজাদার কথাবার্তা আমোদিত করে দর্শকদের। উপরে বর্ণিত পরিস্থিতি ছাড়াও বেতারের অনুষ্ঠানের আরও কিছু ক্ষেত্রে কণ্ঠের ব্যবহার নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে। এর মধ্যে অন্যতম হল বেতার নাটকে অভিনয়। আকাশবাণীতে নাটকে অংশগ্রহণের জন্য অডিশন দিতে হয়। কণ্ঠ এবং বাচনভঙ্গী শুনে প্রার্থীকে সফল বা অসফল বলে ঘোষণা করেন বিচারকরা। পরবর্তী সময়ে সফল প্রার্থী আবার অডিশনের মাধ্যমে নিজের গ্রেড উন্নত করাতে পারেন। বেতার নাটকের ক্ষেত্রে সবাই যে কেন্দ্রীয় চরিত্রে বা নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন এমন নয়। পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। সেই অনুযায়ী প্রযোজক অডিশনের সময় বেছে নেন উপযুক্ত কণ্ঠ। সেখানে ঝকঝকে, স্মার্ট অথবা রাশভারী কণ্ঠ যেমন থাকে তেমনি থাকে বিশেষ চরিত্রের জন্য প্রযোজ্য মিহি বা কিছুটা নাকি কণ্ঠ। বেতার নাটক প্রযোজনার সময় প্রযোজকের নির্দেশ অনুযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রীকে নিজের কণ্ঠ প্রয়োগ করতে হয়। যেভাবে স্ক্রিপ্টে চরিত্রের বর্ণনা আছে তেমন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে হয় কণ্ঠের ব্যবহারে।

৩.৪.৭ ঘোষক, উপস্থাপকের কাঙ্খিত গুণাবলী

ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজন বা পরিস্থিতি অনুযায়ী ঘোষক বা উপস্থাপককে কীভাবে কণ্ঠের প্রয়োগ করতে হবে, কেমন পরিবেশনে উদ্যোগী হতে হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এবার সাধারণভাবে ঘোষক বা উপস্থাপকের প্রত্যাশিত গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এই সব গুণ কণ্ঠের সঙ্গে সম্পর্কিত। বেতারে কর্মরত ঘোষক বা উপস্থাপকের পরিবেশন বেতারমাফিক (radiogenic) হওয়া দরকার। যেন মনে হয়, খুব কাছের কেউ, একেবারে পাশের বাড়ির সদস্য এসে কথা বলছেন অথচ সেই বাক্যালাপের মধ্যে নেই কোনও আড়ষ্টতা। ঝরঝরে উচ্চারণে, প্রাণবন্ত ভাষণে তিনি মোহিত করে রাখেন শ্রোতাকে। নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে বিরাট কোনও ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করবেন না ঘোষক। তাঁর কথা বলা হবে বন্ধুত্বপূর্ণ, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত। এমন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে নিম্নলিখিত গুণ দরকার :

১। নিয়ন্ত্রিত স্বরক্ষেপ (Well Modulated Voice)

২। উপযুক্ত উচ্চারণ এবং পরিবেশন (Enunciation—Flow and Pronunciation)

৩। নানা বিষয় সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান

৪। যে কোনও উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা (Alertness)

৫। মাইক্রোফোন সম্পর্কিত আচরণবিধি মানা (Microphone Manners)

৬। বেতার সম্প্রচারের প্রতি ভালোবাসা

এই বিষয়গুলোর কিছুটা বিস্তার দরকার :

১) নিয়ন্ত্রিত স্বরক্ষেপ : প্রত্যেকেই জন্মসূত্রে একটি নির্দিষ্ট ধরনের কণ্ঠের অধিকারী হন। সেটাকে প্রশিক্ষণের সাহায্যে, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেতার সম্প্রচারের উপযোগী করে তোলা যায়। ঘোষক বা উপস্থাপককে নানা বিষয় আয়ত্ত করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে উপযুক্ত শব্দ বা বাক্যাংশ চয়নের সক্ষমতা (diction), শ্রুতিসুখকর তীক্ষ্ণতা (pitch), প্রয়োজনীয় জায়গায় বিরতি দেওয়র জ্ঞান (Pause), কাঙ্খিত স্থানে

জোর দেওয়ার বোধ (stress), কণ্ঠের ওঠানামা (modulation) এবং ছন্দবোধ (rhythm). কণ্ঠের তীক্ষ্ণতা সুস্থিত হওয়া দরকার। হারমোনিয়ামের সুরসপ্তক (সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি) ব্যবহার করে নিজের কণ্ঠের স্বাচ্ছন্দ্য নির্ধারণ করতে হবে। যে তীক্ষ্ণতা নিজের বলে মনে হয় সেই তীক্ষ্ণতায় স্ক্রিপ্ট ও খবরের কাগজের প্রতিবেদন জোরে-জোরে পড়তে হবে। এতে কণ্ঠের ওঠানামা সহজ এবং শ্রুতিসুখকর হবে। মান রক্ষা করার জন্য কণ্ঠের বিশ্রাম প্রয়োজন এবং অহেতুক চীৎকার থেকে স্বরতন্ত্রীকে বাঁচানো দরকার। ভাঙা বা কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠ শ্রোতার কাছে আদরণীয় নয়। কণ্ঠের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে ইষদুষ্ণ জলে গলার ভেতরকে স্নাত করা (gargling) এক সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি। এটা অনেকেই নিয়মিতভাবে করে থাকেন। কথা বলার সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক ছন্দও রক্ষা করা দরকার। শ্বাস নেওয়ার সময় তার অভিঘাত যেন ফুসফুস এবং পৌষ্টিক অঞ্চলের মাঝে অবস্থিত মধ্যচ্ছদা (diaphragm) অবধি পৌঁছয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এতে পরিবেশনের গতি ও লয়ে একটা সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিকতা আসে। কোথাও দমের ঘাটতিতে উচ্চারিত বাক্যে ত্রুটি শোনা যায় না। এই ব্যাপারটা আয়ত্ত করতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কিছু ব্যায়াম করার পরামর্শ দেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

২) উপযুক্ত উচ্চারণ এবং পরিবেশন : স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সঠিক উচ্চারণ, মাত্রা সম্পর্কে বোধ, সন্ধিযুক্ত ও সমাসবদ্ধ শব্দের উচ্চারণে সাবধানতা একজন ঘোষককে যেমন আলাদা পরিচিতি দেয় তেমনি সংশ্লিষ্ট বেতার কেন্দ্রের মানকেও উন্নত করে। শব্দের উচ্চারণ অতি দ্রুত বা খুব ধীরে করতে গেলে শ্রোতার কাছে বাঞ্ছিত বার্তা পৌঁছয় না। একটা স্বাস্থ্যকর গতি বজায় রাখা দরকার। বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রোতার স্মৃতি ধারণের ও বোঝার ক্ষমতা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা জরুরি। একটা ঘোষণা দেওয়ার সময় বা লিখিত স্ক্রিপ্ট পাঠ করার সময় উপযুক্ত জায়গায় জোর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বদলে যেখানে-সেখানে চাপ পড়লে ভুল বার্তা যায় শ্রোতার কাছে। এটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে সংশ্লিষ্ট ভাষা সম্পর্কে ঘোষকের জ্ঞান গভীর হলে এই ব্যাপারগুলো অনেক সহজ হয়।

৩) নানা বিষয় সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান : রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানান ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে ঘোষক বা উপস্থাপককে। ললিতকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্যে যে নতুন-নতুন ধারার আত্মপ্রকাশ ঘটছে সে সম্পর্কে তাঁর অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু বেতারে সঙ্গীত জুড়ে থাক সম্প্রচারের সিংহভাগ তাই রাগ, তাল, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান যদি ঘোষকের থাকে তবে তা হবে উপরি পাওনা। এর জন্য নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পাঠ, উপযুক্ত বই সংগ্রহ করে পড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রচার শোনা, টেলিভিশনে দৃষ্টি রাখা, নানা ধরনের চলচ্চিত্র ও মঞ্চনাটকের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। এভাবে ঘোষক যে জ্ঞান আহরণ করবেন তা শুধু মস্তিষ্কের কোষে সঞ্চিত হয়ে থাকবে না, স্বরক্ষেপণের সময়ও তা প্রতিফলিত হবে। এভাবেই গঠিত হবে ঘোষকের ব্যক্তিত্ব যা শ্রোতার মনে আবেদন রাখবে, জনপ্রিয় করবে সম্প্রচারককে।

৪) যে কোনও উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা : সাধারণভাবে বেতারের সম্প্রচার পূর্বনির্ধারিত সূচী অনুযায়ী চললেও মাঝে-মাঝে এমন অবস্থা উদ্ভূত হয় যখন ঘোষককে নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। ধরা যাক স্টুডিওতে কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছল এবং বেতার কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গোটা অনুষ্ঠানসূচীতে বদল আনার দরকার দেখা দিল। এই সময়ে ঘোষককে তাঁর কণ্ঠের মাপা পরিবর্তনে এমনভাবে ঘোষণা রাখতে হবে যাতে শ্রোতা পরিস্থিতির গাম্ভীর্য অনুধাবন করতে

পারেন, মনে-মনে সায় দিতে পারেন অনুষ্ঠানসূচীর পরিবর্তনে। সঙ্গীত শোনানোর ক্ষেত্রেও হঠাৎ পরিবর্তন করতে পারে নির্ধারিত অনুষ্ঠানে। পরিবর্তন হতে পারে শিল্পীর বা হয়ত রাগের। সরাসরি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন কঠিন চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করে ঘোষকের সামনে। তখন নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এমন ঘোষণা করতে হয় ঘোষককে যা পরিবর্তনকেও স্বাভাবিক এবং গ্রহণীয় করে তুলতে পারে।

৫) মাইক্রোফোন সম্পর্কিত আচরণবিধি মানা : বেতারে ব্যবহৃত মাইক্রোফোন অত্যন্ত সুসংবেদী হয়ে থাক। ঘোষকের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত যে কোনও শব্দ তাতে ধরা পড়ে এবং সহযোগী যন্ত্রে বিবর্ধিত হয়ে শ্রোতার কাছে পৌঁছে যায়। কণ্ঠের ত্রুটি, হাঁপিয়ে ওঠা ইত্যাদিও ধরা পড়ে যায় মাইক্রোফোনে। তাই এই যন্ত্রের সামনে সোজা হয়ে বসে শ্বাস নিতে হবে শরীরের মধ্যচ্ছদা অবধি বিস্তারে এবং মাইক্রোফোনেও সরাসরি কথা বলতে হবে উপযুক্ত দূরত্ব রক্ষা করে। অনেক ঘোষক ভুল করে মাইক্রোফোনের সঙ্গে ঠোঁট প্রায় লাগিয়ে কথা বলেন। এতে শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ প্রবেশ করে মাইক্রোফোনে এবং প্রায়শই উচ্চারিত শব্দে অস্পষ্টতা শোনা যায়। ঘোষককে খেয়াল রাখতে হবে যাতে মাইক্রোফোনের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা কাগজের মধ্যে ঘষাঘষিতে অবাঞ্ছিত শব্দের সৃষ্টি না হয়। কাগজের গুচ্ছ স্টেপল না করে আলাদা রাখতে হবে কারণ একসঙ্গে আটকে রাখা কাগজের পাতা ওল্টাতে গেলে খসখস শব্দ তৈরি হতে পারে।

৬) বেতার সম্প্রচারের প্রতি ভালোবাসা : ঘোষণার ব্যাপারটাকে নেহাৎ একটা কাজ বলে মনে করলে ঘোষক প্রতিদিনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন না। ঘোষণাকে ভালোবাসার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করলে তবেই সাফল্য পেতে পারেন তিনি। অনুষ্ঠানের বিবিধ ফরম্যাট বুঝে সেই অনুযায়ী নিজের পরিবেশনে পরিবর্তন করতে হবে তাঁকে। এর জন্য ভালোবেসে এই সব অনুষ্ঠানের প্রতি মনযোগী হওয়া দরকার তাঁর। এই ভালোবাসা থেকেই জন্ম নেবে তাঁর বিশিষ্ট শৈলী বা স্টাইল যা তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দেবে।

৩.৪.৮ সারাংশ

বেতার উপযোগী ভাষা ব্যবহার করে স্ক্রিপ্ট লিখলে তা অনুষ্ঠান তৈরিতে সাহায্য করে। ফরম্যাট বুঝে স্ক্রিপ্টের ধরন পরিবর্তনের দরকার হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এমন স্ক্রিপ্ট পাঠ করেন ঘোষক বা উপস্থাপক। অনেক অনুষ্ঠানে সেটাই সংযোজক ভাষ্য (linking narration)। কণ্ঠের ওঠানামায় পাঠকে সজীব করা যায়, প্রযোজকের ভাবনা অনুযায়ী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায় শ্রোতার কাছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া স্ক্রিপ্ট লেখা এবং সেটার প্রকৃত পাঠ সম্ভব নয়। বেতার কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করতে হয় ঘোষককে। তাই স্বরক্ষেপণে তাঁর সাফল্য সম্প্রচারকে সফল করে।

৩.৫ টেলিভিশন

৩.৫.১ টেলিভিশন সাংবাদিকতা নিয়ে কিছু কথা

৩.৫.২ টেলিভিশনের জন্য কী কী লিখতে হয়?

৩.৫.৩ টেলিভিশন কপির সময়কাল (Duration)

৩.৫.৪ সংবাদপাঠ কী? (Anchoring)

৩.৫.১ টেলিভিশন সাংবাদিকতা নিয়ে কিছু কথা

১. সংখ্যা নয় শব্দের ব্যবহার

টেলিভিশনের জন্য সহজ ও সরল ভাষার প্রয়োগ কেন জরুরি তা আমরা প্রস্তাবনায় আলোচনা করেছি। এছাড়াও টেলিভিশন সাংবাদিকতার জন যে কপি (Copy) লেখা হয় সেখানে কিছু নিয়ম মানতে হয়। লেখার সময় সংখ্যার ব্যবহার হলে তা অবশ্যই শব্দে লিখতে হয়। যেমন পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৫ ও আহত ৫০। টেলিভিশনের জন্য যখন কপি লেখা হয় তখন এই ৫ ও ৫০ সংখ্যায় নয়, শব্দে লিখতে হবে। অর্থাৎ পথ দুর্ঘটনায় মৃত পাঁচ ও আহত পঞ্চাশ। এই নিয়ম কেন? তা আমরা অঞ্চরিং বিভাগে আলোচনা করব।

২. একই শব্দ বারংবার নয়

টেলিভিশনের জন্য কপি লেখার সময় দেখতে হবে একই শব্দের ব্যবহার যেন বারবার না হয়। উদাহরণ—সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে করোনাকালে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে ভারতবর্ষে বহু ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। এই ছাত্রছাত্রীদের ফের স্কুলমুখী করার জন্য পরিকাঠামোর ওপর জোর দিচ্ছে সরকার।

এখানে লক্ষ্য করতে হবে পরপর দুটি বাক্যেই ছাত্র-ছাত্রী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা একধরনের একঘেঁয়েমি তৈরি করে। এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি—

—সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে করোনাকালে উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে ভারতবর্ষে বহু ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। এই স্কুলছুটদের ফের মূলস্রোতে ফেরানোর জন্য পরিকাঠামোর ওপর জোর দিচ্ছে সরকার।

(উপরোক্ত উদাহরণটি কাল্পনিক। ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে)।

৩. ছবির ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই

আগেই উল্লেখ করেছি টেলিভিশনে ছবি (Visual) একটি শক্তিশালী উপাদান। এটি শব্দ-দৃশ্য মাধ্যম হলেও এখানে ছবিই প্রধান। তাই ছবিতে যা খুব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে তা আবার শব্দের মাধ্যমে প্রকাশের কোনও দরকার নেই।

যেমন—আটচল্লিশ ঘণ্টার টানা বৃষ্টিতে এলাকায় কোথাও হাঁটু বা কোমর সমান জল হয়েছে। ধরা যাক এলাকার বানভাসি পরিস্থিতি বোঝাতে যে ছবি দেখানো হচ্ছে সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এলাকাবাসী হাঁটুজল বা কোমর সমান জল পেরিয়ে যাতায়াত করছেন। এই রকম ক্ষেত্রে হাঁটুজল বা কোমর সমান জল শব্দদুটি অতিরিক্ত। এক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি আটচল্লিশ ঘন্টার টানা বৃষ্টিতে এলাকায় বানভাসি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভোগান্তিতে পড়েছেন এলাকাবাসী।

(উপরোক্ত উদাহরণটি কাল্পনিক। ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।)

৪. উপাধি বা পদমর্যাদার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম

এক্ষেত্রে নিয়মটি সংবাদপত্রের মতই। টেলিভিশনের জন্য যখন আমরা লিখি তখন প্রথম বাক্যেই উপাধি বা পদমর্যাদা উল্লেখ করে থাকে। পরে আমরা উপাধি বা পদমর্যাদার বদলে সেই ব্যক্তির নাম অথবা পদমর্যাদা উল্লেখ করতে পারি।

যেমন—করোনার আবহে উৎসব পালনের সময় দেশবাসীকে সাবধানতা অবলম্বনের কথা মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দোলযাত্রা উপলক্ষে দেশবাসীকে আগাম শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী। এখানে প্রথম বাক্যেই প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদার সঙ্গে তাঁর নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে তাই শুধু পদমর্যাদার উল্লেখ করা হয়েছে।

(উপরোক্ত উদাহরণটি কাল্পনিক। ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।)

৫. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবার আগে

টেলিভিশন সাংবাদিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল চমক তৈরি করা। বিশেষত ভারতীয় ঘরনায় চমক (Sensation) তৈরির নীতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেই কারণে টেলিভিশনের জন্য যখন কপি (COPY) লেখা হয়, তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিকেই প্রথম লেখা হয়। তারপর খবরটির প্রেক্ষাপট ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ছবির ক্ষেত্রেও একই নীতি নেওয়া হয়। ছবির (VISUAL) সবচেয়ে চমকপূর্ণ অংশ আগে দেখানো হয়, বাকি অংশ পরে।

৬. স্পর্শকাতর বিষয়

স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই সংবাদপত্রের মতই নিয়ম মানতে হয়। অর্থাৎ, কোনও ধর্মীর বিবাদ বা জাতিগত মারামারির ক্ষেত্রে বিবাদকারীদের ধর্ম, গোষ্ঠী বা জাতির নাম কখনই উল্লেখ করা যাবে না। এক্ষেত্রে কোনও মৃত্যু হলেও মৃত ব্যক্তি কোন পক্ষের তা কখনই উল্লেখ করা যাবে না। এমনকি

ছবি (VISUAL) দেখানোর ক্ষেত্রে রক্ত বা প্রচণ্ড গুরুতর আহত ব্যক্তি বা নিহত ব্যক্তির বিকৃত দেহ দেখানো যাবে না। বা ছবির (VISUAL) ওই অংশ দেখানো হলেও তা ঝাপসা (Blur) করে দেখাতে হবে। একই নিয়ম কোনও শারীরিক নিগ্রহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ধর্ষিতা বা নিগৃহীতার ছবি বা নাম কোনওভাবেই দেখানো যাবে না। এমনকি তাঁর নিকট আত্মীয়ের ছবি বা নাম, বাড়ির ছবিও দেখানো যাবে না। খবরের কারণে নিগৃহীতার বক্তব্য দেখানোর প্রয়োজন হলে তাঁর মুখ অবশ্যই ঝাপসা করে দেখাতে হবে।

৭. খবরের ভারসাম্য ও বিশ্বাসযোগ্যতা

যেকোন সংবাদ মাধ্যমের জন্য কপি লেখার ক্ষেত্রে এই দুই বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। এক হচ্ছে খবরের ভারসাম্য বজায় রাখা আর অন্যটি হল বিশ্বাসযোগ্যতা। যেকোন কপির ক্ষেত্রেই সেটা রাজনৈতিক, ক্রাইম সম্পর্কিত বা নিছক কোনও ঘটনার খবর হোক না কেন দুইপক্ষের মতামত দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে সেই কপিকে পক্ষপাতদুষ্ট বলা হয়। দর্শকের কাছে তা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। তাই টেলিভিশনের জন্য যখন কপি লেখা হয় তখন দুই পক্ষর বাইট (BITE) ও দুপক্ষের ছবি (VISUAL) দেখানো প্রয়োজন।

৩.৫.২ টেলিভিশনের জন্য কী কী লিখতে হয়?

এই অধ্যায়ে বারবার একটি কথা উল্লেখ করছি যে টেলিভিশনে ছবি (Visual) একটি খুব শক্তিশালী উপাদান। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে টেলিভিশনে লেখার কি কোনও জায়গা নেই? অবশ্যই জায়গা আছে। টেলিভিশনে লেখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা এবার আলোচনা করা যাক।

কোনও খবর যখন টেলিভিশনে প্রথম আসে, অর্থাৎ রিপোর্টারের দেওয়া খবরটি প্রথমে ব্রেকিং নিউজ (Breaking News) বা নিউজ ফ্ল্যাশ (News Flash) আকারে টেলিভিশনের পর্দায় সবচেয়ে তলায় স্ক্রলের (SCROLL) আকারে আসে।

১. ব্রেকিং নিউজ বা নিউজ ফ্ল্যাশ

খুব ছোট ছোট বাক্যের (৩-৪ শব্দ) মাধ্যমে লেখা হয়। এক-একটি বাক্য এক-একটি তথ্য দেয়। যেমন—

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৯, আহত ২২ (প্রথম বাক্য)

গঙ্গারামপুরে বাস উল্টে দুর্ঘটনা (দ্বিতীয় বাক্য)

বরযাত্রী বোঝাই বাস উল্টে দুর্ঘটনা (তৃতীয় বাক্য)

দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরের (চতুর্থ বাক্য)

চালকের অসাবধানতায় দুর্ঘটনা (পঞ্চম বাক্য)

আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে (ষষ্ঠ বাক্য)

দুর্ঘটনাস্থলে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা (সপ্তম বাক্য)

(উপরোক্ত উদাহরণটি কাল্পনিক। ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে)

উপরের উদাহরণটি একটি পথদুর্ঘটনার। প্রথম খবরটি পাওয়ার পর এই ভাবেই টেলিভিশনের পর্দার একদম নীচের দিকে (Lower Third) তথ্যটি ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। লক্ষণীয় প্রতিটি বাক্য এক একটি তথ্য তুলে ধরছে। বাক্যগুলি গঠনগত দিক থেকে খুবই সরল অনেকটা কথ্য ভাষার মত।

ব্রেকিং নিউজ লেখার সময় সাধারণত কোনও সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করা হয় না। আরেকটা দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র ব্রেকিং নিউজ বা নিউজ ফ্ল্যাশ লেখার সময় সংখ্যা লেখা হয়। অর্থাৎ পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৯।

২. ফুল স্ক্রিন ব্রেকিং (Full Screen Breaking)

খবরটি টেলিভিশনের পর্দার নীচে (Lower Third) ব্রেক হওয়ার পর গুরুত্ব বুঝে খবরটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। যদি তখনও ছবি বা ভিসুয়াল না এসে থাকে সেক্ষেত্রে খবরটি ফুল স্ক্রিন ব্রেকিং আকারে দেখানো হয়। অর্থাৎ খবরটি Lower Third থেকে টেলিভিশনের মূল পর্দায় স্থান পায়। কিন্তু আমি আগেই বলেছি টেলিভিশন হল একটি শব্দ-দৃশ্য মাধ্যম। তাহলে যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবরের ছবি না থাকে তাহলে কী করা হয়? সেক্ষেত্রে কি ছবি আসা অবধি অপেক্ষা করতে হবে?

উত্তর হল না। এক্ষেত্রে ছবি আসার আগেই খবরটি ফুল স্ক্রিন ব্রেকিং (Full Screen Breaking) আকারে দেখানো হয় বা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এক্ষেত্রে এই ধরনের ফরম্যাটকে (Format) ড্রাই নিউজ (Dry News) বলা হয়। অর্থাৎ ছবি নেই কিন্তু খবরটি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ছবি না আসা পর্যন্ত তথ্যটি ফুল স্ক্রিন ব্রেকিং এর মাধ্যমে দর্শকদের জানানো হয়। কিন্তু এই ফরম্যাটটি কীভাবে দেখানো হয়?

এক্ষেত্রে প্রধানত টেলিভিশনের পর্দাজুড়ে খববট সম্পর্কে ছোট ছোট বাক্য লেখা। আর সেটা নিয়েই সাংবাদিকের (Reporter) কাছ থেকে আরও তথ্য জানতে চান বা সংবাদ পাঠক বা পাঠিকা (Anchor/ News Caster)।

যেমন— খাস কলকাতায় দিনে দুপুরে জোড়া খুন	(প্রথম গ্রাফিক্স প্লেট)
বেহালার উচ্চবিত্ত আবাসন থেকে বৃদ্ধ দম্পতির দেহ উদ্ধার	(দ্বিতীয় গ্রাফিক্স প্লেট)
গলা কাটা দেহ উদ্ধার	(তৃতীয় গ্রাফিক্স প্লেট)
নিখোঁজ বাড়ির পুরনো পরিচারক	(চতুর্থ গ্রাফিক্স প্লেট)

(উপরোক্ত উদাহরণটি কাল্পনিক। ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।)

ঠিক এরকম ভাবে ছোট ছোট বাক্যের মাধ্যমে পর্দাজুড়ে খবরটি দেখানো হয়। পিছন থেকে শোনা যায় সংবাদ পাঠক বা পাঠিকার (Anchor) কণ্ঠস্বর। সংবাদ পাঠক বা পাঠিকা সাংবাদিকের (Reporter) কাছ থেকে সেই খবরটি সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চান।

তবে ফুল স্ক্রিন ব্রেকিং (Full Screen Breaking) এর ক্ষেত্রে একটি নিয়ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু

এটি একটি ড্রাই ফরম্যাট (ছবি নেই) তাই সেক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর ছাড়া এটির ব্যবহার করা হয় না। আর এই ফরম্যাটটি বারংবার ব্যবহার করা যায় না। অর্থাৎ খুব বেশি হলে এই ফরম্যাটে খবর এক থেকে দু'বার ব্যবহার করা যায়।

৩. এভিও (Anchor Voice Over)

অ্যাঙ্কর ভয়েস ওভার বা এভিও, এটি টেলিভিশন সাংবাদিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরম্যাট। কোনও ঘটনার ছবি (Visual) আসার পর প্রথম কাজ হল ছবিটি দ্রুত দর্শকদের দেখানো। তবে শুধু ছবি দেখালেই তো হয় না। ছবিটি (Visual) সম্পর্কে তথ্য ও ব্যাখ্যা দর্শকদের দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সংবাদ পাঠক বা পাঠিকাই ছবিটির ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। অর্থাৎ দর্শকরা পর্দাজুড়ে ছবিটি (Visual) দেখেন আর পিছনে থেকে সংবাদ পাঠক বা পাঠিকার (Anchor) কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

বেহালার ঘটনার যদি এভিও (Anchor Voice Over) করা হয় সেখানে খবরটি নিম্নোক্ত উপায়ে লেখা যেতে পারে।

এভিও (AVO)—খাস কলকাতায় বৃদ্ধ দম্পতি খুন। আজ সকালে বেহালার একটি নামী আবাসন থেকে দু'জনের গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে নীতিশ বাগেরিয়া ও তাঁর স্ত্রী মীনা বাগেরিয়া প্রায় সাত বছর ধরে ওই আবাসনে থাকতেন। গতকাল তাঁদের সান্ধ্যভ্রমণেও দেখেন প্রতিবেশীরা। আজ সকালে বাগেরিয়াদের গাড়ির চালক বারবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে প্রতিবেশীদের খবর দেন। পরে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে এই প্রবীণ দম্পতির দেহ উদ্ধার করে। নীতিশ বাগেরিয়ার দেহ বসার ঘরে পড়ে ছিল। তাঁর স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ ফ্ল্যাটের অন্য একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়। এই দম্পতিকে দীর্ঘদিন ধরে দেখাশুনা করতেন এক পুরনো পরিচারক। ঘটনার পর থেকে তাঁর কোন খোঁজ নেই। পরিচারকের নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে এই জোড়া খুনের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

(উপরোক্ত উদাহরণটি কাল্পনিক। ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে) ধরে নেওয়া যাক উপরে উল্লিখিত ঘটনাটির ছবি এসেছে। ছবি (VISUAL) দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে সংবাদ পাঠক-পাঠিকা খবরটি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দর্শকদের কাছে তুলে ধরছেন। অর্থাৎ ছবির পিছনে পাঠক বা পাঠিকার কণ্ঠস্বর বা ভয়েস ওভার (VOICE OVER) শোনা যাচ্ছে।

এই ফরম্যাটটিকেই (Format) এভিও (AVO) বা অ্যাঙ্কর ভয়েস ওভার (Anchor Voice over) বলা হয়।

৪. এভিও বাইট/অ্যাঙ্কর ভয়েস ওভার ও সাউন্ড বাইট (AVO-Bite)

মানুষ মাত্রই অনুসন্ধিৎসু। নতুন তথ্যের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে। উপরে উল্লিখিত খবরটির ক্ষেত্রে ছবি দেখা ও তথ্য জানার পর দর্শকের মধ্যে আরও নতুন তথ্যের জন্য চাহিদা তৈরি হতে পারে। তাঁরা জানতে চাইতে পারে শহরের বুকে এরকম একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর পুলিশ কী বলছে? প্রতিবেশীদের বক্তব্য কী? এই ফরম্যাটটিকে এভিও বাইট / অ্যাঙ্কর ভয়েস ওভার ও সাউন্ড বাইট (AVO-Bite) বলে।

এক্ষেত্রে উপরোক্ত খবরটি ছবি হিসেবে দেখানোর পর তারপর পুলিশ আধিকারিক ও প্রতিবেশীর বক্তব্য সাউন্ড বাইট হিসেবে দেখানো হয়। অর্থাৎ দর্শকরা ঘটনাটির ছবি দেখার পর টেলিভিশনের পর্দায় এই দুই ব্যক্তির বক্তব্য সরাসরি দেখতে পারেন। আর এই ফরম্যাটটিকেই এভিও বাইট (AVO/Bite) বলে। এক্ষেত্রে খবরটি নিম্নোক্ত উপায়ে লেখা যেতে পারে।

এভিও বাইট (AVO/Bite)—খাস কলকাতায় বৃদ্ধ দম্পতি খুন। আজ সকালে বেহালার এক নামী আবাসন থেকে দুজনের গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে নীতীশ বাগেরিয়া ও তাঁর স্ত্রী মীনা বাগেরিয়া প্রায় সাতবছর ধরে ওই আবাসনে থাকতেন। গতকাল তাদের সান্ধ্যভ্রমণ করতেও দেখেন প্রতিবেশীরা। আজ সকালে তাদের গাড়ির চালক বারবার ডেকেও সাড়া না পাওয়ায় বাগেরিয়াদের প্রতিবেশীকে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দুটি দেহ উদ্ধার করে। ঘটনার পর থেকে বাড়ির পুরনো পরিচারককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জোড়া খুনের সঙ্গে এই অন্তর্ধানের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রণব পাল

ওসি, বেহালা থানা (সুপার)

পুলকিত কাপুর

প্রতিবেশী (সুপার)

(উপরোক্ত উদাহরণটি কাল্পনিক। ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।)

এভিও বাইট (AVO/Bite) খবরটির সম্পর্কে দর্শকদের মধ্যে বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করে। কারণ ঘটনার ছবি ও তথ্য জানার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটির সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষদের বক্তব্যও দর্শকরা দেখতে পারেন। কিন্তু টেলিভিশনের পর্দায় যখন কারোর বক্তব্য দেখানো হয় তখন স্বভাবতই দর্শকদের মনে প্রশ্ন জাগে বক্তার পরিচয় কী? সেজন্য টেলিভিশনে কারোর বক্তব্য দেখানো হয় তখন স্বভাবতই দর্শকদের মনে প্রশ্ন জাগে বক্তার পরিচয় কী? সেজন্য টেলিভিশনে কারোর বক্তব্য দেখানো হলে মোটের ওপর সবসময় সেই ব্যক্তির পরিচয় একটি গ্রাফিক্স (Graphics/gfx) প্লেটের মাধ্যমে পর্দায় ফুটে ওঠে। (এই নিয়মটি পরিচিত মুখ বা অপরিচিত সব বক্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) আর নাম-পরিচয় সহ সেই গ্রাফিক্স (Graphics/gfx) প্লেটটিকে আমার সুপার (Super) বা অ্যাস্টন (Aston) বলে থাকি।

উপরের উদাহরণটির ক্ষেত্রে পুলিশ আধিকারিক ও প্রতিবেশীরা যখন তাদের বক্তব্য রাখছেন তখন পর্দায় তাদের পরিচয় সুপার বা অ্যাস্টনের মাধ্যমে ফুটে ওঠা বাঞ্ছনীয়।

৫. প্যাকেজ বা ক্যাপসুল (Package/Capsule)

যখন কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও খবর খুব সুসংবদ্ধভাবে দেখানো হয় তখন তাকে টেলিভিশন সাংবাদিকতার ভাষায় প্যাকেজ বা ক্যাপসুল (Package/Capsule) বলা হয়। যেমন উপরের উদাহরণটির ক্ষেত্রে ঘটনাটি যেহেতু চাঞ্চল্যকর তাই হয়ত পুলিশ আধিকারিক, প্রতিবেশী ছাড়াও আরও অনেকের বক্তব্য

এসেছে। সঙ্গে ঘটনাস্থলের ছবি, ফ্ল্যাটের ভিতরের ছবি, নিহতদের পুরনো ছবি এইরকম নানা ইনপুট (Input) এসেছে। এত তথ্য, ছবি ও বক্তব্য দর্শকদের সুসংবদ্ধভাবে ও অল্প সময়ের মধ্যে দেখানোর কপিটি সঠিকভাবে সাজানো প্রয়োজন। মালার মত গেঁথে ফেলা প্রয়োজন। আর এই ফরম্যাটটিকেই টেলিভিশন সাংবাদিকতায় প্যাকেজ বা ক্যাপসুল (Package/Capsule) বলা হয়। যেমন—

প্যাকেজ (Package)—

ভয়েস ওভার-১ (Voice Over 1)—খাস কলকাতায় প্রৌঢ় দম্পতি খুন। বেহালার একটি নামী আবাসন থেকে নীতিশ বাগেরিয়া ও তাঁর স্ত্রী মীনা বাগেরিয়ার গলাকাটা দেহ উদ্ধার হয়েছে। বুধবার সকালে এই প্রবীণ দম্পতির গাড়ির চালক তাঁদের ডাকতে আসেন। কিন্তু কোনও সাড়া না পেয়ে প্রতিবেশীদের খবর দেন। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেহ দুটি উদ্ধার করেন।

পুলকিত কাপুর

আবাসিক (সুপার)

ভয়েস ওভার-২ (Voice Over 2)—বাগেরিয়াদের ফ্ল্যাটের বসার ঘর থেকে নীতিশবাবুর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছে। অন্য একটি ঘর থেকে তাঁর স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার পর থেকে বাড়ির পুরনো পরিচারককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরিচারকের অন্তর্ধানের সঙ্গে এই জোড়া খুনের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রণব পাল

ওসি, বেহালা থানা (সুপার)

খাস কলকাতার বুকে এরকম একটি নামী আবাসনে এই জোড়া খুন হওয়ায় আবাসিকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সিসিটিভির নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কী করে আততায়ী খুন করে পালাল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন আবাসিকরা।

সায়ন্তনী মুখোপাধ্যায়

আবাসিক (সুপার)

এফভিও/ফাইনাল ভয়েস ওভার (Final Voice Over)

বাগেরিয়া দম্পতির একমাত্র সন্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। পুলিশের তরফ থেকে তাঁর সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে।

ব্যুরো রিপোর্ট, এনএসইউ টিভি

(উপরের উদাহরণটি কাল্পনিক। বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।)

উপরের উদাহরণটিতে প্রথমেই আমি শেষ লাইনটির ওপর জোর দিতে চাই। ব্যুরো রিপোর্ট, এনএসইউ টিভি—যেকোন প্যাকেজের (PKG) শেষে এটি একটি অবশ্য জরুরি বিষয়। টেলিভিশনের ভাষায় একে সাইন অফ (SIGN OFF) বলে।

সাইন অফ (SIGN OFF) আসলে কী ? এটির কার্যকারিতা অনেকটা খবরের কাগজের ডেটলাইনের মত (Dateline) অর্থাৎ খবরটির উৎস কোথায়, অনেকসময় রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যানের নামও উল্লেখ থাকে। সঙ্গে উল্লেখ থাকে সংস্থার নাম। আর একেই এককথায় সাইন অফ (SIGN OFF) বলে। যেমন—বেহালা থেকে ক্যামেরাম্যান অর্ক মজুমদারের সঙ্গে সৌরভ বিশ্বাসের রিপোর্ট, এনএসইউ টিভি।

(উপরের উদাহরণটি কাল্পনিক। বিষয়টি ছাত্রছাত্রীদের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।)

এরপর প্যাকেজ বা ক্যাপসুলের (Package/Capsule) আসল ফরম্যাট নিয়ে আলোচনায় আসি। এভিও বা অ্যাঙ্কর ভয়েস ওভার (Anchor Voice Over) নিয়ে আলোচনার সময় আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে পর্দায় ফুটে ওঠা ছবিটির (VISUAL) ব্যাখ্যা অ্যাঙ্কর বা সংবাদ পাঠক-পাঠিকা (ANCHOR) পিছন থেকে করতে থাকেন। অর্থাৎ আমরা যখন কোনও ছবি দেখি তখন এভিও বা অ্যাঙ্কর ভয়েস ওভার (Anchor Voice Over) এর ক্ষেত্রে পিছন থেকে সংবাদ পাঠক-পাঠিকার (ANCHOR) কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। কিন্তু প্যাকেজ বা ক্যাপসুলের (Package/Capsule) ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্যরকম। এক্ষেত্রে কোনও খবরের সমস্ত ইনপুট (INPUT) বা তথ্য নিয়ে প্রথমে সেগুলিকে সুসংবদ্ধ ভাবে সাজিয়ে লেখা হয়। তারপর ভয়েস ওভার লেখা অংশগুলির ভয়েস রেকর্ডিং করা হয়। যেমন উপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে ভয়েস ওভার অংশ গুলি পড়ে রেকর্ডিং (Recording) করা হয়।

এক্ষেত্রে যাঁর কণ্ঠস্বর ভালো তিনি ভিও বা ভয়েস ওভার (Voice Over) অংশগুলি রেকর্ডিং (Recording) করেন। তারপর সেই রেকর্ডিং (Recording) অংশটি ভিডিও এডিটরের (Video Editor) কাছে পাঠানো হয়। ভিডিও এডিটররা (Video Editor) ভয়েস ওভারের (Voice Over) বিষয়টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভিস্যুয়াল ব্যবহার করে গোটা ক্যাপসুল বা প্যাকেজটি (Package) তৈরি করেন। দর্শকরা যখন ক্যাপসুল বা প্যাকেজটি (Package/Capsule) দেখেন তখন গোটা বিষয়টি সম্পর্কে বিশদে জানতে পারেন।

প্যাকেজ বা ক্যাপসুলের (Package/Capsule) ক্ষেত্রে উপরের উদাহরণটিই একমাত্র নয়। প্যাকেজ বা ক্যাপসুল কীভাবে লেখা হবে তা সম্পূর্ণভাবে কপি এডিটরের (Copy Editor) ওপর নির্ভর করে। পরম্পরা অনুযায়ী কপি এডিটর (Copy Editor) কীভাবে খবরটি সাজাবেন সেটা তাঁর যৌক্তিক মননের ওপর নির্ভর করে। তিনি দুটি ভয়েস ওভার ও তাঁর মাঝখানে বাইটগুলি পরপর দিয়ে প্যাকেজ সাজাতে পারেন। অথবা কোনও বাইট ছাড়াও প্যাকেজ বা ক্যাপসুল লিখতে পারেন। এটি সম্পূর্ণভাবে ঘটনাটির প্রাসঙ্গিকতার ওপর নির্ভর করছে।

এই গেল মোটের ওপর টেলিভিশন সাংবাদিকতার নানা ফরম্যাট (Format)। এবার আরেকটি গুরুত্ব বিষয় নিয়ে আলোচনা করল তাহলে সময়কাল (Duration)। খবরের কাগজের কপির ক্ষেত্রে যেমন শব্দসংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টেলিভিশন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সময়কাল (Duration) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩.৫.৩ টেলিভিশন কপির সময়কাল (Duration)

টেলিভিশন সাংবাদিকতার মূল বিষয়ই হল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দৃশ্য ও শব্দের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পৌঁছনো। এক্ষেত্রে প্রতিটি খবরের ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়কাল (Duration) থাকে। একটি খবর অনন্তকাল পর্যন্ত দেখানো যায় না। টেলিভিশন সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্যই অল্প সময়ের মধ্যে গুছিয়ে নির্দিষ্ট দৃশ্য ও শব্দের মাধ্যমে খবরটিকে পরিবেশন করা। এক্ষেত্রে খাতায় কলমে কোনও নিয়ম না থাকলেও ভারতীয় টেলিভিশন সাংবাদিকতায় বিভিন্ন ফরম্যাটের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সময়কাল (Duration) চলে আসছে। যেমন এভিও (Anchor Voice over) ক্ষেত্রে সময়কাল ৩০-৪৫ সেকেন্ড হয়। এভিও বাইট (AVO/Bt) ক্ষেত্রে এক-একটি বাইট ৩০ সেকেন্ড সময়কালের হতে পারে। অর্থাৎ পরপর দুটি বাইট থাকলে দুটির সময়কাল ১ মিনিট হবে। আবার প্যাকেজের ক্ষেত্রে সময়কাল সাধারণত ১.২০ মিনিট থেকে ১.৪০ মিনিট হতে পারে। তবে আগেই বলেছি এটি খাতায় কলমে কোনও নিয়ম নয়। খবরের গুরুত্ব বুঝে সময়কাল (Duration) অবশ্যই বাড়ানো যেতে পারে।

টেলিভিশন সাংবাদিকতার জন্য যখন কোনও কপি লেখা হয় তখন একটি বিষয় অবশ্যই পালনীয় তা হল ছবি (VISUAL) দেখে খবর লেখা। আগেও বলেছি টেলিভিশনে ছবিই প্রধান। আর যখন কপি লেখা হয় তখন ছবির পরিপূরক হিসেবেই তা লেখা হয়। কপির ব্যাখ্যার সঙ্গে ছবিকে (VISUAL) মিশিয়ে দেন ভিডিও এডিটররা (VIDEO EDITOR)। নির্দিষ্ট কোনও এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে তাঁরা এটা করে থাকেন। তবে ভিডিও এডিটিং যেহেতু এই অধ্যায়ের বিষয় নয় তাই তা নিয়ে আমার পরে আলোচনা করব তবে টেলিভিশন সাংবাদিকতার কপি বলতে আমরা শব্দ ও দৃশ্যের সঠিক মেলবন্ধনকেই বুঝি।

৩.৫.৪ সংবাদ পাঠ কী? (Anchoring)

টেলিভিশন সাংবাদিকতার একটি জনপ্রিয় বিভাগ হল অ্যাঙ্কারিং (Anchoring) বা সংবাদ পাঠ। আমরা যারা টেলিভিশন সাংবাদিকতায় যুক্ত হতে চাই, কমবেশি সকলেই হয়ত অ্যাঙ্কারিং (Anchoring) বা সংবাদ পরিবেশনে আগ্রহী।

প্রথমেই সংবাদ পরিবেশন (Anchoring) এর ক্ষেত্রে একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করতে চাই। মোটের ওপর আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস যে সুশ্রী হলেই বোধহয় সংবাদ পাঠক বা পাঠিকা (Anchor) হওয়া যায় এই ধারণাটি কার্যত ভুল। বাস্তবে সুশ্রী হলেও অনেক সময় দেখা যায় তাকে হয়ত ক্যামেরায় খুব একটা মানানসই লাগছে না। যাকে আমরা বলি ফোটোজেনিক। সংবাদপাঠক বা পাঠিকাকে ফোটোজেনিক হওয়া খুব জরুরী।

৩.৫ ওয়েবসাইটের জন্য বিষয়বস্তুর লিখনরীতি

বেতার কিংবা মুদ্রিত গণমাধ্যমের তুলনায় একবারে ভিন্ন ঘরানার নিয়মনীতি কাজ করে ওয়েবসাইটের

জন্য তথ্য বা বিষয়বস্তু লেখার সময়; কারণ একজন ব্যক্তি যেভাবে এবং যে লয়ে মুদ্রিত মাধ্যমের লেখা পড়েন তার থেকে ভিন্নভাবে এবং অনেক দ্রুততার সঙ্গে পাঠ করেন। অনলাইনে পাঠের একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে জ্যাকব নীলসেন মন্তব্য করেছেন, "on the average webpage, users have time to read at most 28% of the words during an average visit, 20% is more likely." নীলসেনের এই বক্তব্যের থেকে পাঠকের ওয়েবসাইটের একটি ঝলকের মধ্যে দিয়ে তাদের পাঠের গতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ফলে যেখানে ওয়েবসাইট অন্যান্য গণমাধ্যমের তুলনায় ভিন্ন সেখানে বিষয়বস্তু সন্নিবেশের ক্ষেত্রেও নিয়মনীতি আলাদা হয়ে যায়। আমরা সংক্ষেপে সেইগুলি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

- মানুষ একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজন নিয়ে আসে। ফলে একটি ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু সন্নিবেশের সময় ভোক্তাদের প্রয়োজন, চাহিদা এবং তার পূরণের বিষয়টি সর্বাগ্রে মাথায় রাখা উচিত যাতে অতি সহজেই তাঁরা তাঁদের প্রয়োজন মেটাতে পারেন মাত্র কয়েকটি ক্লিকের মাধ্যমে। যদি একটি ওয়েবসাইট ভোক্তার প্রয়োজন মেটাতে না পারে তাহলে তারা সেই ওয়েবসাইট ব্যবহার বন্ধ করবে। ফলে ভোক্তার চাহিদা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান যেমন একদিকে ওয়েবসাইটের প্রথম দর্শনকে (পড়ুন 'homepage') আকর্ষক করে তোলে তেমনই অন্যদিকে 'ওয়েবপেজ'টির 'হেডার' এবং 'ফুটার' সহ সমগ্র পেজটির গড়ন অনেকবেশি গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়।
- ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু লেখার সময় দর্শক বা পাঠকের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, যাকে আমরা সাধারণভাবে বলি 'Target your audience'। কাদের জন্য ওয়েবপেজটি লেখা গড়া হচ্ছে সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তুর নিক্তিকে সেই অনুযায়ী রাখতে সহায়তা করে।
- তথ্যের একত্রীকরণ করাটা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ; যাতে দর্শক/পাঠক/ভোক্তা এক নজরে তাঁদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করে নিতে পারেন।
- ওয়েবসাইটের জন্য লেখার ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার মডেলটি গ্রহণ করা উচিৎ। এক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সবার শুরুতে রেখে তারপরে অতিরিক্ততথ্য ও বিশদ বিবরণী যুক্ত করা উচিৎ।
- বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে সর্বনামের (আপনি/আমরা) প্রয়োগ ও সরলবাক্যের ব্যবহার স্বচ্ছ বিষয়বস্তু গঠনে ও ভোক্তা/দর্শক/পাঠককে তা সহজে গ্রহণ করতে সহায়তা করে। ছোটো বাক্য ও ছোটো অনুচ্ছেদ এই বিষয়ে আরও সহায়ক হয়। একটি বাক্যে অনধিক কুড়িটি শব্দ এবং একটি অনুচ্ছেদে অনধিক পাঁচটি বাক্য থাকা বাঞ্চনীয়। একটি বৃহৎ এবং জটিল বাক্যের তুলনায় সরল দুটি ছোট বাক্য সব ধরনের পাঠকের বোধগম্যতার জন্য সহায়ক হয়।
- সঠিক এবং বোধগম্য ভাষা প্রয়োগ ওয়েবসাইট লিখনের ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়। ওয়েবসাইট লিখনের সময় মনে রাখতে হয় যে ব্যবহারকারীদের সকলেই বিষয়-বিশেষজ্ঞ নন। ভাষা এমন হতে হবে যাতে সর্বশ্রেণির ব্যবহারকারী একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে গিয়ে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জেনে তার ব্যবহার করতে সক্ষম হন।
- সরল স্বচ্ছ শিরোনাম ওয়েবসাইটের লিখনের ক্ষেত্রে কাম্য।

- বিষয়বস্তুকে আকর্ষক করে তোলার জন্য ছবি, ডায়াগ্রাম বা 'মাল্টিমিডিয়া'র সঙ্গে চলমান ছবি বা ভিডিওর প্রয়োগ করাটা এক্ষেত্রে কার্যকরী।
- ওয়েবসাইট প্রস্তুতের আগে নিজের 'Target audience' সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয় তা না হলে, তথ্য এবং উপস্থাপনগত বিভ্রান্তি থাকতে পারে। আবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় তথ্যে ওয়েবসাইট পূর্ণ হতে পারে। সহজভাবে বলতে গেলে একটি 'ল-ফার্মের' জন্য যেভাবে একটি ওয়েবসাইট প্রস্তুত হবে সেই একইভাবে একই তথ্যের দ্বারা সাহিত্যের গবেষণাধর্মী ওয়েবসাইট কিংবা লাইব্রেরি ধরনের ওয়েবসাইট প্রস্তুত হবে না।
- দর্শকগণ বিভিন্ন উপায়ে একটি ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানতে পারেন। সেটা হতে পারে বিজ্ঞাপন, অন্য কোনো ওয়েবসাইট, ই-মেল, মারফৎ, লোকমুখে শুনে কিংবা 'সার্চ ইঞ্জিন'-এর মাধ্যমে। এই সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানা বা ওয়েবসাইট খুঁজে পাওয়াটা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রচুর তথ্য সম্বলিত ওয়েবসাইট যদি সার্চ ইঞ্জিনের মারফৎ সহজেই খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে দর্শক কিন্তু সহজলভ্য ওয়েবসাইটটিকেই নির্বাচন করবেন নিজের প্রয়োজনে। ফলে একজন দর্শক কী ধরনের শব্দ প্রয়োগ করতে পারেন সার্চ ইঞ্জিনে সেই বিষয়ে ধারণা নিয়ে তারপর নিজের ওয়েবসাইটের শিরোনাম বা বিষয়বস্তু লেখার কাজে অগ্রসর হওয়া কাম্য।

৩.৬ প্রশ্নাবলি

১. একটি স্বার্থক ওয়েবসাইট গড়ে তোলার জন্য কি কি নিয়ম অবলম্বন করা উচিৎ সে সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ করুন।

২. মুদ্রিত গণমাধ্যমের তথ্য সাজানোর ক্ষেত্রে কি কি নিয়মনীতি মেনে চলা উচিৎ? বিস্তারিত নিবন্ধ রচনা করুন।

৩. বেতার যন্ত্রের ধারাভাষ্য বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্ক্রিপ্ট রচনা করা কেন বাঞ্ছনীয়? নিজের ভাষায় যুক্তিসহ বর্ণনা করুন।

৪. দৃশ্য ও শ্রাব্য গণমাধ্যমে লেখার জন্য কি কি নিয়মনীতি রয়েছে? সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. পার্থ চট্টোপাধ্যায় - গণজ্ঞাপন

২. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য - জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম

৩. বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য - আধুনিক গণমাধ্যম

৪. The Evolution of Media- Understanding Media and Culture

৫. PGJM-2b, 6a & b, 4b

মডিউল ২

গণজ্ঞাপন

একক ১ ❑ জ্ঞাপনধারণা

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ জ্ঞাপনধারণা

১.৪ গণজ্ঞাপনের উপাদান

১.৫ জ্ঞাপনতত্ত্ব

১.৬ জ্ঞাপনতত্ত্বের নানান মডেল

১.৭ প্রশ্নাবলি

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

এই কোর্সটির প্রথম মডিউলে গণমাধ্যম কী এবং তার নানান প্রকারভেদ ও বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে প্রথম মডিউলটির পাঠ-অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করে ছাত্রছাত্রীরা এই বর্তমান মডিউলে গণজ্ঞাপন সম্পর্কে নানান তথ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হবেন। এই এককটি পাঠের ফলস্বরূপ জ্ঞাপনধারণা, জ্ঞাপনতত্ত্ব ও জ্ঞাপনতত্ত্বের নানান মডেল সম্পর্কে প্রাথমিক স্বচ্ছ ধারণা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গড়ে উঠবে। এককটির উপান্তে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে অনুশীলনযোগ্য কিছু সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী এবং আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত করা হয়েছে।

১.২ প্রস্তাবনা

জ্ঞাপন বা যোগাযোগ একটি সার্বিক প্রক্রিয়া। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী ক্রমাগত নিজেদের মধ্যে নিজেদের মতো করে যোগাযোগ স্থাপন করে চলেছে। কারণ জীব-জগতের স্বভাবেই রয়েছে নিজেকে জানা ও জানানোর প্রবৃত্তি। কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে মানব প্রজাতি সৃষ্টির আদিম যুগ থেকেই যে নিজেদের মধ্যে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে চলেছে একথা আমরা পূর্ববর্তী মডিউলটির আলোচনা থেকে জেনেছি। এই জানা ও জানানোর প্রসঙ্গেই আসে জ্ঞাপনের বিষয়টি বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে বলতে পারি গণজ্ঞাপনের বিষয়টি। মানবপ্রজাতি সংযোগ স্থাপন করে মূলত তথ্য, তত্ত্ব, সংবাদসহ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য। গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যে জ্ঞাপন হয় তা একটি সার্বজনীন ও বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া। ফলে এই বৃহৎ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ অথচ স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ, জ্ঞাপন কী? এর তত্ত্বই বা কী? এটি কীভাবে কাজ করে এই সমস্ত নানান প্রশ্নের উত্তরের খোঁজ পাওয়া যাবে এই অধ্যায়ে।

১.৩ জ্ঞাপনধারণা

আলোচনার শুরুতেই জ্ঞাপন কী সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। সেই সঠিক ধারণাকে সঙ্গী করেই কোর্সটির পরবর্তী পাঠে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয় জ্ঞাপন হল তথ্যের আদান-প্রদান এবং এই প্রক্রিয়াটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। এই জ্ঞাপন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে; যেমন—পারস্পরিক জ্ঞাপন, দলগত জ্ঞাপন, গণজ্ঞাপন, গণরেখ জ্ঞাপন প্রভৃতি। পারস্পরিক জ্ঞাপন হয় দুই ব্যক্তির মধ্যে, যেখানে ক্রমান্বয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি বক্তা ও শ্রোতার ভূমিকা পালন করে। দলগত জ্ঞাপনে অংশগ্রহণ করে দুইয়ের অধিক ব্যক্তি। গণজ্ঞাপনে ঘটে বহুমানুষের অংশগ্রহণ এবং গণরেখ জ্ঞাপন তখন ঘটে যখন কোনো একজনের বার্তা একটা বৃহৎ অংশের মানুষের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। যেমন—মহাত্মা গান্ধী, উইনস্টন চার্চিল নিজেদের বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে সমাজের বৃহৎ অংশের মানুষের মনে গভীর পরিবর্তন এনেছিলেন।

ফলে এই নানান ধরনের জ্ঞাপন সম্পর্কে জানার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন জ্ঞাপনের যথাযথ সংজ্ঞা। জ্ঞাপনের ইংরেজি প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'Communication', যার মূলে আছে লাতিন শব্দ 'Communis' যার অর্থ 'Common' বা সাধারণ। এই শব্দটি আসলে সংযোগকারী এবং বার্তা-গ্রাহকের মধ্যে একটি সাধারণ বার্তা বা তথ্যের সংযোগরেখা সৃষ্টি করার প্রতি নির্দেশ করে। এই বিষয়টিকে স্মরণে রেখে বিভিন্নভাবে জ্ঞাপনের সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছে। এই সংজ্ঞাগুলির প্রতি একনজরে দেখা যেতে পারে।

- According to Oxford English Dictionary, communication is 'the transfer or conveying of meaning' (Oxford Dictionary).
- Communication is the transmission and interchange of facts, ideas, feeling or course of action. (Leland Brown).

- Communication is a process of sharing or exchange of ideas, information, knowledge, attitude or feeling among two or more persons through certain signs and symbols.
- Communication is a mechanism through which human relations exist and develop. (Wilbur Schramm)
- Dennis McQuail বলেছেন, 'Communication is a process which increases commonality'. অর্থাৎ, জ্ঞাপন হল একটি প্রক্রিয়া যা সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। McQuail জ্ঞাপনকে মানবিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেন মানুষে মানুষে ঝোঝাপড়া, ভাবনার আদানপ্রদান ঘটে চলার মধ্যে দিয়ে সামাজিক সংহতি গড়ে ওঠে।
- John C Merril এবং Ralph L Lowenstein বলেছেন জ্ঞাপন হল দ্বিমুখী বার্তা। এর এক অভিমুখে বার্তা প্রেরকের থেকে গ্রাহকের দিকে যায় এবং বিপরীত অভিমুখ থেকে গ্রাহকের দিক থেকে সেই বার্তার প্রতিক্রিয়া গ্রাহকের দিকে আসে।
- কলিন চেরি বলেছেন জ্ঞাপন হল উদ্দীপনা প্রেরণ ও প্রত্যুত্তর প্রস্তুতির প্রক্রিয়া (Transmission of Stmuli and evocation of response)। এর অর্থ হল শুধুমাত্র বার্তার বিনিময় দিয়ে জ্ঞাপন হয় না, তাকে উদ্দীপনা অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে। গ্রাহক উদ্দীপিত হলেই তৈরি হবে প্রতিক্রিয়া যা তৈরি করবে প্রত্যুত্তর এবং এইভাবেই জ্ঞাপন হয়ে ওঠে মানবিক।
- George Gerbner জ্ঞাপন প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, জ্ঞাপন হল বার্তা বিনিময়ের মাধ্যমে সংগঠিত সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া (Communication is social interaction through messages)।

১.৩.১ জ্ঞাপনের প্রকারভেদ :

বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপনের প্রতি লক্ষ রেখে আলোচনার সুবিধার্থে তাত্ত্বিকগণ জ্ঞাপনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন, নিম্নে সেই বিভাগগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

- **পারস্পরিক জ্ঞাপন (Interpersonal Communication) :** দুজন ব্যক্তির মধ্যে যখন কথোপকথন চলে তখন হয় পারস্পরিক জ্ঞাপন। প্রধানত কথাই হলো এই জ্ঞাপনের মাধ্যম। মানুষ মানুষের সঙ্গে কথা বলে ভাব বিনিময় করার উদ্দেশ্য থেকে। ফলে মানবপ্রজাতির মধ্যে প্রতিনিয়ত এই পারস্পরিক জ্ঞাপন ঘটে চলেছে। এই জ্ঞাপনের সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা।
- **দলগত জ্ঞাপন (Group Communication) :** বেশকিছু মানুষ যখন জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন তখন ঘটে দলগত জ্ঞাপন। সভা-সমিতির আলোচনা হল দলগত জ্ঞাপনের উদাহরণ। এক্ষেত্রে শুরুতে একজন বলেন এবং তারপর উপস্থিত বাকিরা একে একে সেই বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবার্তা প্রেরণ করেন। পারস্পরিক জ্ঞাপনের তুলনায় এক্ষেত্রে প্রতিবার্তা আসতে কিছুটা সময় লাগে।

- **গণজ্ঞাপন (Mass Communication) :** জ্ঞাপন যখন গণের উদ্দেশ্যে করা হয় তখনই ঘটে গণজ্ঞাপন। যন্ত্র নির্ভর নানান মাধ্যম যেমন সংবাদপত্র, টেলিভিশন, বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে এই জ্ঞাপন হয়। গণজ্ঞাপনে প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাতে তাৎক্ষণিকতা বা স্বতঃস্ফূর্ততা একেবারেই থাকে না। গণজ্ঞাপন সম্পূর্ণত পূর্ব পরিকল্পিত প্রক্রিয়া, গণ মাধ্যমে যার প্রভাব সব থেকে বেশি।
- **গণরেখ জ্ঞাপন (Mass Line Communication) :** রাষ্ট্রনেতারা সাধারণ মানুষের কাছে বক্তৃতার মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যে যুক্তি যেমন থাকে আবেগ। তারা নিজেদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে জনগণকে শিক্ষিত করেন, প্রণোদিত করেন এবং উদ্দীপ্ত করেন। এই হল গণরেখ জ্ঞাপনের দৃষ্টান্ত। এই জ্ঞাপনে প্রতিবার্তা পেতে যথেষ্ট সময় লাগে।
- **মৌখিক জ্ঞাপন (Verbal Communication) :** মানুষের সঙ্গে মানুষের কথা বলার মাধ্যমে ঘটে মৌখিক জ্ঞাপন। মৌখিক জ্ঞাপনে তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায়। মৌখিক জ্ঞাপন গড়ে ওঠে মুখোমুখি, ফোন, ভয়েস চ্যাট, ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্য কোনো মাধ্যমে। বক্তৃতা, সম্মেলন প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ মৌখিক জ্ঞাপনের ধরণ।
- **অমৌখিক জ্ঞাপন (Non-Verbal Communication) :** এক্ষেত্রে মৌখিক কথাবার্তার পরিবর্তে অভিব্যক্তি, গান, ছবি কিংবা লেখার মধ্যেমে জ্ঞাপন ঘটে। কথা না বলেও যে সঠিক বার্তাটি প্রেরণ করা যায় তা বুঝি যখন নাচের কিংবা নির্বাক নাটকের অপরূপ শিল্পকলায় বিভিন্ন ভাবকে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। এই জ্ঞাপনের সবথেকে উজ্জ্বল প্রতিনিধি হল ছবি বা চিত্রকলা।

১.৪ গণজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্য

- গণজ্ঞাপনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যন্ত্র নির্ভরতা। এখানে জ্ঞাপনক্রিয়া সম্পন্ন হয় যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে। সংবাদপত্র হল একটি গণমাধ্যম। এই মাধ্যমের জন্য প্রয়োজন ছাপাখানা যেটি সম্পূভাবে যন্ত্রনির্ভর। বেতার এবং টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র আরও অনেক বেশি যন্ত্রনির্ভর।
- দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল বার্তার নৈর্ব্যক্তিকতা । গণজ্ঞাপনে যাদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানো হচ্ছে তাঁদের পরিচয় জানা থাকে না। তাই বার্তার চরিত্র হল নৈর্ব্যক্তিক। Gary Gumbert এবং Robert Cathcart বলেছেন গণজ্ঞাপনের বার্তার লক্ষ্য হল 'to whom it may concern'। যাদের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠানো হচ্ছে তারা সেই বার্তা গ্রহণ করবেন এটা ভেবে এগিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কারা সেই বার্তা শুনছেন বা দেখছেন তা জানা যায় না।
- এর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিবার্তা সবক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না। চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রতিবার্তা পেতে যথেষ্ট সময় লাগে। বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় টেলিভিশন কিংবা বেতারে যে তৎক্ষণাৎ প্রতিবার্তা পাওয়ার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।
- গণমাধ্যমের শ্রোতারা অসংগঠিত। একই বার্তা বিপুল শ্রোতা-মণ্ডলী পড়ছে বা দেখছে কিন্তু

তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ নেই। একে অপরকে চেনে না। যেমন একই সংবাদ টেলিভিশনে বহু মানুষ দেখছে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক যোগাযোগ গড়ে উঠছে না। এই অভিনব দিকটির কথা উল্লেখ করেছেন হারবার্ট ব্লুমার। তিনি বলেছেন গণমাধ্যমের শ্রোতৃমণ্ডলী কেউ পরস্পরকে চেনে না, কিন্তু পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিল আছে। গণজ্ঞাপন প্রক্রিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রভাবিত করতে চায়। এই প্রভাবের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো বাণিজ্যিক সফলতা।

১.৫ জ্ঞাপনতত্ত্ব

জ্ঞাপন বুঝতে গেলে তার তাত্ত্বিক রূপরেখা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন তাত্ত্বিকগণ তাঁদের তত্ত্ব ও দৃষ্টিকাণ থেকে জ্ঞাপন চরিত্রকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। এই তত্ত্ব এবং তথ্যের সম্মিলন জ্ঞাপনধারণাকে স্বচ্ছভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

- **দ্বি-স্তর প্রবাহতত্ত্ব :** এই তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল ১৯৪০-১৯৬০ সালের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর রাজনৈতিক চিত্রের আমূল পরিবর্তনের পরে শুরু হয় দ্বিমেরু রাজনীতি বা বাইপোলার পলিটিক্স। রাশিয়ার নেতৃত্বে যখন পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে উঠছিল তখন সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধ দেশের রাজনৈতিক অবস্থানকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই জটিল অবস্থার মধ্যে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞগণ সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে জনগণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাবের বিষয়টিকে অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন। মানুষের সার্বিক মতামত বোঝার জন্য পল লেজারস্পেল্ড, বার্নারড বেরেলসন এবং হেজেল গডেট গবেষণা শুরু করেন। এবং এই গবেষণার ফল দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব। এই গবেষকরা দেখলেন গণমাধ্যমের বার্তা সরাসরি বুলেটের মতো জনগণের কাছে পৌঁছচ্ছে না। সেই বার্তা জননেতাদের মাধ্যমে যাচ্ছে জনসাধারণের কাছে। অর্থাৎ, দুটি স্তর পেরিয়ে বার্তাটি জনগণের কাছে পৌঁছচ্ছে। Deutschman G Danielson বলেছেন দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব শেষ কথা হতে পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে তার কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও মানুষের আচরণকে পুরোপুরি প্রভাবিত করতে পারে না।
- **বহুস্তর প্রবাহতত্ত্ব :** দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্বের উন্নত রূপ হল বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব। গণমাধ্যমের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে জননেতাদের মাধ্যমে। দ্বিস্তরের এই রূপটি বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে যখন সমাজ নেতারা সমাজের বিভিন্ন প্রভাবের অধীনে কাজ করে। জননেতারা যাদের কাছে গণমাধ্যমের বার্তাকে ব্যাখ্যা করবেন তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী, প্রতিক্রিয়াও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। জননেতাদের সাধারণ মানুষের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও মনস্তত্ত্বকে বিবেচনা করেই এগোতে হয়। এভাবে এই আসে বহু স্তর, বহু বিন্যাস—যাকে বলা হচ্ছে বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব।
- **পৃথক পার্থক্য তত্ত্ব :** গণমাধ্যমের বার্তা একই ভাবে জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে না, বা বলা

ভালো একই প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় না। একেক জন মানুষ একটি বার্তার প্রেক্ষিতে একেকরকম ভাবে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ব্যক্তির মানসিক গঠন, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রতিক্রিয়াতে প্রভাব বিস্তার করে। গণমাধ্যমের সঙ্গে ব্যক্তির স্বতন্ত্র আন্তঃসম্পর্ককেই প্রথম পার্থক্য তত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়।

- **বিষয় নির্বাচন ও দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব :** গণমাধ্যম চর্চায় দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গণমাধ্যমের বিষয় নির্বাচন হল দ্বার রক্ষার কাজ। গণমাধ্যমের পরিচালন স্তরে এমন কিছু মানুষ থাকেন যাঁরা ঠিক করেন কী পরিবেশিত হবে গণের উদ্দেশে। বিষয় নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা হলেন দ্বাররক্ষী। প্রতিটি গণমাধ্যমেই পেশাদার ব্যক্তিরাই দ্বাররক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকেন। তারা ঠিক করেন বিষয়বস্তুর বিপুল প্রবাহ থেকে কোন বিষয়গুলি গণমাধ্যমে পরিবেশিত হবে। সঠিক বিষয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে দ্বার-রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কুর্ট লিউইনের গবেষণার মধ্যে নিহিত আছে দ্বার রক্ষার ধারণাটি। শুমেকার এবং রিজ বলেছেন দ্বার রক্ষার কাজ কতকগুলি নির্দিষ্টি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাদের বক্তব্য হল পাঠকদের চাহিদা ও বিচারকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গড়ে ওঠা সহমত দ্বার-রক্ষার কাজকে পরিচালিত করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে উল্লেকরেছেন। নির্বাচকেরা যে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বেড়ে ওঠেন তার প্রভাব তাদের নির্বাচনের মধ্যে পড়ে। শুমেকার এবং রিজ তাদের দ্বার-রক্ষার তত্ত্বে মূল্যবোধকে যুক্ত করেছেন। পাঠকদের চাহিদা, পছন্দের সঙ্গেও মূল্যবোধের যোগ রয়েছে। গালটাং ও রুজ দ্বার-রক্ষা নিয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে দেখেছেন সাংগঠনিক ও আবেগগত বিষয়ক সংবাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। ফিওম্যান বলেছেন সংবাদের মধ্যে যে বাস্তবতা রয়েছে তা নির্বাচকদের বাস্তব আন্তরিকতার সঙ্গে কতটা খাপ খাচ্ছে সেটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।
- **উদ্ভাবন মিথষ্ক্রিয়া তত্ত্ব :** গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছেন মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী সমাজবদ্ধ অবস্থায় যাপন করতে চায়, পাশের মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পর্ক তৈরি করতে চায়, বার্তা বিনিময় করতে চায়। এই সম্পর্ক গড়ে ওঠে জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে। নিজেকে জানানো এবং অপরকে জানার একটা ক্রমাগত চক্রের মধ্যে দিয়ে একটি সাধারণ পরিচয় গড়ে ওঠার কাজ চলে। গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ জর্জ গার্বনার জ্ঞাপনক সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। সামাজিক আন্তঃসম্পর্ক বিন্যাসের উৎস হল জ্ঞাপন। পারস্পরিক, দলগত এবং গণজ্ঞাপন প্রভৃতি সকল কাজের মধ্যে সর্বদাই সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া ঘটে চলেছে। গার্বনার বলেছেন জ্ঞাপন ক্রিয়ার অন্যতম উপাদান হল বার্তা। গার্বনার যে মডেল দিয়েছেন তাতে উৎস, মাধ্যম, প্রেক্ষাপট, বিষয়বস্তু ও জ্ঞানের পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। যেকোনো জ্ঞাপনেই প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। গার্বনার এই প্রতিক্রিয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রতিক্রিয়ায় পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ সুগম হয়। সমাজে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে তথ্যের আদান-প্রদান ও বোঝাপড়া চলছে। আর এই বোঝাপড়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া, যাকে জ্ঞাপনতাত্ত্বিকগণ উদ্ভাবন মিথষ্ক্রিয়া, যাকে জ্ঞাপনতাত্ত্বিকগণ উদ্ভাবন মিথষ্ক্রিয়া তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

- **ব্যক্তি-প্রভাব তত্ত্ব :** গণমাধ্যমে পরিবেশিত বার্তার প্রতিক্রিয়া সকলের ক্ষেত্রে সমান হয় না। ব্যক্তি বিশেষে তা বদলে যায়। প্রতিক্রিয়ার এই বদলকে সামনে রেখেই তাত্ত্বিকগণ এই তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন।
- **কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব :** সংবাদপত্র কীভাবে কাজ করবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিস্থিতির ওপর। ইউরোপের বহুদেশেই একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কর্তৃত্ববাদী দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে না, শাসনক্ষমতার কোনোরকম সমালোচনার পথ এক্ষেত্রে হয় রুদ্ধ। একনায়কের কর্তৃত্বকে সমর্থন করাই হয়ে দাঁড়ায় গণমাধ্যমের একমাত্র কর্তব্য।
- **উদারনৈতিক তত্ত্ব :** কর্তৃত্ববাদী তত্ত্বের বিপরীতে অবস্থান করা উদারনৈতিক তত্ত্বে গণতন্ত্রের কথা ধ্বনিত হয়। বিরোধিতা ও সমালোচনাকে গণতন্ত্রের অপরিহার্য শর্ত বলে ধরা হয়। মানুষ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করবে এবং সেই মতো অবস্থান করবে এটাই উদারনৈতিক দর্শনের মূল কথা। গণমাধ্যমের সাফল্য এই দর্শনের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে।
- **সাম্যবাদী গণমাধ্যম তত্ত্ব :** সাম্যবাদী দেশের গণমাধ্যম সাম্যবাদী ভাবধারার আলোকে পরিচালিত হয়, মার্ক্সবাদী দর্শন যার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। মার্কসীয় তত্ত্ব বলে শ্রেণিহীন সমাজে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। শোষণহীন সমাজের সর্বক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। এই লক্ষ্যে যাবার পথে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন হবে এবং এই সামাজিক উপকরণের মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। কোনওরকম ব্যক্তি-মালিকানার অস্তিত্ব থাকবে না। ব্যক্তির অধিকারের চেয়ে সামাজিক অধিকারকে বেশি মান্যতা দেওয়া হবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। গণমাধ্যম এই ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ করবে। মুনাফার জন্য নয়, বরং সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন কিংবা চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য হবে সমষ্টিগতভাবে সামাজিক সাম্য রক্ষা করার এবং সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার।
- **সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্ব :** উদারনৈতিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাকে সংশোধন করার চেষ্টা করে সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা। সংবাদপত্র শুধুমাত্র সরকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং তাতেই সামাজিক মঙ্গল হবে, এই ধারণা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে। সামাজিক স্বার্থে সংবাদপত্রকেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সামাজিক মঙ্গল কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা ভাবতে হবে। এই হল সামাজিক দায়বদ্ধতা। সাংবাদিকতার নীতি ও উদ্দেশ্য যদি বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তৈরি হয় তাহলেই সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।
- **উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব :** গণমাধ্যম দেশকালের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। উদারনৈতিক ব্যবস্থায় একভাবে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে অন্য ভাবে কাজ করে। বিশেষ করে দেশকালের প্রেক্ষিতে সামাজিক চাহিদার তারতম্যের ফলে গণমাধ্যমের কার্যধারায় পার্থক্য লক্ষ করা যায় এবং একই সঙ্গে তাদের সীমাবদ্ধতাগুলিও প্রকট হয়ে ওঠে। এইসব সীমাবদ্ধতার কথা ভেবেই কয়েকজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ নতুন একটি তত্ত্বের রূপরেখা দিয়েছেন। এর নাম উন্নয়ন গণমাধ্যম তত্ত্ব।

McQuail, Altschull এবং Hachten বলেছেন, গণমাধ্যমগুলি উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করার উদ্যোগ নেবে। দ্রুত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো এই মুহূর্তে সবথেকে বেশি প্রয়োজনীয়। সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের বার্তা নিয়ে যেতে হবে এবং এই কাজে সবথেকে বেশি সহায়ক এবং কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় গণজ্ঞাপন।

- **গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব :** গণতন্ত্র সফল হয় মানুষের অংশগ্রহণে। গণতন্ত্রের মূল কথাই হল মানুষ। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র তখনই সফল হয় যখন মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। রুশো থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল এই গণতন্ত্রের কথাই বলেছেন। বর্তমানে গণজ্ঞাপন চর্চায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্বের এক নতুন রূপরেখা পাওয়া যাচ্ছে। উদারনৈতিক তত্ত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতার জন্য বর্তমানে সমস্ত গণমাধ্যম বিজ্ঞাপন নির্ভর হয়ে উঠেছে। ভোগ্য পণ্যের বাজারে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের স্থান নেই। শুধুমাত্র শহরাঞ্চলের ধনীদের বাজারের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ হয়ে থাকছে। তাই সমস্ত বিজ্ঞাপনের চেহারা নাগরিক বা আরবান। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত শ্রেণি এবং মধ্যবিত্তদের বাজার নিয়েই গণমাধ্যম কাজ করে চলেছে। অথচ গণতন্ত্রের মূল পরিকাঠামো কিন্তু এইসব তথাকথিতভাবে ‘প্রান্তিক’ এবং খেটে খাওয়া মানুষদের হাতেই থাকে। উচ্চশ্রেণীর মানুষের নানান যুক্তি-বুদ্ধির জন্য একুশ শতকে দাঁড়িয়েও এই খেটে খাওয়া মানুষদের ‘প্রান্তিক’ হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়, জাত-পাতের হিসেব তুলে ভোটাধিকারেও অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না অনেক ক্ষেত্রে। ফলে তাদের চাহিদা, পাওয়া-না-পাওয়ার হিসেব অজানাই থেকে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। গণমাধ্যমের নীতিও এর ফলে ওপর থেকেই (Superficially) চালিত হয়। অথচ সাধারণ মানুষের জনজীবনক বুঝতে গেলে জনসংস্কৃতিকে বোঝা দরকার। আজ প্রান্তিক মানুষ এবং সংস্কৃতি বিপন্ন। ভাষা-সংস্কৃতি যদি বিপন্ন হয় তাহলে বুঝতে হবে জনজীবন বিপন্ন। বহুতত্ত্ববাদী ধারণাকে পুষ্ট করে ভাষা। সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে বজায় রেখে চললে গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে। মানুষ যদি নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারে তাহলেই গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে।

১.৬ জ্ঞাপনতত্ত্বের নানান মডেল

কোনো নতুন বিষয়কে সঠিকভাবে বোঝার জন্য মডেলের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ধারণাকে জ্যামিতিকভাবে উপস্থাপন করে ধারণাটিকে বুঝতে সহায়তা করে মডেল। এই এককে এতক্ষণ আমরা যে জ্ঞাপন নিয়ে নানান আলোচনা করলাম, সেই জ্ঞাপনকে সম্যকরূপে উপলব্ধির জন্য জ্ঞাপনতাত্ত্বিকদের প্রস্তাবিত একাধিক মডেল সম্পর্কে সংক্ষেপে অথচ স্বচ্ছভাবে আলোচনায় উপনীত হব।

- **একরৈখিক মডেল :** একে ইংরেজিতে বলা হয় ‘লিনিয়ার মডেল’; অর্থাৎ যে মডেলের একটি সরল রেখার মতো এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ধাবিত হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মডেল মূলত এই শ্রেণির যেখানে বার্তা দুটি প্রান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বার্তা চলে সরলরেখায়, এক

প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। একরৈখিক মডেলে প্রতিবার্তা পাওয়া যায় না। প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছেন কিন্তু গ্রাহক কোনো প্রত্যুত্তর পাঠাচ্ছেন না। জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে সবসময় বাঁধা থাকছে। বেতার এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যে জ্ঞাপন ঘটে তা একরৈখিক। এসব ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায় না। এই মডেলে প্রেরক, মাধ্যম ও গ্রাহক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রেরক বার্তা তৈরি করছে, বার্তার মধ্যে থাকছে প্রেরকের ভাবনা, চিন্তা এবং তথ্য। তারপর এই বার্তা কোনো একটি বিশেষ মাধ্যমের সাহায্যে গ্রাহকের কাছে পৌঁছচ্ছে। যেমন কথা, গান, লিখিত ভাষা প্রভৃতি। এই মাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এত বাঁধা বা 'নয়েজ' থাকার সম্ভাবনা বেশি। বাধা প্রযুক্তিগত কিংবা মনস্তত্ত্বগত দুই-ই হতে পারে। বেতার কিংবা টেলিভিশনের সম্প্রচারে বৈদ্যুতিন গোলযোগ প্রযুক্তিগত বাধা পর্যায়ে পড়ে, অন্যদিকে দুর্বোধ্য চিত্র কিংবা চলচ্চিত্রের মোটিভ মনস্তত্ত্বগত বাধার পর্যায়ে পড়ে।

- **অরৈখিক মডেল :** অরৈখিক জ্ঞাপন মডেলে রেখার আধিপত্য থাকে না। এখানে মানসিক গঠন অনেক বেশি প্রাধান্য পায়। যে-কোনো বিষয় মস্তিষ্কে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে তার ভূমিকা এই মডেলের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই মডেল হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। এই মডেলটিকে ইংরেজিতে সার্কুলার মডেলও বলা হয়। মনস্তত্ত্বের সঙ্গে এই মডেলের গভীর যোগ। কারণ, মূল্যবোধ এবং বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একটি বিশেষ বার্তার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। এই মডেলটির ভিত্তি হল মস্তিষ্ক। এক্ষেত্রে নিরন্তর প্রতিবার্তা পাওয়ার ফলে জ্ঞাপন ক্রিয়ায় আসে জটিলতা। যেখানে রেখা চক্রাকারে অথবা বিভিন্ন গতিতে এগোতে থাকে। কারণ প্রতিবার্তা প্রেক্ষাপটে নতুন মাত্রা যোগ করে। পরবর্তীকালে পরিপ্রেক্ষিত পালটে গেলে বার্তার ধরণও বদলে যায় এবং এই পরিবর্তনের প্রভাব সম্পূর্ণ জ্ঞাপন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। ফলে মনস্তাত্ত্বিক দিকটি এই ধরণের জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে কেন অধিক প্রাধান্য পায় সে বিষয়টি এর থেকে অনুধাবন করা সম্ভব।
- **মৌখিক মডেল :** মৌখিক মডেলের সংক্ষিপ্ত রূপ হল 'A verbal model is a word equalisation that represents a real situation'— এর অর্থ হল শব্দ কথা নির্মাণ করে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে পারে। তাই তৈরি হল মৌখিক মডেল। এই মডেলে পদ, সংখ্যার ব্যবহার হয়। উইল ডুরাণ্ট বলেছেন মানুষ প্রথম আদিম যুগে কথা বলতে শিখেছিল। এবং এই মুখের কথার কোনো সার্বজনীন রূপ নেই। কথার নির্মাণ হয় আঞ্চলিকতার প্রেক্ষায়। তাই অঞ্চলভেদে মুখের কথার রূপ যায় পালটে। আঞ্চলিকতার প্রভাব মুখের ভাষার সঙ্গে পড়ে জীবনযাপনেও। ফলে এসব দিক থেকে বিচার করা হওয়ার ফলে মৌখিক মডেল ভাষাতত্ত্বের চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মডেলটির মূল্যায়ণ করেছেন। ওয়েনস্টপ ইয়াংগার এবং টং বিভিন্ন ভাষাতত্ত্বের মূল্যের এবং পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনা ভাষাতত্ত্বের নিরিখে মডেলটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।
- **আইকনিক মডেল :** এই মডেল হল ডিজিটাল যুগের মডেল। আইকন হল প্রযুক্তিনির্ভর ভাষার

প্রতীক যা আন্তর্জাতিক স্তরে প্রায় সকলের বোধগম্য। প্রতীকের মধ্যে ভাষা সংযোগ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক জ্ঞাপনে আইকনিক মডেলের গুরুত্ব অপরিসীম। খুব দ্রুত কোনো বিষয়কে বোঝাতে এই জ্ঞাপন নতুন দিশা দেখায়। এক কথায় যেখানে ভাষা পৌঁছায় না সেখানে প্রতীক ভাষা খুব দ্রুত পৌঁছে যায় এবং এখানেই আইকনিক মডেলের সাফল্য।

- **অ্যানালগ মডেল :** অ্যানালগ হল প্রযুক্তিনির্ভর সম্প্রচার পদ্ধতি। এক্ষেত্রে প্রতীকের মাধ্যমে ক্রমাগত তথ্য প্রেরণ করা হয়। শব্দ, ছবি ও কথা নিয়ে তৈরি হয় তথ্য। বেতার কিংবা টেলিভিশনে এইভাবেই অ্যানালগ মডুলেশনের ব্যবহারে ঘটে তথ্য সম্প্রচার। এই মডুলেশন আবার হয় দুই ধরনের। যথা— Frequency Modulation বা FM এবং Amplititude Modulation বা AM। আবার অকে সময় সম্প্রচারে মডুলেশন না-ও থাকতে পারে। বেতার সম্প্রচারে FM এবং AM-এর প্রয়োগ হয়, এবং সম্প্রচার যখন বিস্তৃত জায়গার জন্য হয় তখন AM সম্প্রচারের সাহায্য নেওয়া হয়। সম্প্রচার ব্যবস্থাকে নিখুঁতভাবে বুঝতে অ্যানালগ মডেলের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।
- **অ্যারিস্টটল মডেল :** সবচেয়ে প্রাচীন জ্ঞাপন মডেল হল অ্যারিস্টটল মডেল। প্রায় ২৩০০ বছর আগে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তার 'Rhetoric' গ্রন্থে এই মডেলটির উল্লেখ করেছিলেন। এই মডেলে তিনি যে অত্যাবশ্যকীয় পাঁচটি উপাদানের উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি হল, বক্তা, বক্তৃতা, শ্রোতা, প্রভাব এবং উপলক্ষ্য। প্রাচীন গ্রিসের জ্ঞাপনচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল আলোচনার মধ্যে। যাকে বলা হয় ডিসকোর্স। অ্যারিস্টটল তৎকালীন গ্রিসে প্রচলিত নানান আলোচনাসভার প্রেক্ষিতেই তাঁর মডেলটিকে গড়ে তুলেছিলেন। এই মডেলটির উদ্দেশ্য ছিল বক্তাকে পরিস্থিতি বিশেষে বক্তৃতা প্রস্তুত করতে সহায়তা করা। শ্রোতার ওপর তাঁর বক্তৃতার কী প্রভাব পড়বে তা বিবেচনা করেই বক্তা তাঁর বলবার বিষয় এবং ধরণটি স্থির করবেন। আলোচনা সভার মধ্যেই এই মডেলের প্রাসঙ্গিকতা থাকার দরুণ আধুনিক জ্ঞাপন ক্রিয়াকে এই সরল একরৈখিক মডেলটির সাহায্যে বোঝা সম্ভব নয়।
- **লাসওয়েল মডেল :** হারস লাসওয়েল এই মডেলটির অবতারণা করেছিলেন ১৯৪৮ সালে। এই মডেলের মূল ছিল কে, কাকে, কীভাবে, কী মাধ্যমে, কী বললো এবং তাঁর ফলে কী প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠল—এই ছয়টি বিষয়। এই মডেল তথ্য প্রবাহকে বহুমুখী সমাজের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করে। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি মতামত ও ভাবনা প্রভাবিত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমের সাহায্যে। তথ্যের আদান প্রদানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের শ্রোতৃমণ্ডলী। বহুমুখী সমাজের প্রেক্ষাপটে জ্ঞাপনের বিচিত্র কার্যধারা বুঝতে এই মডেল সাহায্য করে। লাসওয়েল যখন এই তত্ত্বের অবতারণা করেন তখন তিনি রেখাচিত্রের সাহায্য নেননি। পরবর্তীকালে মাইকেল বুলার রেখাচিত্রের মাধ্যমে মডেলটিকে আরও উন্নত করেন। বুলারের রেখাচিত্রটিতে মডেলে ব্যবহৃত ছয়টি বিষয় যথাযথরূপে উপস্থাপিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রুজভেল্ট, চার্চিল, হিটলারের বক্তৃতা মানুষের কাছে কী বার্তা এনেছিল তা বিশ্লেষকরতে গিয়ে লাসওয়েল এই জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার সন্ধান পান। প্রাথমিকভাবে যা ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পরে তা-ই হয়ে ওঠে জ্ঞাপনচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ।
- **ওসগুড মডেল :** এই মডেলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বিরামহীন ক্রমশ নয়েজের পরিমাণ

কমতে থাকা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া। পরস্পরের জানার যত সুযোগ বাড়বে পরস্পরের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার তাগিদ বাড়বে। এর ফলে প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে দূরত্ব কমে আসবে। এই মডেল জ্ঞাপনের ধারণাকে আরও সুসংহত করে।

- **স্ক্রাম মডেল :** উইলবার স্ক্রাম ১৯৫৪ সালে এই মডেলটির অবতারণা করেন। এটি হল দ্বিমুখী চক্রাকার জ্ঞাপন যেখানে জ্ঞাপন ঘটে প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে। স্ক্রাম মূলত এনকোডিং ও ডিকোডিঙ্গের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই এনকোডিং এবং ডিকোডিং ব্যাপারটি জ্ঞাপনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। একজন ব্যক্তি কীভাবে এনকোড করছে এবং অন্যজন কীভাবে ডিকোড করছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এনকোডিং বার্তা তৈরি করে আর ডিকোডিঙে বার্তার পুনর্নির্মাণ ঘটে। সোজা কথায় এর অর্থ হল একজন বলছে এবং অন্যজন শুনছে। একজন যদি বলে আগুন এবং অপরজন বা গ্রহীতা যদি আগুনের তাৎপর্য বুঝতে পারে তাহলেই জ্ঞাপন সফল হবে। এই মডেল জ্ঞাপনকে বিরামহীন প্রক্রিয়া বলে ঘোষণা করে। স্ক্রাম বলেছেন বার্তার অর্থ Denotative এবং connotative দুই-ই হতে পারে। Denotative-এর অর্থ হল যে বিষয়টি গঠিত হচ্ছে তা যেন সকলের অনুধাবনযোগ্য হয় এবং connotative-এর অর্থ হল বিষয়টি সম্পর্কে এক ব্যক্তিভেদে অনুধাবন পৃথক হতে পারে। স্ক্রাম আরও বলেছেন প্রতিবার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যিনি বার্তা পাঠাচ্ছেন তাকে অবশ্যই প্রতিবার্তা পেতে হবে। এই প্রতিবার্তা না আসলে বার্তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। ফলে জ্ঞাপন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অর্থাৎ স্ক্রামের এই মডেলে প্রতিক্রিয়া একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। জ্ঞাপন ক্রিয়া অনুধাবনের ক্ষেত্রে মডেলটির অবদান গুরুত্বপূর্ণ।
- **গার্বনার মডেল :** জর্জ গার্বনার ১৯৫৬ সালে জ্ঞাপন ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন একটি মডেলের মাধ্যমে। তিনি জ্ঞাপন ক্রিয়ার মধ্যে যে উপাদানগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন সেগুলি হল উৎস বা Source, বিশেষ পরিস্থিতিতে উৎসের প্রতিক্রিয়া বা The source reacts to the event in a situation through some channel, এক বিশেষ পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বা subject matter in a given situation and perspective এবং জ্ঞাপনের পরিণতি বা Consequences of communication। গার্বনার জ্ঞাপনের বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জ্ঞাপন কেমন হবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে মূলত দুটি বিষয়ের ওপর—এক. প্রেরক বার্তা পাঠাচ্ছে, এবং দুই. গ্রহীতা তা গ্রহণ করছে। এই দুটি বিষয় ঘটছে এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে। পরিস্থিতি তৈরি হয় এটি বিশেষ প্রেক্ষাপটের আধারে। সংক্ষিপ্তাকারে গার্বনারের মডেলটিকে আমরা যেভাবে বুঝতে পারি তা হলো–কেউ একটি ঘটনাকে বুঝে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এবং তা ঘটে একটি মাধ্যমকে আশ্রয় করে।
- **বার্লো মডেল :** বার্লো SMCR মডেল জ্ঞাপন পদ্ধতিকে খুব সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে। মাত্র চারটি উপাদান পাওয়া যায় এই মডেলে। অবশ্য বিভিন্ন বিষয় এই উপাদানগুলিকে প্রভাবিত করে। ডেভিড বার্লো ১৯৬০ সালে এই মডেলটির অবতারণা করেন। জ্ঞাপনে তিনি চারটি উপাদানের

কথা বলেছেন। এগুলি হল উৎস (Source), বার্তা (Message), মাধ্যম (Channel) এবং গ্রহীতা (Receiver)। বার্লোর মতে মাধ্যমের কাজ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এগুলি হল দেখা, কানে শোনা, স্পর্শ, গন্ধ এবং স্বাদ। উৎস এবং গ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয় প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবের ব্যাপারে বার্লো বলেছেন বিশেষ কতকগুলি বিষয় বিজড়িত রয়েছে এক্ষেত্রে। এগুলি হল জ্ঞাপন দক্ষতা (Communication skills), দৃষ্টিভঙ্গি (Attitude), জ্ঞান (Knowledge), সামাজিক অবস্থা (Social system) এবং সংস্কৃতি (Culture)। বার্তার ক্ষেত্রেও কতকগুলি বিষয় বিবেচিত হয়, যে বিষয়গুলি আবার বার্তাকে প্রভাবিত করে। এগুলি হল উপাদান (Element), গঠন (Structure), বিষয়বস্তু (Content), প্রয়োগ (Treatment) এবং সংকেত (Code)।

- **শ্যামন ওয়েভার মডেল :** ১৯৫৯ সালে দুই ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সি. ই. শ্যানন এবং ওয়ারেন ওয়েভার জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে একটি মডেলের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন। এই মডেল রয়েছে তথ্যের উৎস, প্রেরক, গ্রহীতা এবং সবশেষে রয়েছে গন্তব্যস্থল। এদের মতে জ্ঞাপন ক্রিয়া চলে বামদিক থেকে ডানদিকে। একদম বাঁদিকে থাকে তথ্যের উৎস, তারপর থাকছে প্রেরক, তারপর গ্রহীতা এবং একেবারে ডানদিকে থাকছে গন্তব্যস্থল। প্রেরকের থেকে সংকেত যাচ্ছে গ্রহীতার কাছে এবং তারপরে তা চলে যাচ্ছে গন্তব্যস্থলে। প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বিবেচনা করেই এই মডেল তৈরি হয়েছে। প্রযুক্তি বার্তা প্রেরণের চরিত্র বদলে দিয়েছে। এভাবেই তৈরি হয়েছে নয়েজ। টেলিফোনে বা বেতারে বার্তা প্রেরণের সময় ফ্রিকোয়েন্সিতে নয়েজ তৈরি হতে পারে। এটিকে বলা যায় প্রযুক্তিগত সংযোগ-বিভ্রাট বা টেকনিক্যাল নয়েজ। আবার সেম্যানটিক নয়েজও ঘটতে পারে। প্রেরক বার্তা যে অর্থে প্রেরণ করছে গ্রাহক সে-অর্থটি অনুধাবন করতে পারছে না কিংবা বার্তার কোনো অর্থই অনুধাবন বা ডিকোড করতে পারছে না। ফলে এক্ষেত্রে ঘটছে সেম্যানটিক নয়েজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—জাপানি ভাষা জানা না থাকলে একজন ভারতীয়ের পক্ষে জাপানি কবিতার অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব নয়।
- **দ্যফ্ল্যর মডেল :** মেলভিন লরেন্স দ্যফ্ল্যর তাঁর মডেলটি শ্যানন ওয়েভার এবং ওয়েস্টলি ম্যাকলিনের মডেলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছিলেন। প্রেরক থেকে গ্রাহক এবং পুনরায় গ্রাহক থেকে প্রেরকের মধ্যে যে বৃত্তাকার জ্ঞাপন চলে তাকেই ব্যাখ্যা করে এই মডেল। 'mass media device'-এর উল্লেখ করা হয়েছে এই মডেলে। এই মডেলে পাওয়া যায় দ্বিমুখী প্রতিবার্তা প্রক্রিয়া। আমরা পূর্ববর্তী মডেলগুলির আলোচনা থেকে জানি শ্যানন ওয়েভার তাঁর মডেলে জ্ঞাপনর একমুখীনতার কথা বলেছেন যেখানে নয়েজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবার ওয়েস্টলি এবং ম্যাকলিন তাঁদের মডেলে দ্বিমুখী জ্ঞাপনের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে বার্তা শুধুমাত্র প্রতিবার্তা প্রস্তুত করছে না, সেটি নতুন প্রেক্ষিতে প্রেরকের কাছে ফিরে আসছে এবং আবার গড়ে তুলছে নতুন প্রেক্ষিত। ফলে একই বার্তার চেহারা বারংবার পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। দ্য ফ্ল্যর গন্তব্যস্থল বা ডেস্টিনেশনকে জ্ঞাপনের স্বতন্ত্র পর্যায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
- **দ্বি-স্তর প্রবাহ মডেল :** আমরা পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্রে উল্লেখ করতে পারি এই মডেলটিকে

কারণ আমরা জানি দ্বিস্তর প্রবাহ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র একেবারে পালটে যায়। শুধু হয় দ্বিমেরু রাজনীতি বা বাইপোলার পলিটিক্স। আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি নিয়ে তৈরি হয় একটি পক্ষ, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে নিয়ে তৈরি হয় সমাজতান্ত্রিক শিবির। শুরু হয় ঠাণ্ডা লড়াই। সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরোধ গোটা বিশ্বের রাজনীতিকে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই জটিল অবস্থায় গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা জনগণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাবকে গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। মানুষের মতামত অনুধাবনের জন্য পল লেজারস্ফেল্ড, বার্নার্ড বেরেলসন এবং হেজেল গডেট গবেষণা শুরু করেন। তাঁদের এই মিলিত প্রচেষ্টার ফল দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব। এঁরা বুলেট তত্ত্বকে অস্বীকার করে তৈরি করেন এই তত্ত্বটি। বুলেট তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল গণমাধ্যমের সমস্ত তথ্য একমুখী গতিতে দৃঢ়রূপে সরাসরি মানুষের মনে গেঁথে যাবে। কিন্তু লেজারফিল্ডরা দেখলেন গণমাধ্যমের বার্তা সরাসরি বুলেটের মতো জনগণের কাছে পৌঁছচ্ছে না। গণমাধ্যমের বার্তা প্রথমে যাচ্ছে জননেতাদের কাছে পরে তা যাচ্ছে জনগণের কাছে। অর্থাৎ বার্তাটি দুটি স্তর পেরোচ্ছে। ডয়েচম্যান ও ড্যানিয়েলসন বলেছেন যে দ্বি-স্তর প্রবাহ তত্ত্ব কিন্তু শেষকথা হতে পারে না। প্রাথমিক পর্যায়ে তার কিছুটা গুরুত্ব থাকলেও মানুষের চরণকে পুরোপুরি প্রভাবিত করতে পারে না। সবসময়ই গণমাধ্যমের তথ্য ওপিনিয়ন লিডারদের মারফৎ হচ্ছে, এমনটা নাও হতে পারে। কখনো কখনো বার্তা সরাসরি জনগণের কাছেও পৌঁছতে পারে।

- **নিউকম্ব মডেল :** লাসওয়েল, গার্বনার, শ্যানন ওয়েভার যে মডেলগুলির অবতারণা করেছিলেন সেগুলি হল প্রধানত রৈখিক মডেল। কিন্তু থিওডার নিউকম্ব যে মডেলটি গড়ে তুললেন তার চরিত্র পূর্ববর্তী মডেলগুলির তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক। সামাজিক প্রেক্ষায় তিনি জ্ঞাপনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক সম্পর্ক জ্ঞাপনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; এটি প্রমাণ করাই ছিল নিউকম্ব মডেলের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মডেল বলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে জ্ঞাপনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার কথা।
- **ওয়েসলি এবং ম্যালকিন মডেল :** বি. এইচ. ওয়েস্টলি এবং এম. এম. ম্যাকলিন ১৯৫৭ সালে এই মডেলটি পরিবেশন করেছিলেন। জ্ঞাপন কী এবং তার মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক আছে তা প্রমাণ করাই ছিল এই মডেলটির উদ্দেশ্য। মডেলটিকে ABX মডেলও বলা হয়। যেখানে X হল বিষয়, A হল প্রেরক এবং B হল গ্রাহক। বিভিন্ন উৎস থেকে উপকরণ গ্রহণ করে ধরা যাক X বিষয়ক বার্তাটি A প্রেরণ করছে B-এর উদ্দেশে। A-এর ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, যাপিত-জীবনের প্রভাব পড়ছে এই বার্তা গঠন ও প্রেরণের সময়। একইভাবে B-এর প্রতিবার্তাটি কতটা পরিবর্তিত হবে তা-ও নির্ভর করছে তার পরিবেশ, প্রতিবেশ, বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনার ওপর। পরে এই মডেলে C-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেখানে C গেটকিপারের ভূমিকা নেয়। জ্ঞাপনবিদ লিউইন C-কে নিয়ে আসেন গেটকিপারের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। গণমাধ্যমের দ্বারা

যে জ্ঞাপন হচ্ছে সেখানে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ গণমাধ্যমের প্রসার যত ঘটছে ততই গেটকিপার বা দ্বাররক্ষক হিসেবে C-এর ভূমিকা গুরুত্ব পেয়ে চলেছে।

- **ডান্স মডেল :** ফ্রাঙ্ক ডান্স ১৯৬৭ সালে এই মডেলটি উপস্থাপন করেছিলেন। ডান্স-এর বক্তব্য ছিল জ্ঞাপন সর্বদাই মানবিক। জ্ঞাপন যদি মানবিক হয় তাহলে তা কখনোই থামে না। চক্রাকারে চলতে থাকে। এই মডেলে ডান্স দেখিয়েছেন জ্ঞাপনের কোনো নির্দিষ্ট শুরু বা শেষ নেই। নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে জ্ঞাপন ক্রিয়া আবদ্ধ থাকে না। এখন যা ঘটছে তার সঙ্গে আগে ঘটে যাওয়া জ্ঞাপনের যোগ রয়েছে। ঠিক একইভাবে জ্ঞাপন ক্রিয়া ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন ক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে।

১.৭ প্রশ্নাবলি

১. জ্ঞাপন তত্ত্বের গুরুত্ব বিষয়ে উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

২. বহুস্তর প্রবাহ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩. দ্বি-স্তর প্রবাতত্ত্ব ও মডেলটির সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৪. দ্বার-রক্ষার তত্ত্ব বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৫. গণতন্ত্রে কৃতিত্ববাদী তত্ত্বের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৬. একরৈখিক ও অরৈখিক মডেল সম্পর্কে ধারণা দান করুন।

৭. নিউকম্ব ও ডান্স মডেল সম্পর্কে সবিস্তৃত আলোচনা করুন।

১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. Mass Communication Theory and Practice : Uma Narula

২. Communication Theory Today : Edited by David Cowley and Devid Michel

৩. গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী (অনুবাদ) : মেলদিন এলক ফ্ল্যার, সন্দ্রাবল রোকেশ (বাংলা আকাডেমি, ঢাকা)

৪. জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম — ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৫. গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি — ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

৬. PGJM 1A & B.

একক ২ ❑ গণজ্ঞাপনের উৎস

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ গণজ্ঞাপনের উৎস
২.৪ মুদ্রণ-তত্ত্ব
২.৫ সংক্ষিপ্তসার
২.৬ প্রশ্নাবলি
২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককে আপনারা গণজ্ঞাপনের নানান তত্ত্ব ও মডেল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ স্বচ্ছ ধারণা লাভের সুযোগ পেয়েছেন। বর্তমান একককটি রচনার উদ্দেশ্য এই গণজ্ঞাপনের নানান উৎসগুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। পূর্ববর্তী এককগুলির মতোই এই এককের উপান্তেও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অনুশীলনযোগ্য প্রশ্নাবলি ও গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে।

২.২ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী এককগুলির সূত্রে আমরা জেনেছি জ্ঞাপন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা নানান তথ্য প্রেরণ এবং গ্রহণ করি, আমাদের ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করি এবং এই ক্রমাগত প্রকাশ ও তথ্য আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে আমরা মানবজাতি সমাজে নানান সম্পর্ক স্থাপন করি ও সেই সম্পর্কগুলিকে রক্ষা করে চলি। আমরা জেনেছি জ্ঞাপনের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Communication' যার উৎপত্তি দুটি লাতিন শব্দ থেকে। এর একটি হল 'Communis' এবং দ্বিতীয়টি হল 'Communicate'। লাতিন Communis' - হল একটি বিশেষ্যপদ যার অর্থ হল সাধারণ বা ভাগ করে নেওয়া বা ইংরেজিতে

বললে এর অর্থ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি 'Common or Sharing'। অন্যদিকে 'Communicare' শব্দটি একটি ক্রিয়াপদ যার অর্থ হল কোনো কিছুকে সাধারণ করে তোলা বা 'making something common'। ফলে জ্ঞাপন যেখানে একটি শতাব্দী-প্রাচীন প্রক্রিয়া সেখানে এই এককে সেই প্রক্রিয়ার নানান উৎসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২.৩ গণজ্ঞাপনের উৎস

জীবজগতের উৎসকাল থেকেই শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদ থেকেই প্রতিটি সপ্রাণ জীব নিজেদের মধ্যে জ্ঞাপন রক্ষা করে চলে। জ্ঞাপনতন্ত্র অনুসারে অনুসারে বা ইউনেস্কোর মতে, "Communication is part of the very fabric of society. It takes place at all levels at all levels between people and between institutions, from government to people, to people to government. And through many channels both interpersonal and medicted."

এর পূর্ববর্তী এককগুলিতে জ্ঞাপনের অর্থ সম্পর্কে যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা প্রদানের প্রচেষ্টা পাওয়া গেছে, ফলে এই এককে নতুন করে সেই একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি থেকে অব্যাহত থাকা গেল। ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞাপন কী এবং কেন—এই দুইয়ের উত্তর অন্বেষণের জন্য পূর্ববর্তী এককগুলির পুনঃপাঠের নির্দেশ করা হচ্ছে। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো প্রাণ ধারণের প্রাথমিক চাহিদাগুলিরই সমতুল্য হল জ্ঞাপন বজায় রাখা। ইতিহাসের দিক থেকে একদম আদিমযুগের দিক যদি আমরা দৃষ্টিক্ষেপ করি তাহলে জানতে পারব যে আমাদের পূর্বপুরুষগণের শুধুমাত্র দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ এবং ঘ্রাণ গ্রহণের ক্ষমতা ছিল। ৭০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ এই আদিম মানুষেরা একধরনের চিত্রসম্বলিত বর্ণদ্বারা নিজেদের মধ্যে জ্ঞাপন রক্ষা করার পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সম্পর্কিত ধারণা ও প্রয়োজন দুই-ই পরিবর্তিত হতে থাকে। সমাজকে সংঘবদ্ধ রাখা এবং জ্ঞাপন রক্ষা করার একটি চাহিদা ক্রমে গড়ে ওঠে যা পূরণ করা সম্ভব হয় জ্ঞাপনের দ্বারা।

গণজ্ঞাপনের ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন যে নয় তা আমরাও ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে জানি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞাপন পদ্ধতি ক্রমে বিবর্তিত হয়ে প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক গঠনতন্ত্রের প্রতি গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

গণমাধ্যমের প্রাচীনতম রূপগুলির মধ্যে গ্রন্থ যে অন্যতম তা আমরা ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে জানি। ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে বিশ্বের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় প্রাচীন মিশরে। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থকে গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব নয় যেহেতু এই গ্রন্থ গণের উদ্দেশে প্রচারিত হয়নি। গ্রন্থের পরে গণমাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে থাকল সংবাদপত্র। সংবাদপত্র কিংবা গ্রন্থের তুলনায় বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলির মধ্যে বেতারযন্ত্র এবং টেলিভিশন দ্রুত বিবর্তিত হয়। গণমাধ্যমের নবতম সংযোজন আন্তর্জাল বা ইন্টারনেট পরিষেবা যা যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে নতুনতর গণমাধ্যমগুলি নিজেদের বিবর্তিত ও উন্নত করে ধ্রুপদী গণমাধ্যমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চলেছে।

সামাজিক বিবর্তন ও পরিবর্তন সবসময়ই গণমাধ্যমের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। শিল্পবিপ্লবের সময়কালে শিক্ষা এবং পরিবহণ ব্যবস্থার অগ্রগতির সমান্তরালে অবসরকালের বৃদ্ধি ও নগরায়নের ফলে সংবাদপত্র এবং গ্রন্থসহ অন্যান্য গণমাধ্যমের চাহিদা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তথ্য ও বিনোদনের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধির সঙ্গে সমান্তরালে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বিংশ শতাব্দীর বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের সৃষ্টির পথকে প্রশস্ত করেছিল। এরই ফল স্যাটেলাইট যোগাযোগ এবং আধুনিক ইন্টারনেট পরিষেবা। শুরুর দিকের একদম সরলতম মুদ্রিত গণমাধ্যম থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের ডিজিটাল সংযোগ ব্যবস্থা—এই পরিবর্তন ও বিবর্তন বস্তুত পক্ষে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত পরিবর্তিত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চাহিদার ফল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একাধারে যেমন পুরাতন এবং নতুন প্রযুক্তির মিশ্রণের ফলে গণমাধ্যমের প্রভূত বিবর্তন এবং পরিবর্তন ঘটেছে তেমনই এই পরিবর্তন ঘটেছে নবতম প্রযুক্তির সঙ্গে মিশ্রণের ফলেও।

আধুনিক গণজ্ঞাপনের ইতিহাসের সূচনা ঘটেছে ১৫০০ শতকে জোনাথেন গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের পরে। যদিও সংবাদত্র ১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দেই আবিষ্কৃত হয়েছিল, কিন্তু অন্যান্য গণমাধ্যমগুলি চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে মোটের ওপর ৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। ফলে এই হিসেব থেকে আমরা বুঝতে পারব গণজ্ঞাপনের ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয়।

গণমাধ্যমগুলির মধ্যে বই হল প্রাচীনতম। ২৪০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দের প্রাচীন ব্যাবিলনে প্রথম মাটির ট্যাবলেটে আইনি-সিদ্ধান্ত এবং অর্থনৈতিক হিসেবনিকেশের বিষয়ে কিউনিফর্ম অক্ষের তথ্য লেখা হত। ৭০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে মাটির ট্যাবলেটে লেখা সাহিত্যকীর্তিগুলিসহ একটি গ্রন্থাগারের হদিশ পাওয়া যায়। ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মিশরে প্যাপিরাস জাতীয় কাগজের পূর্বরূপের হদিশ মেলে। প্রথম গ্রন্থ হিসেবে মিশরে 'মৃতের গ্রন্থ' বা 'Book of the Dead'-এর উল্লেখ করা যায় যা ১৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল। বইকে প্রাচীনতম মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও প্রাচীনতম গণমাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সংবাদপত্রকেই। সংবাদপত্রই প্রথম মাধ্যম যা শ্রেণি-নির্বিশেষে গণের মধ্যে চূড়ান্ত প্রচার লাভ করে গণতন্ত্রের অন্যতম নির্দর্শন হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। বিভিন্ন সরকারের তরফ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-পত্র এবং প্রতিবেদনগুলি আধুনিক সংবাদপত্রের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে প্রথম দিকের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। আনুমানিক ১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ রোমের সরকারের পক্ষ থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয় যা 'Acta Diurna' বা 'Daily Actions' নামে পরিচিত। চিনের ট্যাং রাজবংশের পক্ষ থেকেও ব্লক প্রিন্টে প্রাসাদের খবরাখবর প্রকাশ করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। এর থেকে আমরা সংবাদপত্রের উদ্ভব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

আনুমানিক ৪০০ থেকে ৫০০ বছর আগে ইউরোপে সংবাদপত্রের পথ চলা শুরু হয় রাজনৈতিক পুস্তিকা এবং ক্রোড়পত্রের প্রচলনের মধ্য দিয়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের মালিকানা, ধরন, গঠন এবং প্রকৃতি ক্রম-পরিবর্তিত হয়। মতামত গড়ে তোলার আয়ুধ হিসেবে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

সংবাদপত্রের পরে গণজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে বেতারের উদ্ভব হয়। ১৮৯৮ সালে গুলিয়েলমো মার্কনি সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক বেতার পরিসেবার সূচনা করেন। এর পূর্ব পর্যন্ত শ্রেণি, জাতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানের মাধ্যম হিসেবে বেতারের প্রয়োগ ছিল। পরবর্তীতে

বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেও বেতারের প্রয়োগ হতে থাকে। ১৯৩৩ সালে এডুইন হোয়ার্ড আর্মস্ট্রং FM (Frequency Modulated) চালিত বেতারের উদ্ভাবন করেন। এই উদ্ভাবন যান্ত্রিক এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দ্বারা গড়ে ওঠা বাধা বা 'নয়েজ'-কে এড়িয়ে উন্নততর বেতার তরঙ্গ পরিবহনের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এই FM চালিত বেতারের বিপুল জনপ্রিয়তার পরবর্তীতে স্যাটেলাইট দ্বারা পরিচালিত বেতারের প্রয়োগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে আমরা আমাদের ইলেকট্রনিক যন্ত্রে বা মোবাইলে অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োগের মাধ্যমে বেতারে সম্প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুনতে পারি। ভৌগোলিক অবস্থান বর্তমানে বেতারে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান শোনার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধাই নয়।

বেতারের পরে গণজ্ঞাপনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা যায় টেলিভিশনকে। ১৯৩২ সালে NBC সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে তাদের সম্প্রচার শুরু করে। জন বেয়ার্ড এই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রযুক্তি ক্রমোন্নত হতে থাকে এবং আমাদের সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। গণজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন জনগণের সাংস্কৃতিক প্রলক্ষণগুলির আমূল পরিবর্তন ঘটায়। দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম হওয়ার দরুণ এটি জনগণকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দিক থেকে প্রভাবিত করতে থাকে। বিগত কয়েক দশকে তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে সাধারণ জনগণের টেলিভিশনের প্রতি নির্ভরতা কয়েকগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। টেলিভিশন সংবাদের প্রচার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদের সম্পূর্ণ নতুন এক সংজ্ঞার সম্মুখীন হয়েছি আমরা। ২৪*৭ এর সংবাদ সম্প্রচারের পর থেকে সংবাদ পরিবেশনার ধরণ এবং সংবাদের ধরণ ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

১৯৬০ সালে ইন্টারনেট বা আন্তর্জাল একটি ধারণা হিসেবে প্রথমবারের জন্য পরিবেশিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটের প্রয়োগ বহুরৈখিক ও বহুকৌণিক হতে থাকে। বর্তমানে আমরা এমন একটি সমাজে বাস করছি যা ইন্টারনেটের প্রয়োগ ব্যতীত অসম্পূর্ণ। আমেরিকার সামরিক বিভাগের দ্বারা অর্থায়িত ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), প্রথম প্যাকেট সুইচিং পদ্ধতির প্রয়োগ করে একটি লেখক নেটওয়ার্কে একাধিক কম্পিউটারকে যোগাযোগ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য। এটিই প্রথম ইন্টারনেটের ধারণার সূচনা করে। ১৯৬৯-এর ২৯ অক্টোবর এটির দ্বারা একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে প্রথমবারের জন্য একটি বার্তা প্রেরণ করা হয়। ১৯৭০ সালে দুই বৈজ্ঞানিক রবার্ট কান এবং ভিন্টন সার্ফ ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল এবং ইন্টারনেট প্রোটোকলের উন্নতি সাধন করার পরে এই প্রযুক্তিটি ক্রমোন্নতি লাভ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা এমন একটি সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে জীবনের একটি পদক্ষেপও ইন্টারনেটের প্রয়োগ ব্যতীত অসম্ভব বলে মনে হয়।

বিগত কয়েক বছরে ডিজিটাল বিপ্লবের ফলস্বরূপ সমস্ত বিশ্বে আমূল পরিবর্তন এসেছে। শিল্পবিপ্লবের পরে এই ডিজিটাল-বিপ্লব মানব-সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। আক্ষরিক অর্থে ডিজিটালাইজেশনের অর্থ যে কোনো তথ্যকে ডিজিটাল বা কম্পিউটার পাঠযোগ্য বিন্যাসে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া এবং সেই সমস্ত তথ্যকে কম্পিউটার পাঠযোগ্য ক্ষুদ্রতম একক বিটে পরিবর্তিত করা। বর্তমানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিত্যনতুন ডিজিটাল প্রযুক্তির গ্রহণ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ফলে নিঃসন্দেহে বলা

যায় এই ডিজিটালাইজেশন সত্যিই সমগ্র বিশ্বে এক বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছে। ইন্টারনেট এবং প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যাভ্যাস, পরিবহণ এবং শিক্ষার মতো মৌলিক বিষয় থেকে শুরু করে বিনোদনের এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। জীবন-যাপনের ধরণ থেকে শুরু করে সংযোগরক্ষা করার ধরণ এবং উন্নতিসাধনের ধরণ—সমস্ত কিছুই পূর্বের তুলনায় আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে ভৌগোলিক দূরত্ব সংযোগ রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোনো বাঁধাই নয়। বর্তমানে কোনো জিনিস কেনার জন্য কিংবা জীবিকার অন্বেষণের জন্য আমাদের আর শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকবার প্রয়োজন পড়ে না।

বদলে যাওয়া গণজ্ঞাপনের ধরণের প্রভাব আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। গণজ্ঞাপনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের ধরণেও পরিবর্তন এসেছে। এই বিষয়টি ক্রমাগত উন্নতির সঙ্গে আমাদের সামনে নিত্য-নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে চলেছে। মানব ইতিহাস যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমাদের গণজ্ঞাপনের উৎস সম্পর্কেও জানতে হবে। একমাত্র তখনই আমরা উপলব্ধি করব যে জীবনযাপনের এই ক্রম-বিবর্তন আসলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছিল।

২.৪ মুদ্রণ তত্ত্ব

১৯২০-র দশকের শেষ দিকে ইউরোপ কিছু ক্ষেত্রে 'ম্যানিউপুলেটড মিডিয়া' বা 'স্বকার্যে নিয়োজিত গণমাধ্যম'-এর প্রয়োগের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। এটি ছিল একটি নির্দিষ্ট দেশের কিছু মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ মানসিকতা গড়ে তুলেছিল। সেই সময়ের বিশেষজ্ঞগণ জনগণের উপর গণযোগাযোগের প্রভাব সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সাধারণ তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রভৃতি গণ যোগাযোগ এবং মানুষের মধ্যে মতামত গড়ে ওঠার কার্য ও কারণ অন্বেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

মান-নির্ণায়ক তত্ত্বগুলির খুব আদর্শায়িত একটি পদ্ধতি রয়েছে। তারা রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং গণমাধ্যমের কার্যকারিতার মধ্যে সম্পর্ক অন্বেষণ করার প্রচেষ্টা নেয়।

ফ্রেড্রিক সিবার্ট, থিওডোর পিটারসন এবং উইলবার শ্রামের দ্বারা রচিত "Four Theories of The Press." গ্রন্থে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং গণমাধ্যমের কার্যপদ্ধতির সম্পর্কগুলিকে উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। মুদ্রণ ব্যবস্থা বা প্রেসের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কগুলিকে বিশ্লেষণের জন্য এই গ্রন্থে চারটি তত্ত্বের প্রতি দিকনির্দেশ করা হয়।

- **কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব (Authoritarian Theory) :** এই তত্ত্বটি ১৬ এবং ১৭-র দশকের ইউরোপের অর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল। গ্রিক দার্শক প্লেটোর 'দ্য ফিলোসফার কিং' গ্রন্থের তত্ত্ব ছিল এই তত্ত্বটির মূল প্রেরণাস্বরূপ। এই তত্ত্ব অনুসারে, রাষ্ট্র বা শাসক শ্রেণির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও গণমাধ্যমকে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। এই তত্ত্বটি বিশ্বাস করে যে অর্থ এবং বুদ্ধিগতভাবে শক্তিশালী অভিজাতবর্গের উচিত জনগণকে পথ প্রদর্শন করা বা উপদেষ্টার ভূমিকা নেওয়া। এই গণমাধ্যমগুলির উচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক-নৈতিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে আহত না করা। এই ধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রেসের ভূমিকা হয় জনসাধারণের

কাছে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে পৃথকভাবে উপস্থাপিত করা। এই ধরনের সামাজিক ব্যবস্থায় প্রেসের সহযোগিতা কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ডিভাইসের প্রয়োগ করা হয়। এই তত্ত্বের মূল নীতিগুলি হল—

১. গণমাধ্যমের এমন কিছু করা উচিৎ নয় যা সমালোচনামূলক হওয়ার সমান্তরালে ক্ষতি এবং কর্তৃত্বকে হ্রাস করতে পারে।

২. রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য গণমাধ্যমকে সর্বদা তার অধীনস্থ হিসেবে কাজ করতে হবে।

৩. গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে 'সেন্সরশিপ' ন্যায্য হতে পারে।

৪. সাংবাদিকসহ অন্যান্য গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার ব্যক্তিরা কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবেন না।

- **মুক্ত সংবাদতত্ত্ব (Free Press Theory) :** মুদ্রিত গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাবাদী তত্ত্বগুলি ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে ধীরে ধীরে বিকশিত হলেও কার্যকর হতে শুরু করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে। এই তত্ত্বটি মিল্টন, মিল, লক এবং জেফারসনের মতো ব্যক্তিত্বদের কাজের থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই তত্ত্বে যে বিষয়টির প্রতি জোর দেওয়া হয় তা হল সত্যের অনুসন্ধানে ব্যক্তির প্রাকৃতিক অধিকার। এটি ব্যক্তিগত প্রকাশের মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব অনুমান করে যে একটি চূড়ান্ত সত্যকে খুঁজে পেত হলে নাগরিককে একটি সমস্যার দিক বা দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে জানতে হবে। এখানে ব্যক্তিই সর্বোচ্চ উচ্চতায় বিরাজ করে। এই মুক্ত সংবাদতত্ত্ব অনুযায়ী গণমাধ্যমগুলির কর্মে হস্তক্ষেপ না করার মধ্যে দিয়েই সরকার জনগণের সর্বোচ্চ সেবা করতে পারে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী :

১. যে কোনো প্রকাশনা পূর্বের কোনো 'সেন্সরশিপ' থেকে মুক্ত হওয়া উচিৎ।

২. সরকারের সমালোচনা শাস্তিযোগ্য হওয়া উচিৎ নয়।

৩. বিশেষ কোনো তথ্য প্রকাশ করা কিংবা চাপা দিতে বাধ্য করা চলবে না।

৪. সাংবাদিকদের তাদের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করা উচিৎ।

- **সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব (Social Responsibility Theory) :** এই তত্ত্বটি এক 'মুক্ত এবং দায়িত্ববান' মুদ্রিত গণমাধ্যমের প্রতি আলোকপাত করে। এই তত্ত্বটি হাচিনসের 'A Free and Responsible Press : A General Report on Mass Communication, Newspaper, Radio' থেকে উদ্ভূত হয়। হাচিনসের বক্তব্যটি মূলত মুদ্রিত গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। গবেষণার উপান্তে হাচিনসের কমিশন আবিষ্কার করে যে আমেরিকার প্রেসগুলি বাণিজ্যিক সাফল্যকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক দায়-দায়িত্ব রক্ষা করার বিষয়টি থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। এই কমিশন আরও দেখে যে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর তথ্যগত এবং সামাজিক চাহিদা পূরকরতে পারেনি। এই তত্ত্বটি বলে যে সমাজের প্রতি মিডিয়ার কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তাই এরজন্য সত্য, নির্ভুলতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং

ভারসাম্যের উচ্চ পেশাদার মান প্রয়োজন। গণমাধ্যমগুলিকে বাণিজ্যিক স্বার্থের তুলনায় জনস্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

- **সোভিয়েতের কমিউনিস্ট তত্ত্ব (Soviet Communist Theory) :** এই তত্ত্বটি আসলে পুরাতন কর্তৃত্ববাদী তত্ত্বেরই একটি বিস্তার। মুদ্রিত গণমাধ্যম বা প্রেস কীভাবে কাজ করবে তার নিয়মনীতির বিষয়টি মার্কসবাদী মতাদর্শ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তাদের মতে শাসক শ্রেণীর ধারণা প্রকৃতপক্ষে শাসন করার ধারণারই নামান্তর। সুতরাং, শাসকশ্রেণী যদি গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে তবে তারা সেটা করবে একমাত্র নিজেদের সুবিধার্থেই। তাই গণমাধ্যমকে শ্রমিক শ্রেণীর দ্বারা পরিচালনা করতে হবে, একমাত্র তাহলেই মিডিয়া সমাজের সেবা করতে সক্ষম হবে। মিডিয়ার প্রাথমিক কাজগুলি হল;

  ১. অবহিতকরণ

  ২. শিক্ষাদান

  ৩. অনুপ্রাণিত করা

  ৪. নাগরিকদের সংগঠিত করা

  ৫. সর্বত্র প্রগতিশীল আন্দোলনকে সমর্থন করা।

১৯৮০ সালে ডেনিস ম্যাককুয়েল আরও দুটি তত্ত্বকে যুক্ত করেছিলেন যা এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশগুলির পরিস্থিতি বিবেচনায় সহায়তা করে। এই তত্ত্বগুলি হল উন্নয়ন যোগাযোগ তত্ত্ব (Development Communication Theory) এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ তত্ত্ব (Democratic Participant Theory)। এই দুই তত্ত্বই বাণিজ্যিকীকৃত এবং পণ্যীকৃত মিডিয়ার কার্যকারিতার থেকে মুক্ত হয়ে আসে। এই দুই তত্ত্ব গণমাধ্যমের উন্নয়নমূলক ভূমিকার প্রতি আলোকপাত করে।

২.৪ সংক্ষিপ্তসার

- গণযোগাযোগের ইতিহাস খুব বেশি প্রাচীন নয়।
- সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গণযোগাযোগের বিভিন্ন রূপ বিকশিত হয়েছে এবং মানবজাতির প্রযুক্তিগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রবণতার উপর একটি অসাধারণ প্রভাব ফেলেছে।
- সামাজিক পরিবর্তন সবসময় গণমাধ্যমের বিকাশকে প্রভাবিত করেছে।

২.৫ প্রশ্নাবলি

- **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. গণযোগাযোগ এবং রেডিও প্রযুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে মার্কনির অবদানের গুরুত্বটি বিশ্লেষণ করুন।

২. গণযোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের ভূমিকাটি আলোচনা করুন।

● **দীর্ঘ প্রশ্ন :**

১. মুদ্রিত গণমাধ্যমের চারটি তত্ত্ব আলোচনা করুন।

২. কর্তৃত্ববাদী তত্ত্ব বলতে কী বোঝেন আলোচনা করুন।

৩. সামাজিক দায়বদ্ধতার তত্ত্ব বলতে কী বোঝেন আলোচনা করুন।

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১. Mass Communication in India (4th Edition)—Keval J Kumar.

২. Mass Communication : An Indian Perspective—Subir Ghosh.

৩. Communication Models—Uma Nurula.

৪. Introduction to Communication Studies—John Fiske.

৫. Mass Communication Theories—Denis Maquail.

৬. গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি—ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—লিপিকা।

৭. জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম—ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—লিপিকা।

একক ৩ ❑ গণজ্ঞাপনের ধরন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ গণজ্ঞাপনের উপাদান

৩.৪ গণজ্ঞাপনের ধরন

৩.৫ সংক্ষিপ্তকরণ

৩.৬ প্রশ্নাবলি

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককগুলিতে আপনারা গণজ্ঞাপনের নানান তত্ত্ব ও মডেল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ স্বচ্ছ ধারণা লাভের সমান্তরালে গণজ্ঞাপনের উৎসগুলি সম্পর্কে জানবার সুযোগ পেয়েছেন। বর্তমান এককটি রচনার উদ্দেশ্য এই গণজ্ঞাপনের নানান ধরনগুলি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা। পূর্ববর্তী এককগুলির মতোই এই এককের উপান্তেও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে অনুশীলনযোগ্য প্রশ্নাবলি ও গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩.২ প্রস্তাবনা

আমরা গণজ্ঞাপন সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছি এবং এর উপাদানগুলি অনুধাবনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ভিত্তিতে তাদের শ্রেণিবিভাগও করেছি। এই এককের আমরা আলোকপাত করব গণজ্ঞাপনের ধরনের প্রতি। আমরা গণজ্ঞাপনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অধ্যয়ন করব। গণজ্ঞাপনের প্রকৃতি সম্পর্কে উন্নততর পাঠগ্রহণের জন্য এর দুই মৌলিক উপাদান গণ এবং জ্ঞাপন মাধ্যমকে বিশ্লেষণ করা উচিৎ।

৩.৩ গণজ্ঞাপনের উপাদান

গণজ্ঞাপনের উপাদানগুলি হল—

● **গণ (The Mass) :** গণজ্ঞাপনে 'গণ'-এর ধারণাটিকে একটি বিশাল, বৈচিত্র্যময়, বিবিধ এবং অজ্ঞাত দর্শক এবং শ্রোতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। 'বিশাল' অর্থাৎ, আমরা দর্শকদের নির্দিষ্ট সংখ্যা গণনা করতে পারি না। এই সংখ্যাটি একটি বৃহৎ সংখ্যা হলেও এরমধ্যে সমস্ত গণ (১০০%) অন্তর্ভুক্ত না-ও হতে পারে। 'বৈচিত্র্য' অর্থাৎ, গণমাধ্যমের দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে একই সঙ্গে অবস্থান করে ধনী, দরিদ্র, কৃষক, আমলাদের সুবিশাল একটি সংখ্যা। 'বিবিধ' অর্থাৎ, গণমাধ্যমের দর্শক এবং শ্রোতৃবর্গ একই ভৌগলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তারা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি সংবাদপত্র বিভিন্ন পরিসরের ব্যক্তিবর্গ পাঠ করেন। 'অজ্ঞাত' অর্থাৎ, আমরা নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট করতে পারি না একটি সংবাপত্রের পাঠকবর্গকে। আজ যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট সংবাদপত্র পাঠ করছেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পছন্দ পরিবর্তিত হতে পারে, তিনি অন্য একটি সংবাদপত্র পড়তে পারেন বা সংবাদমাধ্যম দেখতে/শুনতে পারেন। প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমগুলির ব্যবহার করেন। গণজ্ঞাপনের মাধ্যম বা চ্যানেলগুলি একটি বৃহৎ সংখ্যক গণের মধ্যে বৃহৎ আকারে সংবাদ, বিনোদন সামগ্রী এবং অন্যান্য দৃশ্যপণ্য প্রস্তুত এবং সম্প্রচার করে।

● **জ্ঞাপনমাধ্যম (Mass Media) :** গণমাধ্যমগুলিকে তাদের প্রকৃতি অনুসারে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলি হল,

● মুদ্রিত গণমাধ্যম, যার মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, সাময়িকীপত্র এবং বই।

● বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম, যার মধ্যে রয়েছে বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন।

● ডিজিটাল মাধ্যম বা 'New Media'.

অন্য যে কোনো সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের থেকে গণমাধ্যমগুলি আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে অনেকবেশি প্রভাবিত করে। এগুলি সমাজে সংবাদ এবং বিনোদন সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অন্যতম মুখ্য উৎস হিসেবে কাজ করে। এগুলি আমাদের ক্রয় আচরণ, ভোট দেওয়ার ধরনসহ আমাদের জীবনের অন্যান্য নানান দিককে গভীরবাবে প্রভাবিত করে। গণমাধ্যমের এই বৃহৎ প্রভাবের কারণে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীসহ সরকারী সংস্থাগুলি জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য গণমাধ্যমগুলির উপর নির্ভরশীল। নির্বাচনের সময় রাজনীতিবিদেরা গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমে কার্যকর প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ব্যয় করেন। বিশ্বব্যাপী কর্পোরেট সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপনসহ নিজেদের পণ্য ও পরিসেবা প্রচারের জন্য গণমাধ্যমগুলির পেছনে লক্ষ কোটি অর্থ ব্যয় করে। কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের চাহিদা, সুবিধে, অভিযোগ ও ইচ্ছা প্রকাশের জন্য সাধারণ মানুষ গণমাধ্যমগুলির উপর নির্ভরশীল। সরকারী কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমের মাধ্যমে তাদের নাগরিকদের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে অবহিত করে। সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের সমাজে গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা সর্বব্যাপী। গণমাধ্যমকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে উইলবার শ্রাম উল্লেখ করেছেন, "a mass medium is essentially a working group organized around some device for circulating the same message,

at about same time, to a large group of people," অর্থাৎ, গণমাধ্যম হল এমন একটি কার্যকরী গোষ্ঠী যা একই বার্তা মোটামুটি একই সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে প্রচার করতে সহায়তা করে। এই সংজ্ঞা আমাদের জানায় যে প্রতিটি জ্ঞাপন মাধ্যমের পশ্চাতে একটি করে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা কাজ করে। একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের পেছনে স্থানীয় সাংবাদিক থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের সামগ্রিক প্রয়াস ও তথ্য সরবরাহের বিষয়টি কাজ করে। সংবাদপত্র প্রচারের ক্ষেত্রেও এই পরিকল্পনার অন্যথা হয় না। একটি সংবাদপত্রের প্রচারের পথ সুগম করার পেছনে সম্প্রচার পরিচালক থেকে শুরু করে সংবাদপত্র বিতরণকারী সাধারণ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই জড়িত। গণমাধ্যমের সহায়তায় গণজ্ঞাপনের বিষয়টি একটি বৃহৎ সংখ্যক মানুষের মধ্যে সম্পন্ন হয়। এঁরা দর্শক হিসেবে চিহ্নিত হন। গণমাধ্যমগুলি পর্যাপ্ত সংখ্যক দর্শক ব্যতীত অচল। এবং এই বিষয়টি আমাদের বার্তা প্রচারকারী ডিভাইসগুলির প্রতি আলোকপাতে সহায়তা করে। এই ড়িভাইসগুলি হল প্রযুক্তিগত মাধ্যম যার মারফত দর্শকদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। এই ডিভাইসগুলির অন্তর্গত হল মুদ্রিত নথি, টেলিভিশন, বেতার, ইন্টারনেট প্রভৃতি।

৩.৪ গণজ্ঞাপনের ধরন

ভৌত রূপ, জড়িত প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রক্রিয়ার ধরনের উপর ভিত্তি করে গণজ্ঞাপনের ধরনগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। নিচে গণমাধ্যমগুলির প্রধান বিভাগগুলি আলোচিত হল।

● **মুদ্রিত গণমাধ্যম (Print Media) :** পঞ্চদশ শতাব্দীতে জোহানস গুটেনবার্গের দ্বারা উদ্ভাবিত বহনযোগ্য ধাতব 'টাইপ' বা লিপিরর সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রিত গণমাধ্যমের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। চলনযোগ্য লিপির প্রয়োগ করে ছাপাখানা প্রথম পাঠ্যের ব্যাপক উৎপাদন শুরু করে। ছাপাখানা আবিষ্কারের পূর্বে বইয়ের মূল্য ছিল আকাশছোঁয়া এবং শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তিদেরই সামর্থ্যে সেগুলি কুলোতো। মুদ্রণ ব্যবস্থা বইয়ের খ রচ হ্রাস করার সমান্তরালে সাধারণের সামর্থ্যের আওতায় আনে। অতিদ্রুত পাঠ্যের একাধিক কপি মুদ্রণের বিষয়টি ক্রমে আধুনিক সংবাদপত্র উদ্বাবনের দিকটিকে ত্বরান্বিত করে। মুদ্রিত গণমাধ্যমের অন্তর্গত হল সংবাদপত্র, পত্রিকা, বই, পাঠযোগ্য বিভিন্ন নথি প্রভৃতি।

● **বৈদ্যুতিন মাধ্যম (Electronic Media) :** বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম শব্দটি প্রধানত বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং দৃশ্যশ্রাব্য রেকর্ড বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ১৮৯৫ সালে মার্কোনির বেতারযন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের চেহারার আমূল পরিবর্তন হয়। ১৯২০ সালে প্রথম বেতার স্টেশনগুলি স্থাপিত হয়েছিল পিটসবার্গ, নিউ ইয়র্ক এবং শিকাগোতে। ইউরোপের দেশগুলিও সংবাদ সম্প্রচার ও বিনোদনের জন্য রেডিও স্টেশন চালু করে। ইংলন্ড এবং ফ্রান্সের মতো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি বিশ শতকে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে রেডিও স্টেশন স্থাপন করার ফলে এরা খুব বেশি পিছিয়ে থাকেনি। বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের ইতিহাসে সবথেকে বড় উল্লম্ফন ছিল চলচিত্রের উদ্ভব। চলচ্চিত্রের পরে ১৯২০-র দশকে পরীক্ষামূলকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের জন্য টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়। কিন্তু ১৯৫০-এর

দশক থেকে টেলিভিশনের চমকপ্রদ প্রভাব লক্ষিত হতে থাকে। একই সময়ে, পশ্চিমের দেশগুলির রেকর্ডিং ব্যবসা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

● **নতুন গণমাধ্যম (New Media) :** এতে ডেস্কটপ, বহনযোগ্য ও তারহীন ডিভাইসের ব্যবহার জড়িত। ডিজিটাল বিশ্বে জ্ঞাপনের উপায়গুলির মধ্যে রয়েছে সিডি-রম, ডিভিডি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মতো ইন্টারনেট সুবিধা ইত্যাদি।

আধুনিক ভোগবাদী সমাজে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গণমাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। মানুষ নানাবিধ তথ্যের উৎস হিসেবে দৈনিক সংবাদপত্রের উপর নির্ভর করে এবং এর ভিত্তিতে তারা তাদের মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গণমাধ্যমে প্রচারিত তাই যেকোনো বার্তা তাই সমগ্র সমাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। পাঠক, শ্রোতা এবং দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রতিটি গণমাধ্যম একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। বিজ্ঞাপন এবং স্পনসরশিপ থেকে আয় দর্শক সংখ্যার সমানুপাতিক হওয়ার দরুণ সংবাদপত্র সংস্থা এবং টেলিভিশন স্টেশনগুলির কার্যকারিতা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য গণমাধ্যমগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে অন্যান্য পরিকল্পনার দিকে ঝুঁকছে যার মধ্যে রয়েছে বিনোদন, কেলেঙ্কারি তৈরি করা, ভীতি ছড়ানো প্রভৃতি। বর্তমান সময়ে গণমাধ্যমগুলির ক্ষেত্রে যোগ্যতমের টিকে থাকার বিষয়টি সুপ্রযুক্ত হয়। বর্তমানে গণজ্ঞাপন আমাদের সমাজের অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠেছে। গণমাধ্যম ছাড়া আমাদের জীবন কল্পনা করা বর্তমানে কঠিন। তারা আমাদের আধুনিক করতে, আমাদের মতামত গঠন করতে সহায়তা করে। গণমাধ্যমগুলি যখন সমাজে বিদ্যমান রীতিনীতি, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিল রেখে তথ্য সংগ্রহ ও বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে তখনই গণমাধ্যমের প্রভাবকে গঠনমূলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গণজ্ঞাপনের বার্তা সাধারণত ইতিবাচক হয়। এগুলি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, শান্তি, অসামাজিক মন্দ অভিপ্রায় ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বার্তা প্রদান করে। গণমাধ্যম সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দর্শকদের মনে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। জনসেবামূলক সম্প্রচার ব্যাপকভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে, সামাঝিক পরিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য গণমাধ্যমগুলি ব্যবহৃত হয়। চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগুলি যাদের সঙ্গে প্রত্যহ আমাদের দ্বন্দ্ব চলে তাদের প্রত্যক্ষ করতে সহায়ক হয়। এগুলি সমগ্র দেশে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রচার করে। গণমাধ্যম জাতির অগ্রগতিতে ব্যাপক অবদান রাখার সমান্তরালে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক হলেও আধুনিক টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মতো গণমাধ্যমগুলির কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। বিনোদনের নামে যা কিছু সম্প্রচার করা হচ্ছে তার মধ্যে সহিংসতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি সবই পরিবেশিত হচ্ছে যা দর্শকরা দেখছেন এবং কিছু সংখ্যক দর্শক সেই নেতিবাচকতার দ্বারা প্রভাবিতও হচ্ছে। এছাড়া বিজ্ঞাপন তরুণ মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। যাকিছু অপ্রত্যাশিত এবং নিষিদ্ধ সেসবের প্রতিই অধিকাংশ সময়ে তাদের মন আকৃষ্ট হয় যার থেকে হিংসা এবং অপরাধপ্রবণতার জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অতিরিক্তি টেলিভিশন দেখার ফলে বেশ খিছু স্বাস্থ্য সমস্যাও দেখা যায়। বর্তমান বিশ্বে গণজ্ঞাপন আমাদের জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এবং সামাজিক মূল্যবোধকে প্রতিফলিত করে, তবে এই প্রভাবগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অর্থরাজনৈতিক কারণগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকে।

৩.৫ সংক্ষিপ্তকরণ

গণজ্ঞাপনকে একটি সাধারণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের পদ্ধতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

● গণজ্ঞাপন হল একটি বার্তাকে একটি বর্ধিত গোষ্ঠীর মধ্যে স্বল্পব্যয়ে অতি দ্রুত সম্প্রচারের পদ্ধতি।

● গণজ্ঞাপনের প্রধান মাধ্যমগুলি হল, মুদ্রিত গণমাধ্যম, বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম এবং নিউ মিডিয়া।

● গণমাধ্যমগুলিকে তাদের ভৌত রূপ, জড়িত প্রযুক্তি এবং জ্ঞাপন প্রক্রিয়ার ধরনের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যস্ত করা যায়।

৩.৬ প্রশ্নাবলি

● সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. টীকা লিখুন :

ক. মুদ্রিত গণমাধ্যম

খ. বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম

গ. নিউ মিডিয়া

২. ‘গণ’ বলতে কী বোঝেন?

● দীর্ঘ প্রশ্ন :

১. গণজ্ঞাপনের বিভিন্ন ধরনগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. নিউ মিডিয়ার বিবর্তন এবং সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. Mass Communication in India (4th Edition)—Keval J Kumar.

২. Mass Communication : An Indian Perspective—Subir Ghosh.

৩. Communication Models—Uma Narula.

৪. Introduction to Communication Studies—John Fiske.

৫. Mass Communication Theories—Denis Maquail.

৬. জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম—ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—লিপিকা

৭. গণমাধ্যম সমাজ সংস্কৃতি—ডঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য—লিপিকা।

মডিউল ৩

দৈনন্দিন জীবনে গণমাধ্যম ও গণজ্ঞাপনের প্রভাব

একক ১ ❑ গণমাধ্যম ও সমাজ

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ গণমাধ্যমের প্রকৃতি
১.৪ সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব
১.৫ গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি
১.৬ গণমাধ্যমের ব্যবহার
১.৭ সারাংশ
১.৮ অনুশীলনী
১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককে গণমাধ্যমের সঙ্গে সমাজের আলোচনা করা হবে। এই সম্পর্কে নানা স্তর আছে। বিভিন্ন পরিসর আছে। সামাজিক প্রভাব কতটুকু সেটাও দেখা হবে। আরও নানা আনুষঙ্গিক বিষয় যা গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। আলোচ্য বিষয়গুলি হল :

- গণমাধ্যমের প্রকৃতি
- গণমাধ্যমের ব্যবহার
- সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব
- গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি

১.২ প্রস্তাবনা

সমাজের সঙ্গে গণমাধ্যমের যোগ নিবিড়। যতদিন যাচ্ছে প্রভাব আরও বাড়ছে। প্রযুক্তির অসামান্য অগ্রগতি গণমাধ্যমকে গুণগত দিক দিয়ে অনেক উন্নত করেছে।

১.৩ গণমাধ্যমের প্রকৃতি

গণমাধ্যমের একটি আবশ্যিক উপাদান হল যন্ত্রনির্ভরতা। যন্ত্রকে আশ্রয় করে গণমাধ্যম বাস্তবায়িত হয়। মুদ্রণযন্ত্র সংবাদপত্র তৈরি করে, বেতার ও টেলিভিশন সম্প্রচারে টান্সমিটার অন্যান্য যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।

গণমাধ্যমের বার্তা হবে নৈবর্ত্তিক। বহু মানুষের কাছে একই বার্তা পৌঁছে যায়। বার্তার সুর একই রকম হয়। ধরে নেওয়া হয় এই বার্তা বহু মানুষের কাছে উপযোগী বলে গৃহীত হবে। গণমাধ্যমের প্রকৃতির আরকেটি বৈশিষ্ট্য হল গণজ্ঞাপনের বার্তা তৈরি হয় পরিকল্পিতভাবে। ভেবে চিনতে সময় নিয়ে পরিকল্পিত বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হয় বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে।

১.৪ সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব

ব্যক্তি ও সমাজ, এই দুটি বিষয় সম্পৃক্ত হয়ে আছে জ্ঞাপনে। কথা বলা, কথা শোনা ঘটছে একটা সামাজিক প্রেক্ষায়। জ্ঞাপনের যত কিছু সবই সামাজিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে যথাযথ সম্মান দিয়ে চলছে। এটাই সভ্যতা, জ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে সামাজিক অগ্রগতি। যদি বলা যায় জ্ঞাপনই হল সমাজের চালিকা শক্তি তাহলে কোনভাবেই তা বেশি করে বলা হবে না। পারস্পরিক তথ্য ও মত বিনিময় যত বেশি হবে সমাজের সম্পৃক্ততা ততো বেশি প্রকট হবে।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন মানুষ হল সামাজিক জীব, যুথবদ্ধভাবে বেঁচে থাকতে চায়, আর এই জীবনযাপনের ভিত্তি হল জ্ঞাপন। মানুষ কথা বলে, ভাব বিনিময় করে, নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। গ্রিক দার্শনিকেরা পায়চারি করতে করতে মানুষকে বাড়ির তত্ত্বের কথা বলতো। যেমন সক্রেটিস, দার্শনিক উপলব্ধির কথা সহজ সরল ভাষায় বলতেন। মানুষ সেসব শুনতো। আবার এ সব কথা শাসকদের মনঃপুত হয়নি। তাই তাকে বিষপান করে মরতে হয়েছিল। আসলে সক্রেটিসের দ্বারা মানুষ গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল বলেই শাসকরা ভয় পেয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় মৌখিক জ্ঞাপন সে সময় কত শক্তিশালী ছিল।

সংবাদপত্র সমাজের উপর যে বিপুল প্রভাব ফেলে তা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। হরিশ মুখার্জীর হিন্দু প্যাট্রিয়ট নীল আন্দোলন নিয়ে তৎকালীন সমাজকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো জনমানসে জাতীয়বাদী চেতনার বিকাশে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্তমানেও নির্বাচনের সময় সংবাদপত্রের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।

১৯৩০ সালে হিটলারের বেতার বক্তৃতা শুনে জার্মানরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিল। বিশ্বযুদ্ধের সময় চার্চিলের বেতার বক্তৃতা ব্রিটেনের মানুষকে সাহস ও আস্থা জুগিয়েছিল। পরাধীন ভারতে নেতাজি সুভাষ বসুর গোপন বার্তার জন্য মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। এ বার্তা পরাধীন ভারতের মানুষকে দেশাত্মবোধের প্রেরণা জোগাত। সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর প্রভাব বেতার। যারা পড়তে পারে না তাঁরাও বেতার অনুষ্ঠান শুনে উপভোগ করতে পারে। ভারতের মত দেশে যেখানে নিরক্ষরতা ও দারিদ্রতা এক বিরাট সমস্যা সেখানে বেতারের মতো গণমাধ্যম খুবই উপযোগী। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও নিরক্ষর গ্রামবাসীর কাছেও পৌঁছে যেতে পারে বেতার। পরিবার পরিকল্পনার বার্তা, নূন্যতম স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশ পাঠিয়ে মানুষের গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

টেলিভিশন আবার পর জনজীবনে গণমাধ্যমের প্রভাব এক নতুন মাত্রা পায়। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখার জন্যও লেখাপড়া জানতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নিরক্ষর মানুষও টেলিভিশন দেখে উপভোগ করতে পারে। দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম হিসেবে মানুষের কাছে টেলিভিশনের আবেদন রয়েছে। কথায়, ছবিতে,

হুবুহু জীবন যেরকম তার চিত্রায়নে টেলিভিশন অনের জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষের মনে, চিন্তায় ও আচরণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে। দেহ, মন আচ্ছন্ন হয়েছে ছোটপর্দার জাদুতে। ম্যাকলুহানের কথায় মাধ্যম নিজেই বার্তা হয়ে উঠেছে। মানুষের মধ্যে ভোগপ্রবণতা, উচ্চাকাঙ্খা বাড়িয়ে তুলেছে।

ডিজিটাল মিডিয়া আসার পর গণমাধ্যমের সঙ্গে সমাজের যোগ আরও নিবিড় হল। ল্যাপটপ, মোবাইলে ক্লিক করলেই গুগল আমাদের সামনে বিপুল তথ্য হাজির করছে। কম্পিউটার প্রযুক্তি সমাজের চালচিত্র একেবারে বদলে দিয়েছে। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল ভাবনা, চিন্তা, কল্পনার পরিসর ছোট হয়ে যাচ্ছে। এখন সবকিছুই ইন্টারনেটে ক্লিক করলেই হাথের মুঠোয় আমার কাঙ্খিত বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখার প্রবণতা বাড়ছে।

আজকের গণমাধ্যমের যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, তাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পরিবেশ, বিশেষ করে সেই পরিবেশ যা টেকসই, কার্বন নিঃসরণ না কমলে সামনে বড় বিপদ। সমুদ্রের জলে উষ্ণতা বাড়ছে। আবহাওয়ার মারাত্বক পরিবর্তন হচ্ছে। ইউরোপের দেশগুলোয় তাপমাত্রা ৪৬, ৪৭ ডিগ্রী ছুঁয়ে ফেলেছে। গণমাধ্যমকে পরিবেশ রক্ষায় অগ্রণী হতে হবে।

প্রথমদিকে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন মানুষের আচার আচরণে গণমাধ্যমের প্রভাব খুবই সামান্য। ১৯৪০ সালে পল লাজারসফেল্ড এবপং বার্নাড বেরেলসন অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেন মানুষের আচরণের ওপর গণমাধ্যমের প্রভাব খুবই সামান্য। তাঁরা দেখেছেন আগে থেকেই মানুষের মনের মধ্যে যে সব ধারণা রয়েছে তাকেই কেবলমাত্র পরিপুষ্ট করছে গণমাধ্যম। যেমন কোন বিষয়ের প্রতি মানুষের যদি বিরূপতা থাকে, তবে এই বিরূপতা বাড়িয়ে দিতে পারে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের এই স্বল্প প্রভাবকে তাঁরা minimal effects বলে অবিহিত করেছিলেন।

বর্তমানে গণমাধ্যমের প্রভাব কিন্তু minimal effects-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ডিজিটাল মিডিয়া আসার পর এই প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ গণমাধ্যমের প্রভাবের ওপর পড়েছে। তাঁরা দেখেছেন মানুষের আচরণ, বিশ্বাসে এমনকি ব্যক্তিগত অনুভবেও গণমাধ্যমের প্রভাব রয়েছে। মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক সচেতনতা তৈরি করতে গণমাধ্যম তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও সাম্প্রতিক কালে ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবস্থা মানুষের আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

সামাজিক প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হল ভোগবাদের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও টেলিভিশন পণ্য সংস্কৃতির বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, টেলিভিশন ও ডিজিটাল মাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞাপন মানুষের মধ্যে তীব্র আকাঙ্খাবোধ তৈরি করে। বিজ্ঞাপিত পণ্যের জন্য সৃষ্টি হয় চাহিদা। বিজ্ঞাপন দেখে মানুষ যেমন বিচিত্র পণ্যসম্ভার সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে, তেমনি পণ্য কেনবার জন্য মানসিক দিক থেকে প্রভাবিত হচ্ছে। এভাবেই ভোগবাদের প্রসারে বিজ্ঞাপন সাহায্য করছে।

শুধু বিজ্ঞাপন নয়, গণমাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়বস্তুর মধ্যেও এমন বিষয় থাকছে যা মানুষকে উৎসাহ করছে ভোগবাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে। ফ্যাশন, খাওয়াদাওয়া, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর প্রাত্যহিক কাজের সরঞ্জাম নিয়ে বহু লেখা প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে ও সাময়িকপত্রে। এই সব রচনার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে মানুষের মধ্যে। টেলিভিশনের যেসব অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তার মধ্যেও থাকে ভোগবাদের উৎসাহিত হওয়ার মালমশলা। দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যমের জাদুর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে যায় মানুষের মনে। মানুষের মনের

মধ্যে তৈরি হয় আরও ভালোভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছে। জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার বাসনা জাগ্রত হয়। গণমাধ্যমের কাছ থেকেই মানুষ পেয়েছে উন্নত জীবনযাত্রার সূত্র। ক্রমাগত ফ্রিজের বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে ফ্রিজ কেনার ইচ্ছে জাগাটা খুবই স্বাভাবিক।

গণমাধ্যম জনশিক্ষায় প্রসার ঘটিয়ে সমাজ জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্র ও টিভি স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ রক্ষা প্রকৃতি বিষয়ে রচনা ও অনুষ্ঠান প্রচার করে সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করে তোলে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতেও গণমাধ্যমের ভূমিকা রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মূল্যবোধের যোগ রয়েছে। টিভি সিরিয়াল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে। বিশেষ করে শিশুদের উপর ডিজিটাল মিডিয়া বিপুল প্রভাব বিস্তার করছে। অ্যাকশন ও ভায়োলেন্সর বাড়াবাড়ি শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলে। শিশুর স্বাভাবিক আচরণ বিকাশের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন গবেষণায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১.৫ গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতি বলতে প্রচলিত আমরা বুঝি গান, বাজনা, নাটক, চলচ্চিত্র, নানা-আঙ্গিকের নৃত্যশিল্পী অথবা সংস্কৃতি বলতে বুঝি সংস্কৃত মানুষের আচরণ। অর্থাৎ সভ্যতা, আদাব-কায়দা, এবং দেশজ রীতি-নীতি ইত্যাদি। কিন্তু পাশ্চাত্য সংজ্ঞানুসারে মানুষের সমস্ত জীবনচর্চাই সংস্কৃতি।

'সংস্কৃতি' শব্দটি জ্ঞানের পরিধি, লোককাহিনী, ভাষা, নিয়ম, আচার, অভ্যাস, জীবনধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস এবং রীতিনীতির জটিল সংমিশ্রণকে বোঝায় যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের সাথে সংযুক্ত ও তাদেরকে একটি সাধারণ পরিচয় দেয়।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'সংস্কৃতি হল সভ্যতা তরুর পুষ্প। ফুল দিয়ে যেমন গাছ চেনা যায়। তেমনি সংস্কৃতি দিয়ে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগ নিবিড়। সংস্কৃতি রূপ দেখে চেনা যায় সমাজকে। যেমন বাঙালি সমাজ চেনা যায় বাঙালি সংস্কৃতি দিয়ে। পয়লা বৈশাখ, দুর্গাপূজা, জামাই ষষ্ঠীর মধ্যে লুকিয়ে আছে বাঙালি সংস্কৃতি। এর পরিচয় যদি বুঝতে পারো তাহলে বাঙালির পরিচয় বোঝা হবে সহজ।

বাংলা ভাষায় যে সমস্ত গণমাধ্যম কাজ করছে তাদেরকে বুঝতে হবে বাংলার সংস্কৃতিকে। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও সাম্প্রতিককালের ডিজিটাল মিডিয়া এক বড় সংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে। আজ আমরা তথ্য সমাজের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আলভিন টফলার এই তথ্য সমাজকে সুপার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি বলে অবিহিত করেছেন।

ডিজিটাল মিডিয়া আসার পর সমাজ জীবনের ধারা অনেকটাই বদলে গেছে। সমাজ চেতনা বিকাশে সোশ্যাল সাইট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ব্লগ, টুইটার, ফেসবুক, হোয়াটসপ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করছে। রাজনৈতিক, সামাজিক স্তরে সংগঠিত করছে আন্দোলন।

গণসংস্কৃতি

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যত বিরাট ও জটিল হয় উঠছে তত বেশি করে মানুষ গণমাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। আধুনিকযুগে গণমাধ্যমের প্রচার ও প্রভাব উর্ধমুখী।

শিল্প বিপ্লবের হাত ধরে জনসমাজে আধুনিকতার শুরু। তারপর যতদিন যায় ততই সমাজে রূপান্তর ঘটতে থাকে। এই রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে সমাজের যে চরিত্র লক্ষণ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেই সমাজকে সমাজতত্ত্ববিদরা চিহ্নিত করছেন 'গণ-সমাজ' বা Mass Society বলে। সংস্কৃতি তারই এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় গণ-সমাজের নির্ধারক ভূমিকায় থাকে তার নিজস্ব সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি কিছু আচরণ ও বিশ্বাসের সমষ্টি। এই আচরণ ও বিশ্বাসই এক সমাজকে আরেক সমাজ ঠিক আলাদা করে। এই আচরণ ও বিশ্বাস সমাজ বংশ পরম্পরায় তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যায়। সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে রূপান্তরিত সংস্কৃতি সমস্ত সমাজেই জন্ম নিতে পারে। ফলে যে সমাজের দরজা যত বেশি খোলা, সেই সমাজের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের হার তত বেশি। এই সাংস্কৃতিক রূপান্তর প্রক্রিয়া মানুষকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলে।

একটি সমাজ বিভিন্ন উপসংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত। সমাজে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন গণসংস্কৃতির উৎপাদন ও ভোগ পৃথকীকৃত। যারা এই সংস্কৃতির প্রযোজনা বা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত তাঁরা নিজেরা তা ভোগ করেন না। গণসংস্কৃতি একান্তভাবেই দর্শক-শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য।

গণ-উৎপাদনের ফলে উৎপাদিত দ্রব্যেও ভারসাম্য আনা হয়। এই ভারসাম্য আনা হয় ক্রেতা সাধারণের রুচি, পছন্দ, অভ্যাস ইত্যাদি চরিতার্থ করার জন্য। এই চাহিদামূলক প্রকরণগুলির উপর নির্ভর করে দ্রব্যের মান ও প্রকৃতি।

এই সংস্কৃতিতে ব্যক্তি বিশেষ নয়, বরং জনগণের প্রশংসার ওপর নির্ভর করে সাংস্কৃতিক সাফল্য।

গণসংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা এবং জনসাধারণের ভাললাগাই জীবনের নৈতিক ও নান্দনিক মান বলে বিবেচিত হয়। শিক্ষায় লোকেরা থাকেন। এঁরা নানান উপসংস্কৃতির অন্তর্গত। ফলে গণসংস্কৃতি হল ব্যক্তির সেই সব ধ্যান ধারণা ও আচরণ যা এই সব উপসংস্কৃতিক অতিক্রম করে চলে যায়। অর্থাৎ সমস্ত উপসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা যাতে এই সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করতে পারেন।

গণসংস্কৃতির উদাহরণ :

যে কোন গণপন্য, যেমন টেলেভিশন, মোটরগাড়ি, ঘর সাজাবার আসবার পত্র। যে কোন গণ বিনোদন যথা ফুটবল, ক্রিকেট আধুনিক গান ইত্যাদি।

গণসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য :

সমাজতত্ত্ববিদরা গণসংস্কৃতিক কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। সে গুলি হল—গণসংস্কৃতির প্রাথমিক শর্তই হল গণ-বিনোদন। ফলে জনসাধারণের সাধারণ রুচিকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তৈরি হয় গণ-বিনোদন। আর যে জন্য সাধারণের দাবি ও প্রত্যাশা পূরণের সমস্ত কলা ও শিল্পকে নতুন করে সাজাতে হয়।

গণসমাজ গণজ্ঞাপন নির্ভর। গণসংস্কৃতির বাহকও তাই গণজ্ঞাপন।

গণবিনোদন গণমাধ্যমকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। সাধারণের রুচি অনুসারে গণমাধ্যমগুলি তাঁদের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে থাকে।

১.৬ গণমাধ্যমের ব্যবহার

সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট নির্ভর সোশ্যাল সাইটগুলি মানুষ ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে। কী উদ্দেশ্যে কখন কীভাবে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করছে মানুষ সেটা জানা গেলে গণমাধ্যমের সামাজিক ভূমিকা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে।

গণমাধ্যম ব্যবহারে সুফল এবং কুফল দুটি দিকই রয়েছে। গণমাধ্যম ব্যবহার করে মানুষ যখন শিক্ষিত হয় তখন তা হল সুফল, আর যখন শিশুরা টেলিভিশন দেখে হিংসার প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন তা হল কুফল।

গণমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কতগুলি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিষয়গুলি হল-১, ব্যক্তিগত স্তরে ব্যবহার, ২ পারিবারিক স্তরে ব্যবহার, ৩ প্রকাশ্যস্তরে ব্যবহার। মানুষ যখন শুধুমাত্র নিজের প্রয়োজনে একেবারে নিজস্বভাবে সংবাদপত্র পড়ে, রেডিও শোনে তখন সেটা ব্যক্তিগত স্তরে ব্যবহার বলা হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে যখন টেলিভিশন দেখা হয় তখন ঘটে পারিবারিক স্তরে ব্যবহার। আবার অনেক সময় প্রকাশ্যে মাধ্যমের ব্যবহার ঘটে, যেমন সিনেমা দেখা, অডিটোরিয়ামে গিয়ে সংগীতানুষ্ঠান শোনা বা নাটক দেখা।

কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা অন্য মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। একেবারে ব্যক্তিগত স্তরে বিপুল স্বাধীনতার সঙ্গে পছন্দমাফিক ব্যবহারের সুযোগ। ডিজিটাল মিডিয়া পুরোপুরি ইন্টার আক্টিভ। সোশ্যাল সাইট যেমন হোয়াটস্যাপে, চ্যাট করা যায়, টুইটারে মন্তব্য করা যায়।

১.৭ সারাংশ

এই এককে গণমাধ্যমের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এই সম্পর্কে নানা স্তর আছে। বিভিন্ন পরিসর আছে। সামাজিক প্রভাব কতটুকু সেটাও দেখা গেল। আরও নানা আনুষঙ্গিক বিষয় যা গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়গুলি ছিল :

- গণমাধ্যমের প্রকৃতি
- গণমাধ্যমের ব্যবহার
- সমাজে গণমাধ্যমের প্রভাব
- গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি

১.৮ অনুশীলনী

● ছোট প্রশ্ন :

১। সংস্কৃতি বলতে কী বোঝেন?

২। সংক্ষেপে বলুন গণসমাজ কী?

● টীকা লিখুন :

১। গণসংস্কৃতি

২। গণমাধ্যম

৩। গণমাধ্যমের প্রকৃতি

● বড় প্রশ্ন :

১। গণমাধ্যম কাকে বলে? ব্যাখ্যা করুন।

২। গণমাধ্যমের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

৩। সংস্কৃতির সঙ্গে গণমাধ্যমের যোগ কী? আলোচনা করুন।

১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। চট্টোপাধ্যায়, পার্থ । গণজ্ঞাপন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

২। ভট্টাচার্য, বৈদ্যনাথ। জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম। লিপিকা

৩। Ghosh, Subir. Mass Communication Today, Profile Publishers.

৪। Mcquail, Denis. Mass Communication Theory. SAGE.

একক ২ ❑ সংস্কৃতি ও জ্ঞাপনের সম্পর্ক

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ সংস্কৃতির বিকাশ
২.৪ জ্ঞাপন এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক
২.৫ সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য
২.৬ সংস্কৃতি জ্ঞান ও জ্ঞাপন
২.৭ সংস্কৃতির ও জ্ঞাপনে প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা
২.৮ জ্ঞাপন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন অনুসন্ধান
২.৯ উপসংহার
২.১০ সারাংশ

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা সংস্কৃতি ও জ্ঞাপনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করবো। আজকের বিশ্বায়িত সমাজে, কার্যকর যোগাযোগ এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক দক্ষতার জন্য সংস্কৃতি এবং যোগাযোগের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝা এবং উপলব্ধি করা অপরিহার্য। এটির জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক রীতি নীতি সম্পর্কে শিখতে এবং সেই আচার ও রীতিকে সম্মান করতে এবং সেই অনুযায়ী যোগাযোগের শৈলীগুলি মানিয়ে নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠা প্রয়োজন। যোগাযোগ বা জ্ঞাপন যেমন একদিকে সাধারণ মানুষকে অর্থ তৈরি করতে, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিকাশ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বোঝাপড়া তৈরি করতে সুবিধা করে দেয়, তেমনি, সংস্কৃতি কীভাবে ভাষা, প্রতীক এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ব্যক্তিরা অর্থ ব্যাখ্যা করে এবং অর্থ প্রকাশ করে তার জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ করে। এই এককে আমরা সংস্কৃতি ও জ্ঞাপনের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের প্রভাব ও সংস্কৃতি এবং যোগাযোগের মধ্যের সংঘর্ষ বিষয়েও আলোচনা করবো।

২.২ প্রস্তাবনা

সংস্কৃতি এবং যোগাযোগ অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। সংস্কৃতি হ'ল মূল্যবোধ, বিশ্বাস, অনুশীলন এবং রীতিনীতিগুলির একটি জটিল সংমিশ্রণ যা একে অপরের চিন্তাভাবনা, আচরণ এবং সম্পর্ককে বিশেষভাবে আকার দেয়। আরেকদিকে, যোগাযোগ বা জ্ঞাপন হ'ল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য, ধারণা এবং অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার প্রক্রিয়া। সংস্কৃতি সাধারণ মানুষে যেভাবে একে অপরের সাথে তথ্য ও ভাব আদানপ্রদান করে তাকে প্রভাবিত করে তেমনি ভাবে যোগাযোগের সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং রীতিনীতিগুলিকেও প্রভাববিত করে। সুতরাং, কার্যকর সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমির লোকদের সাথে অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সংস্কৃতি এবং জ্ঞাপনের মধ্যের সম্পর্ক উপলব্ধি করা অপরিহার্য। আজকের বিশ্বায়িত সমাজে, যেখানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আরও বেশি করে প্রকট হয়ে উঠছে, সেখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষমতা ক্রমবর্ধমানভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসাবে বিবেচিত হয়।

২.৩ সংস্কৃতির বিকাশ

''সংস্কৃতি'' শব্দটি জ্ঞানের পরিধি, লোককাহিনী, ভাষা, নিয়ম, আচার, অভ্যাস, জীবনধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস এবং রীতিনীতির জটিল সংমিশ্রণকে বোঝায় যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের সাথে সংযুক্ত ও তাদেরকে একটি সাধারণ পরিচয় দেয়।

সমস্ত সামাজিক সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি বিকশিত করে। এমনকি দুইজন ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যেও সময়ের সাথে সাথে তাদের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যেমন দুজন মানুষের ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব কিংবা আবেগপ্রবণ প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যেখানে দুই ব্যক্তির তাদের নিজস্ব অতীত, তাদের অভিজ্ঞতা ভাষা, আচার, অভ্যাস এবং রীতিনীতি তৈরি করে আর এই রীতিনীতিগুলি সম্পর্কটিকে একটি বিশেষ চরিত্র দেয় এমন একটি চরিত্র যা তাকে অন্যান্য সম্পর্কের থেকে ভিন্ন করে বা আলাদা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিশেষ তারিখ, স্থান, গান বা কিছু ঘটনাসমূহ যা দুটি ব্যক্তির জন্য অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু তারা কিছু প্রতীকী অর্থ তাদের কাছে নিয়ে আসে। একই রকম ভাবে গোষ্ঠীগুলিও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ করে, যা নিয়ম, আচার, রীতিনীতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সংগ্রহের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং সামাজিক পরিচিতি গড়ে তোলে। সংস্থাগুলিরও নিজের সংস্কৃতি রয়েছে, যা প্রায়শই তাদের পোশাকের নির্দিষ্ট প্যাটার্ন, কর্মক্ষেত্রের বিন্যাস, মিটিং শৈলী এবং নেতৃত্বের পদ্ধতি, সংগঠনের প্রকৃতি এবং ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ইত্যাদির দ্বার স্পষ্ট হয়।

সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং জটিল সংস্কৃতি হল সেগুলি যেগুলি একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত। 'সংস্কৃতি' শব্দটি সাধারণত ভাষা এবং ভাষা-ব্যবহারের ধরণ, আচার, নিয়ম এবং রীতিনীতি সহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। একটি সামাজিক বা জাতীয় সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চরিত্র, সরকারের

ধ্যানধারণা, সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক অনুশীলন, ধর্ম, অর্থনৈতিক দর্শন এবং অনুশীলন, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং আইনের ধারণা ও ব্যবস্থার মতো উপাদানগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

যে কোনও সামাজিক ব্যবস্থা তা একটি সম্পর্ক, গোষ্ঠী, সংস্থা বা সমাজ যাই হোক না কেন সময়ের সাথে সাথে তাদের একটি সংস্কৃতি তৈরি হয়ে ওঠে। যদিও প্রতিটি সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনন্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত সংস্কৃতির কিছু প্রচলিত বৈশিষ্ট আছে যা তারা একে ওপরের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। এই ধরনের তিনটি বৈশিষ্ট যা জ্ঞাপনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হল ঃ (১) ব্যক্তিদের একে অপরের সাথে সংযুক্ত করা, (২) একটি সাধারণ পরিচয়ের ভিত্তি প্রদান করা এবং (৩) সদস্যদের মধ্যে আলোচনার জন্য একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করা।

২.৪ জ্ঞাপন এবং সংস্কৃতির মধ্যে সম্পর্ক

জ্ঞাপন এবং সংস্কৃতির মধ্যেকার সম্পর্ক একটি অত্যন্ত জটিল কিন্তু অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। প্রথমত, সংস্কৃতি সৃষ্টি হয় যোগাযোগের মাধ্যমে; অর্থাৎ জ্ঞাপন হল মানুষের মধ্যে কথোপকথন তৈরি করার মাধ্যম যার ফলে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি- প্রথা, ভূমিকা, নিয়ম, আচার, আইন বা অন্যান্য নিদর্শনগুলিকে সৃষ্টি করা যায় এবং ভাগ করে নেওয়া হয়। এমন ব্যাপার নয় যে সাধারণ মানুষেরা সংস্কৃতি তৈরি করার জন্যই বিভিন্ন গোষ্ঠী, সংস্থা বা সমাজে একে-ওপরের সঙ্গে আলোচনা করে, বরং সংস্কৃতি সামাজিক আলোচনা একটি স্বাভাবিক উপজাত। সেই অর্থে, সংস্কৃতি সামাজিক যোগাযোগের এক স্বাভাবিক পরিণতি। জ্ঞাপন ও গণমাধ্যমের সাহায্য ছাড়া, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে এক স্থান এবং সময় থেকে অন্য স্থানে ও সময়ে সংরক্ষণ করা এবং ছড়িয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব। সেই জন্য এটা বলা যেতে পারে, যে সংস্কৃতি তৈরি হয়, আকার পায় এবং সঞ্চারিত হয় জ্ঞাপনের মাধ্যমে। আবার উল্টোটাও সত্য; অর্থাৎ, যোগাযোগের রীতি নীতিগুলি মূলত সংস্কৃতির দ্বারা তৈরি হয়। আকার পায় এবং প্রেরণ করা হয়।

এই গণজ্ঞাপন-সংস্কৃতির সম্পর্কের প্রভাব বোঝার জন্য, কেবলমাত্র একটি বিশেষ জ্ঞাপন ঘটনার উপর নজর দেওয়ার পরিবর্তে একটি নিরন্তর যোগাযোগ পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি ছোট গোষ্ঠীতে কিছু মানুষ প্রথম দেখা করে একে অপরের সাথে, সেই গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের সাথে পূর্ববর্তী যোগাযোগের অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং আচরণগত নিদর্শন নিয়ে আসে, যেহেতু তারা সেই সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতার পরিসর থেকেই এসেছেন। যখন ব্যক্তিরা এই নতুন গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত হতে শুরু করে, তখন তারা তাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলা এবং তাদের সঙ্গে আরও অন্তরঙ্গ হওয়ার এক নতুন উপায় ও অভিজ্ঞতা তৈরি করতে শুরু করে। যদি গোষ্ঠীটি তার জ্ঞাপন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে, তাহলে ধীরে ধীরে ওই গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট রীতিনীতি, কাঠামো এবং আচার-অনুষ্ঠানের একটি নীতি সৃষ্টি হবে। এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে কিছু বেশ সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট। যেমন একজন নতুন ব্যক্তি ওই দলে যোগদান করলে তাকে ওই গোষ্ঠীর সুস্পষ্ট সাংস্কৃতিক 'নিয়ম' এর সম্মুখীন হতে হবে যা তিনি অন্যান্য সদস্যদের সাথে জ্ঞাপনের মাধ্যমে মেনে চলতে শিখবে। নতুন সদস্যরা দলগত সংস্কৃতিকে কখনও স্বল্প পরিসরে আবার কখনও ব্যাপক পরিসরে

প্রভাবিত করবে যখন তারা এটির একটি অংশ হয়ে উঠবে। একটি পারস্পরিক ভঙ্গিতে, এই পুনর্নির্মিত সংস্কৃতি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের গোষ্ঠী সদস্যদের যোগাযোগের অভ্যাসগুলিকেও প্রভাবিত করে। এটা যে কোনো সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই সত্য; যোগাযোগ সংস্কৃতিকে আকার দেয়, আবার সংস্কৃতি যোগাযোগকে প্রভাবিত করে।

২.৫ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃতি জটিল এবং বহুমুখী। উপরের আলোচনা থেকে এই কথাটি স্পষ্ট যে সংস্কৃতি হল একটি জটিল কাঠামো যা একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত। একটি ছোট গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত সংস্কৃতি কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে সরল। এডওয়ার্ড হল (১৯৭৯) সংস্কৃতির জটিলতা এবং সামাজিক স্তরে সাংস্কৃতির পার্থক্য বোঝার ক্ষেত্রে যোগাযোগের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে একজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী।

সংস্কৃতি আত্মবাদী। নিজের সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে সবথেকে যৌক্তিক, স্বাভাবিক এবং বোধগম্য বলে ধরে নেওয়ার একটি প্রবণতা মানুষজনের মধ্যে রয়েছে। এটি ধরে নেওয়া হয় যে যদি কোনো সংস্কৃতি, তা অন্য কোনো গোষ্ঠী, সংস্থা অথবা সমাজের থেকে কিছুটা ভিন্ন হয়, সেই ক্ষেত্রে ওই পার্থক্যগুলি প্রায়শই নেতিবাচক, অযৌক্তিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থহীন বলে বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ব্যক্তি এমন এক সাংস্কৃতিক পরিবেশে অভ্যস্থ হন যেখানে আবেগপ্রবণ সম্পর্কের মধ্যে থাকলে জনসমক্ষে স্নেহের প্রদর্শন খুবই প্রচলিত, তবে সেই ব্যক্তির অন্যান্য ব্যক্তিদের, বিশেষত যারা মূলত বেশি রক্ষণশীল সংস্কৃতি থেকে এসেছেন, তাদের আচরণগুলি অদ্ভুত, এমনকি অনুপযুক্ত বলেও মনে হতে পারেনা সাংস্কৃতিক ভিন্নতার জন্য। একই রকম ভাবে, যে ব্যক্তিরা কোনো একটি সংস্থার লৌকিকতাবর্জিত সভায় অংশগ্রহণ করে অভ্যস্ত তারা মনে করতে পারে যে আনুষ্ঠানিক বৈঠকের নিয়ম অত্যন্ত কৃত্রিম এবং তা মেনে চলাটা অত্যন্ত বিস্ময়কর। আবার, একটি প্রতিষ্ঠানে যেখানে কর্মচারীরা প্রতিদিন স্যুট-টাই পরেন তারা যখন এমন একটি প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে যেখানে কর্মচারীরা নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো পোশাক পড়তে পারে, সেই ক্ষেত্রে তারা এই নতুন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বিষয়ে সমালোচনা করতে পারে। অর্থাৎ যদিও সমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদান মূলত একই যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে, তবুও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, অনেক ব্যক্তির প্রবণতা হল 'ভিন্ন' কে 'ভুল' হিসেবে মনে করা।

সময়ের সাথে সাথে সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃতিতে সবসময়ই একটা রূপান্তর ঘটছে—যদিও এই পরিবর্তনটি কখনও কখনও খুব ধীর এবং অপ্রত্যক্ষভাবে হয়। অনেক রকমের শক্তি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। আমরা যেমন আগেই উল্লেখ করেছি যে সংস্কৃতি যোগাযোগ বা জ্ঞাপনের মাধ্যমে তৈরি হয়, এবং ব্যক্তিদের মধ্যেকার যোগাযোগের ফলে সংস্কৃতি আবার সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিতও হয়। যোগাযোগ প্রক্রিয়ার সময় প্রতিটি ব্যক্তি আবার অন্য (অতীত ও বর্তমান) সংস্কৃতির সদস্যতা থেকে তার নিজের অভিজ্ঞতাগুলির একটি কাঠামো নিয়ে আসে। এক অর্থে, নতুন সম্পর্ক, গোষ্ঠী,

সংস্থা বা সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যেকার যে কোনো আলোচনা আসলে একটি আন্তঃ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ঘটনা, এবং এই বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানগুলি সময়ের সাথে ব্যক্তি এবং সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতি এক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে অন্য সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বার্তাগুলির গতিবিধিকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তোলে। একইসাথে, সংস্কৃতি স্বল্প পরিসরে বা ব্যাপক উপায়ে একে অপরকে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রভাবিত করে। 'ওয়ার্ল কমিউনিটি' এবং 'গ্লোবাল ভিলেজ' এই সব বাক্যাংশের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিই আন্তঃসাংস্কৃতিক প্রভাব এবং পরিবর্তনের অনিবার্যতার প্রমাণ দেয়।

২.৬ সাংস্কৃতিক জ্ঞান ও জ্ঞাপন

সংস্কৃতি মূলত প্রচ্ছন। সম্পর্ক, গোষ্ঠী, সংগঠন বা সমাজের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলির বেশিরভাগই সমাজের সদস্যদের কাছে অদৃশ্য, যেমন, যারা শ্বাস নেয় তাদের কাছে বায়ু অদৃশ্য। যদিও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাষা দৃশ্যমান, যেমন অভিবাদন, বিশেষ চিহ্ন, স্থান এবং জায়গার ক্ষেত্রে কিন্তু তা সত্ত্বেও সংস্কৃতিতে যে কোনো ব্যক্তির জন্য এই চিহ্ন, অভিবাদন, স্থান এবং জায়গাগুলির যে বিশেষ এবং সংজ্ঞায়িত অর্থ রয়েছে তা অনেক কম দৃশ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোনো দেশে কেউ যখন অভিবাদন জানাচ্ছে তখন তারা একে ওপরের গাল এ গাল ঠেকাচ্ছেন। এখন এই ব্যাপারে যতক্ষণ না কোনো ব্যক্তি সেই সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে বা তার কাছে যদি সেই জায়গার সাংস্কৃতিক জ্ঞান না থাকে তাহলে তাদের সমাজের সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই আচরণের অর্থ নির্ধারণ করা তার পক্ষে কঠিন। অন্য কথায় বলতে গেলে সাংস্কৃতিক জ্ঞান বলতে বোঝায় যা একজন ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির বিশ্বাস, রীতিনীতি, অনুশীলন, মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে যে তথ্য এবং উপলব্ধি রয়েছে। এই জ্ঞান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, মিডিয়ার এক্সপোজার এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির ব্যক্তিদের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। আজকের বিশ্বায়িত বিশ্বে সাংস্কৃতিক জ্ঞান থাকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ব্যক্তিদের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে আরও ভালভাবে বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে, বিভিন্ন পটভূমির লোকেদের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে এবং ভুল বোঝাবুঝি এবং সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ এড়াতে সহায়তা করে। এটি ব্যক্তিদের সম্মান এবং সংবেদনশীলতার সাথে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে।

২.৭ সংস্কৃতির ও জ্ঞাপনে প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা

উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে এটা পরিস্কার যে, সংস্কৃতি যোগাযোগ বা জ্ঞাপনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, কারণ এটি ভাষা, প্রতীক এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে লোকেরা কীভাবে অর্থ ব্যাখ্যা করে এবং প্রকাশ করে তার একটি কাঠামো সরবরাহ করে। সাংস্কৃতিক মানদণ্ড এবং মূল্যবোধগুলি নির্ধারণ করে যে লোকেরা কীভাবে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করবে, যথাযথ ভাষা, স্বর এবং চিহ্ন জ্ঞাপক সংকেতগুলিকে ব্যবহার করে। একইভাবে, যোগাযোগ বা জ্ঞাপন সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করে। যোগাযোগ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য সঞ্চারিত করতে সহায়তা করে। তবে, সংস্কৃতি এবং যোগাযোগের মধ্যে সংঘর্ষও হতে পারে, বিশেষত যখন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমির ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ

করে। ব্যক্তির যখন যোগাযোগের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের বিষয়ে নির্বিকার বা অসংবেদনশীল থাকে তখন ভুল বোঝাবুঝি, স্টেরিওটাইপস তৈরি হওয়া এবং ভুল ব্যাখ্যা ঘটতে পারে।

সমাজের সমস্ত প্রতিষ্ঠান যোগাযোগের সৃষ্টি, বিবর্তন ও সম্প্রসারণে তাদের অবদান রাখে। তবে গণজ্ঞাপন টেলিভিশন, ফিল্ম, রেডিও, সংবাদপত্র, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, ম্যাগাজিন, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু মিডিয়া বার্তা তৈরি, বার্তা সম্প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য মানুষের ক্ষমতাকে প্রসারিত করে, সেই জন্যই তারা সংস্কৃতি-গঠনের কার্যক্রমগুলি আরও প্রসারিত ও প্রশস্ত করে তোলে। এই জাতীয় যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে, বার্তাগুলি বিভিন্ন সময় এবং স্থানে প্রেরণ করা যায়, সংরক্ষণ করা যায় হয় এবং পরে পুনরুদ্ধারও করা যায় অন্য কোনো পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার জন্য। টেলিভিশন প্রোগ্রাম, ফিল্ম, ওয়েবসাইট, এবং ভিডিও গেমসের আখ্যানগুলি মানুষের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয় এবং তাই তাদের নির্মাতাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় এবং সাংস্কৃতিক পরিসরকে আরও প্রসারিত করে।

২.৮ জ্ঞাপন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন অনুসন্ধান

যোগাযোগের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রকৃতি বোঝা বিভিন্ন কারণে প্রয়োজন। প্রথমত, এটি বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং সমাজের প্রক্রিয়া, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং রীতিনীতিগুলির মধ্যে পার্থক্যের উৎস ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে এবং এটি যোগাযোগ প্রক্রিয়াটির একটি স্মরণচিহ্ন সরবরাহ করে যার দ্বারা এই পার্থক্যগুলি তৈরি হয়েছিল। এই জ্ঞানটি সাংস্কৃতিক পার্থক্যের জন্য মানুষের সহনশীলতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। দ্বিতীয়ত, এটি নতুন সম্পর্ক, গোষ্ঠী, সংস্থা এবং সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা যে প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করে তা ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। তৃতীয়ত, এটি সংস্কৃতিগুলির মধ্যে একটি সেতু এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পিছনে একটি শক্তি হিসাবে যোগাযোগের গুরুত্বকে সামনে নিয়ে আসে।

তবে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন এই পরিসরের গবেষক এবং নীতিনির্ধারকদের বিচলিত করে। সেগুলি হল— ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং দেশগুলির মধ্যে ক্রমশ যোগাযোগ অনেকাংশে বাড়ছে। তবে এর অর্থ কি এই যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং ঐতিহ্যগুলি অনিবার্যভাবে পুরোপুরি ক্ষয় পেয়ে যাবে? যে সমস্ত গোষ্ঠী, সংস্থা অথবা সমিতিগুলির সংস্কৃতির গণমাধ্যমের ওপর দুর্দান্ত প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ আছে তারা কি এমন সংস্কৃতিগুলির যাদের গণমাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ ও সামর্থ্য কম তাদেরকে পরাভূত করে? এই সমস্ত প্রশ্নগুলি এই বিষয়ে গবেষণা ও আলোচনাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আরও গভীরভাবে বিষয়গুলি নিয়ে ভাবার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

২.৯ উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, জ্ঞাপন এবং সংস্কৃতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বেশ জটিল এবং বহুমুখী। সংস্কৃতি মানুষের জ্ঞাপন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে, এবং জ্ঞাপন অপরদিকে, সাংস্কৃতিক নিয়মাবলী এবং রীতিনীতিগুলিকে

আকার দেয় ও দৃঢ় করে তোলে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট জুড়ে কার্যকরভাবে যোগাযোগের দক্ষতা আজকের বিশ্বায়িত সমাজে ক্রমশ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে, যেখানে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ব্যতিক্রম নয় বরং আদর্শ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমির ব্যক্তিদের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এবং সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ায় যথাযথ ফলাফল অর্জনের জন্য সাংস্কৃতিক যোগাযোগের গুরুত্ব বোঝা অপরিহার্য। যে সমস্ত সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলি সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায় তাকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং সম্মান করে আমরা একে অপরের সাথে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে পারি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়ায় উৎসাহিত করতে পারি এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহযোগী পরিবেশ তৈরি করতে পারি। ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একে অপরের সাথে কার্যকর যোগাযোগের জন্য প্রতিটি ব্যক্তির শোনা, শেখা এবং সংযুক্ত হওয়ার অভ্যাস রপ্ত করা উচিত। পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বোঝাপড়ার সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতিও প্রয়োজন। অর্থাৎ, জ্ঞাপন এবং সংস্কৃতির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক একটি শক্তিশালী শক্তি যা বিশ্বব্যাপী আরও সুদৃঢ়, আরও সম্পৃক্ত এবং আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

২.১০ সারাংশ

এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে তথ্য ও ভাব আদানপ্রদান করার প্রক্রিয়াকে প্রবাবিত করে সংস্কৃতি আবার অপর দিকে জ্ঞাপনের সাংস্কৃতিক নিয়ম এবং রীতিনীতিগুলিকেও প্রভাবিত করে। অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে ফলপ্রসূ করার জন্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমির ব্যক্তিদের সাথে অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সংস্কৃতি এবং জ্ঞাপনের মধ্যের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। সংস্কৃতি হল একটি জটিল কাঠামো যা একাধিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত। একটি ছোট গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত সংস্কৃতি কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে সরল। তবে সময়ের সাথে সাথে যে কোনও সামাজিক ব্যবস্থা তা একটি সম্পর্ক, গোষ্ঠী, সংস্থা বা সমাজ যাই হোক না কেন তাদের একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। তবে সবসময়ই সংস্কৃতিতে একধরনের রূপান্তর ঘটে চলেছে যদিও এই রূপান্তর কখনও কখনও খুব ধীর গতিতে হয় আবার কখনও খুব দ্রুতও হতে পারে। একজন ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির বিশ্বাস, রীতিনীতি, অনুশীলন, মূল্যবোধ এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে যে তথ্য এবং উপলব্ধি রয়েছে তাকেই তাঁর সাংস্কৃতিক জ্ঞান বলা যেতে পারে। এই জ্ঞান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, গণমাধ্যমের সাথে সম্পর্ক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করা হয়ে থাকে। এই সাংস্কৃতিক জ্ঞান, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত করতে যোগাযোগ সহায়তা করে। গণমাধ্যমেরও জ্ঞাপন ও সংস্কৃতির আদানপ্রদানে যথেষ্ট অবদান আছে। গণমাধ্যমের অনুষ্ঠানগুলি মানুষের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়, তাই তাদের নির্মাতাদের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় এবং আরও ছড়িয়ে পড়ে গণমাধ্যমের সহায়তায়। তবে, সংস্কৃতি এবং যোগাযোগের মধ্যে বিরোধও হতে পারে, বিশেষত যখন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমির ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে যোগাযোগে লিপ্ত হয় যথাযথ সংবেদনশীলতা ছাড়াই।

একক ৩ ❑ বিজ্ঞাপন ও অর্থনৈতিক প্রভাব এবং প্রযুক্তিগত এবং নৈতিক প্রভাব

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ বিজ্ঞাপন ও অর্থনৈতিক প্রভাব—

৩.৩.১ বিজ্ঞাপন : তথ্যের উৎস হিসেবে

৩.৩.২ বিজ্ঞাপন এবং মূল্য

৩.৩.৩ প্রতিযোগিতা

৩.৩.৪ বিজ্ঞাপন এবং সম্পদ বরাদ্দ

৩.৪ বিজ্ঞাপনের অর্থনৈতিক দিক

৩.৫ প্রশ্নাবলি

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৭ প্রযুক্তিগত এবং নৈতিক প্রভাব

৩.৭.১ ভূমিকা

৩.৭.২ গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত প্রভাব

৩.৭.৩ গণমাধ্যমের নৈতিক প্রভাব

৩.৭.৪ প্রশ্নাবলি

৩.৭.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

আপনারা পূর্ববর্তী মডিউলগুলিতে গণমাধ্যম এবং গণজ্ঞাপনের উপাদান, তত্ত্ব, মডিউল প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপেযা জেনেছেন তা থেকে উক্ত দুই বিষয় সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে প্রাথমিক অথচ স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠতে পেরেছে বলে আশা করা যায়। ফলে এই এককে আপনারা সেই ধারণাকে সঙ্গী করে বিজ্ঞাপন ও তার

অর্থনৈতিক প্রভাবগুলি সম্পর্কে সবিস্তারে ধারণা লাভ করবেন। এককের উপান্তে পূর্ববর্তী মডিউলগুলির এককের মতোই প্রশ্নাবলি ও গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত করা হয়েছে যা এই বিষয়ে আপনাদের গভীরতর জ্ঞান অর্জনের পক্ষে সহায়ক হবে।

৩.২ প্রস্তাবনা

আমরা পূর্ববর্তী মডিউলগুলির আলোচনা থেকে জেনেছি বিজ্ঞাপনের সঙ্গে অর্থনীতির সম্পর্ক গভীর। মূলত ভারতবর্ষের অর্থনীতির সঙ্গে তালমিলিয়ে চলে বিজ্ঞাপন। অধিকাংশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ অংশ বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে। যুগপৎ ইতি এবং নেতিবাচকতার সঙ্গে এটি গৃহীত হলেও বিজ্ঞাপনের বিলুপ্তিকরণ একপ্রকার অসম্ভব। এর বিলুপ্তি ঘটলে প্রচারের ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতির অন্বেষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সমস্যা মূলত দ্বিবিধ;

● বিজ্ঞাপনের মাইক্রো এবং ম্যাক্রো প্রতিক্রিয়া উভয়ই পরিমাপ করতে শেখা যাতে বিজ্ঞাপনী সংস্থা বা পণ্য সরবরাহকারী সংস্থা ও সমাজ এই উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিজ্ঞাপনকে ব্যবহার করা যায়।

● সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যা বিজ্ঞাপনের সমাজের প্রতি ক্ষতিকর প্রভাবগুলিকে দূর করবে বা হ্রাস করবে।

এই প্রাথমিক ভাবনাটুকু সঙ্গে করে আমরা এককটির বিস্তারিত আলোচনায় অগ্রসর হব।

৩.৩ বিজ্ঞাপন ও অর্থনৈতিক প্রভাব

বিজ্ঞাপনের ইতি বা নেতিবাচক প্রভাবের উর্ধ্বে উঠে বলা যায় যে এটি এমন একটি ব্যবস্থা যার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ যুক্ত, ফলে এটি খুব স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। এক্ষেত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল এই যে ফলপ্রসূ বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা সমাজের সামনে উপলব্ধ করেছে যা অন্যভাবে উপভোগ করা সম্ভব নয়। এটি ব্যয়ের অন্যান্য বিভাগের উপর প্রচারের সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়। বিজ্ঞাপনের কৌশল যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিক্রয় হওয়া অনুমোদিত অর্থনীতির এককের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ফলাফলের বা আউটপুটের প্রথিটি এককের জন্য নির্ধারিত উৎপাদন খরচ এক্ষেত্রে কমানো হয়। স্বল্প ভোক্তা মূল্য হওয়ার দরুণ অধিক সংখ্যক জনসাধারণের কাছে এই দ্রব্যগুলি সহজলভ্য হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে বললে বলতে হয়, প্রচার ব্যবস্থা দৈনন্দিন জীবনের বহু উপভোগ্য বিনোদন এবং শিক্ষাগত দিকগুলির জন্য অর্থ প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের মূল্যও হ্রাস করে।

২.৩.১. বিজ্ঞাপন : তথ্যের উৎস হিসেবে :

এক্ষেত্রে আলোচনার শুরুতেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ভোক্তাদের চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পণ্যের লভ্যতা, মূল্য এবং বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞাপন গ্রাহকদের কতটা তথ্য প্রদান

করে? এর উত্তরে বলা যায়, প্রথমত, বিজ্ঞাপনদাতা পণ্য বা একটি নির্দিষ্ট পরিষেবার বিক্রেতা। তার কাছে সেই নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা সম্পর্কে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যক্তির তুলনায় অধিক তথ্য রয়েছে। নিজের পণ্য সম্পর্কে বিক্রেতার জ্ঞান বা তথ্যগুলি আসলেই বিজ্ঞাপনের প্রোগ্রামের ডিজাইনে ব্যবহৃত হয়েছে কি না তা বিজ্ঞাপনের অনুলিপি পরিকল্পনায় নিযুক্ত পদ্ধতির অধ্যয়ন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিকে পাওয়া যায় যারা একটি নির্দিষ্ট পণ্যের বৈশিষ্ট্যাবলী ক্লাস্টার থেকে নির্বাচন করে একটি নির্দিষ্ট প্রচারমূলক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত করে, তাহলে সেক্ষেত্রে পরামর্শ হবে বিক্রেতার তার পণ্যসম্পর্কে অন্তরঙ্গে জ্ঞান কী তা এক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য সেই নির্দিষ্ট পণ্যের অন্যান্য দিকগুলি ভোক্তাদের কাছে উপস্থাপিত করবে, যেমন প্রদত্ত পণ্যের সম্ভাব্য প্রভাব, ভোক্তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, প্রতিযোগিতার নীতি প্রভৃতি। অন্যধিকে অধিক বিজ্ঞাপন অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ। এটি প্রধানত প্রস্তুতকারকের বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনকে মেটায় যেখানে বিজ্ঞাপনে সম্ভাব্য ক্রেতাদের পণ্যের প্রাপ্যতা, তাদের গুণাবলী, খুচরো বিক্রেতাদের নির্দিষ্ট পণ্যটির প্রাপ্যতা, বৈশিষ্ট্য এবং মূল্য সম্পর্কে জানানো হয়। পাইকারি বিক্রেতারা প্রস্তুতকারক বা খুচরো বিক্রেতাদের তুলনায় বিজ্ঞাপনের ব্যবহার কম করে। কিন্তু যেখানে বিজ্ঞাপন ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ শিল্প সরবরাহের বিপণন ব্যবস্থায়, সেখানে বিজ্ঞাপন যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য সরবরাহ করতে পারে কিংবা পণ্যের প্রাপ্যতা সম্পর্কে তথ্য প্রদানকে সীমাবদ্ধও রাখে। বিজ্ঞাপনে প্রচারিত তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঠিক হয় যা সম্ভাব্য ক্রেতাকে পণ্যটি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করে। এই তথ্য নিজেই এমন একটি প্রকৃতির হতে পারে যা পণ্যটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিল্পজাত পণ্য সরবরাহের বিজ্ঞাপনগুলিতে গ্রাহকদের আগ্রহ ও জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রাচুর্য ঘটে। সমস্ত শিল্প পণ্য সরবরাহের বিজ্ঞাপনে যেখানে সত্য তথ্য প্রদান করা হবে সেখানে ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদানকারী বিজ্ঞাপনগুলির তুলনায় অধিক বিক্রি হবে। যদিও অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই সঠিক তথ্য সম্পন্ন হয়, তবু সম্ভাব্য ক্রেতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সবথেকে বেশি অনিশ্চয়তার জায়গা হল বিজ্ঞাপনদাতার তথ্য প্রদানের সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো বস্তুনিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি। খুব কম এমন বিজ্ঞাপনদাতা হবেন যারা এমন তথ্য নির্বাচন করবেন যা তার লাভ বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হবে; যদিও ক্রেতার দিক থেকে পণ্য নির্বাচনের জন্য সর্বোত্তম বস্তুটি নির্বাচনের জন্য এই ধরনের তথ্য প্রদান গুরুত্বপূর্ণ। যখন একটি নির্দিষ্ট পণ্য সম্পর্কে প্রদেয় তথ্য এমন একটি পক্ষের থেকে প্রাপ্ত হয় যার কল্যাণ সেই তথ্যের পরিমাণ এবং গুণমানদ্বারা প্রভাবিত হতে পারে তখন প্রদেয় সেই তথ্যগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার উপযুক্ত কারণ রয়েছে। এমন বহু সূক্ষ্ম উপায় রয়েছে যেখানে বিজ্ঞাপনদাতা সত্যের সীমা অতিক্রম না করে তথ্যকে বিকৃত করতে পারে। এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতা যা বলছেন তা আক্ষরিক অর্থে সত্য হতেই পারে, কিন্তু প্রাসঙ্গিক তথ্য বাদ দেওয়ার ফলে পণ্যটি একবার ব্যবহারের পরে ক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্যটি সম্পর্কে এমন একটি প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠতে পারে যা বিজ্ঞাপনদাতার প্রদেয় তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার থেকে বিচ্যুত হয়। এই ধরনের তথ্যবিকৃতি ইচ্ছাকৃত, দুষ্ট, আকস্মিক বা অনিচ্ছাকৃত হতেই পারে; কিন্তু প্রাণদেনা নির্বিশেষে তার প্রভাব একই হয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য সেই পণ্য বা পরিষেবার বিজ্ঞাপনগুলি যথেষ্ট এবং সঠিক তথ্যসম্পন্ন কি না। এক্ষেত্রে বলা যায়, বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ বা সর্বাংশে সত্য নাও হতে পারে, এবং এটি না হওয়ার পেছনে খুব স্বাভাবিক একটি

কারণ হল বিজ্ঞাপনদাতার প্রদেয় বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতার মানদণ্ড এবং সম্ভাব্য ক্রেতার পণ্যটির সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষার মানদণ্ড এক নয়। এই মন্তব্যটির মধ্যে ধিয়ে আমরা এই আলোচনার চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছতে পারি যেখানে বলা যায় বিজ্ঞাপন কমবেশি সবক্ষেত্রেই তথ্যসম্পন্ন হলেও এটি কি ভোক্তাদের পক্ষে পণ্য সম্পর্কে সর্বোচ্চ তথ্য সরবরাহ করতে পারে? এক্ষেত্রে আমাদের উত্তর হবে যে তা নয় কারণ বিজ্ঞাপনদাতার দ্বারা প্রদেয় তথ্যের পেছনে তার নিজের স্বার্থ কাজ করে, যে তথ্যগুলি সবসময় ক্রেতার সমস্ত জিজ্ঞাসাকে নির্বাপিত করে না।

২.৩.২ বিজ্ঞাপন এবং মূল্য :

এক্ষেত্রে আলোচনার শুরুতেই একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে অধিকমাত্রায় বিজ্ঞাপন কি ভোক্তামূল্য বৃদ্ধি করে? প্রশ্নটি এই আলোচনার ক্ষেত্রে আবশ্যক। এক্ষেত্রে উত্তর দেওয়া যায় যে কিছু ক্ষেত্রে এটি করে, কিছু ক্ষেত্রে নয়। আমাদের এই উত্তরের পেছনে সহজ যুক্তি রয়েছে। এই যুক্তির সঙ্গে জড়িত থাকে যাকে বলা হয় ব্যয়ের 'Stacking Up'-এর ধারণা। প্রায়শই ধারণা করা হয় যে একটি পণ্যের উৎপাদন খরচ এবং বিপণন খরচের সমস্ত উপাদানগুলিকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে এবং বস্তুটির চূড়ান্ত বিক্রয় মূল্যের থেকে পুনরুদ্ধার করতে হবে। এই সমস্ত খরচই উল্লম্ব বা 'স্ট্যাকিং আপ' রূপে জমা হয় এবং আমরা এই স্ট্যাকের প্রতিটি স্তরের জন্য অর্থ প্রদান করে স্ট্যাকটিকে বা খরচের উল্লম্বস্তরটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনি। বিজ্ঞাপনের খরচকেও এই উল্লমব স্তরটির একটি স্তর হিসেবেই দেখা হয় এবং এর নির্মুলিকরণ আমাদের পক্ষে সমতুল্য অর্থ নিষ্কৃতি হিসেবে পরিগণিত হয়। আমাদের মনে রাখা উচিৎ, এই যুক্তিটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন বা বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, এই যে কোনো প্রচারমূলক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। এই সমালোচনার যুক্তির ক্ষেত্রে আপাত সরলতা এবং স্পষ্টতা সত্ত্বেও একটি সুনির্দিষ্ট বিবৃতি যেখানে বলা হয় 'বিজ্ঞাপন ভোক্তামূল্য বাড়ায়' তা আসলে অসত্য। বিজ্ঞাপনের ফলে পণ্যের দাম বেশি হতে পারে তখনই যখন সেই বিজ্ঞাপন অকার্যকর হয় কিংবা বিজ্ঞাপনের পরবর্তীতেও পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। আমাদের সামনে তিনটি উদাহরণ রয়েছে যেখানে বিজ্ঞাপন ভোক্তামূল্য বৃদ্ধি করে। এই তিনটি উদাহরণ হল;

● **যখন বাজার বৃদ্ধি বিদ্যমান থাকে (When Market Saturation Exists) :** যখন নতুন ক্রেতাদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহার করার জন্য কোনো উৎসাহ কাজ করে না, যখন বাজার বৃদ্ধি ঘটে, তখন প্রতিযোগী সংস্থাগুলির মধ্যে অপ্রত্যাশিত মনোভাবের সঙ্গে চলতে থাকা যুদ্ধ সুস্পষ্টভাবে অর্থনৈতিক অপচয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। এই পরিস্থিতির ফলে দ্বন্দ্ব রত সংস্থাগুলির ক্ষতি হতে পারে বা চূড়ান্ত ভোক্তাদের জন্য পণ্যটির উচ্চমূল্য ধার্য হতে পারে।

● **যখন নিক্তিতে প্রত্যাবর্তনের পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় (When Decreasing Returns to Scale are Encountered) :** এই দৃষ্টান্তে বিজ্ঞাপন একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু এটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে না। যখন বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পায় (যাকে বলা হয় Decreasing Returns to Scale) তখন অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন ব্যয় উল্লম্ব অর্থে জমা হওয়া প্রয়োজন।

● **যখন বিজ্ঞাপন নিজেই অকার্যকর হয় (When the Advertising itself is Ineffective) :** পরিশেষে বলা যায়, বিজ্ঞাপনের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে তখনই যদি বিজ্ঞাপন নিজেই অকার্যকর হয়, অর্থাৎ যদি এটি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি না করে।

এই তিনটি উদাহরণ যেখানে বিজ্ঞাপন ভোক্তামূল্য বৃদ্ধি করতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত একটি বাজার সম্প্রসারণযোগ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত একক প্রতি কম উৎপাদন খরচ সম্ভব, এবং যতক্ষণ বিজ্ঞাপন বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি করে বা উৎপাদনে সহায়তা করে ততক্ষণ একটি পণ্যের মোট এককের খরচ কমানো সম্ভব। এবং একমাত্র তাহলেই ভোক্তাদের পক্ষে কম মূল্য অর্জন করা সম্ভব।

● **বিজ্ঞাপন ও ফলাফলের স্তর :** বিজ্ঞাপনের পক্ষে প্রায়শই উপস্থাপিত যক্তিগুলির মধ্যে একটি হল এটি চাহিদাকে উদ্দীপিত করার ফলস্বরূপ উৎপাদনের হারও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে তত্ত্বটি উঠে আসে তা জানায় বিজ্ঞাপনের একটি গুণক প্রভাব রয়েছে যা বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ ব্যয়ের অনুসরণ করে। বিজ্ঞাপনের পক্ষে আরেকটি যুক্তি হল এটি একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম যেখানে পণ্যের সঙ্গে পণ্যের পার্থক্য ও উৎপাদন গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিগণিত হয়। এই উদ্ধাবন বা উৎপাদনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে উৎপাদকেরা এর মাধ্যমে বাজারে পা রাখতে সক্ষম হন। যেহেতু উদ্ভাবনের হার অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, তাই এই বিপণন সমর্থনযোগ্য মন্তব্য নতুন পণ্য তৈরি, পণ্যের পরিবর্তন এবং বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

● **মোট জাতীয় পণ্য এবং উদ্ভাবন :** ইতিপূর্বের আলোচনায় এই ইঙ্গিতটুকু করা গেছে যে একটি নির্দিষ্টি সংস্তার জন্য ব্যবহৃত বহুল বিজ্ঞাপনের নির্ভুল প্রবাব পরিমাপ করা সম্ভব নয় এবং এই বিষয়টি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের অবস্থানের জন্য আরও বেশি করে প্রযোজ্য; অর্থাৎ বিজ্ঞাপন স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদে চাহিদার ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে সেটা জানা মুশকিল। বিজ্ঞাপনদাতারা বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট পণ্যের বিক্রয়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপক। এটি সময়ের ব্যবধানে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করতে পারে কি না তা অস্পষ্ট। বিজ্ঞাপন সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার মধ্যে মোট জাতীয় পণ্য বিগত কয়েক দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৩.৩ প্রতিযোগিতা :

প্রতিযোগিতার প্রকৃতি বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। যদিও বিজ্ঞাপনের চাহিদা তৈরির সম্ভাবনা একদিকে যেমন নতুন সংস্থাগুলিকে শিল্পজগতে প্রবেশ করতে উৎসাহিত করে তেমনই পূর্ব থেকেই শিল্পজগতে বিদ্যমান সংস্থাগুলিকে তাদের পণ্যগুলির ধরনকে বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করে, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বিজ্ঞাপনের সফল ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে তা হল উক্ত উদ্দেশ্যে তহবিল লাভের সহজতা। এইভাবে ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপন প্রদানের জন্য তহবিলের প্রাপ্যতা আসলে বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রয় প্রচারকে উদ্দীপিত করার পরিবর্তে শুধুমাত্র বড় সংস্থাগুলি যারা এই ধরনের প্রচারমূলক বাজেটকে বহন করতে পারে শুধুমাত্র তাদের জন্য পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রয়ের সম্ভাবনাকে উদ্দীপিত করে। বহুল পরিমাণে পণ্য উৎপাদন পরিশেষে একটি অনমনীয় বাজার কাঠামোর জন্ম

দেয়। এই ধরনের বাজার কাঠামো হতে পারে বহুল সামাজিক সুবিধা প্রদানকারী, তবু এর মধ্যে সেই শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয় যা আসলে বহুবিধ ছোট সংস্থার মধ্যেকার প্রতিযোগিতাকে চিহ্নিত করতে পারে।

২.৩.৪ বিজ্ঞাপন এবং সম্পদ বরাদ্দ :

বিজ্ঞাপনের সামগ্রিক মূল্যায়নে যে প্রশ্নটির উত্তর আমাদের সামনে থাকা উচিৎ তা হল সম্পদ বরাদ্দের উপর এর প্রভাবটি কী? এক্ষেত্রে আমরা এই তথ্যটি ধরে নিয়ে উত্তর অন্বেষণে অগ্রসর হতে পারি যে বিজ্ঞাপন প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পণ্যগ্রুপে নির্দিষ্ট পণ্য এবং নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের চাহিদা বাড়াতে পারে। অর্থাৎ, ধরা যাক বিজ্ঞাপনের প্রভাবে চালের মধ্যে বাসমতি চালের নির্দিষ্ট একটি ব্র্যাণ্ডের চাহিদা ও বিক্রি বৃদ্ধি পেতে পারে। এবং এই চাহিদা এতদূর বৃদ্ধি করতে পারে যে তা ভোক্তাদের অপর কোনো দ্রব্যের প্রতি ব্যয় করা থেকে বিরত রাখে, এই চাহিদা বিজ্ঞাপনের প্ররোচনামূলক প্রভাবের প্রতি যেখানে কম প্রতিক্রিয়াশীল সেখানে সম্পদের পূনর্বণ্টন রয়েছে। ভোক্তারা যদি এর ফলে আশানুরূপ বর্ধিত সন্তুষ্টি অনুভব করে তাহলে এই বরাদ্দের দ্বারা ভোক্তা-কল্যাণ উন্নত হয়। কিন্তু ভোক্তারা যদি বিজ্ঞাপনের উপর ভিত্তি করে নিরাশ হয় তাহলে সেই নিরাশার একটা ফলাফল উপলব্ধ হয় যেখানে আসলে সম্পদের ভুল বণ্টন এবং ভোক্তাকল্যাণে পরিমাণকে হ্রাস করে। কিছু মানুষ রায়ের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপনের এই দিকটির নিন্দা করেন। বিশেষ করে তারা এটা বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞাপনে যে দ্রব্যগুলিকে মহিমান্বিত করে উপস্থাপন করা হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে অবাঞ্ছিত কারণ তারা মানবসম্প্রদায়ের জন্য যা কিছু 'ভালো' হিসেবে বিবেচনা করেন তার মধ্যে এই দ্রব্যগুলি পড়ে না। বিজ্ঞাপনের পেছনে ব্যয়ের গভীরতম সম্ভাব্য প্রভাব রয়েছে সেখানে যেখানে বিজ্ঞাবিত পণ্যগুলির লুক্কায়িত গুণাবলী থাকে এবং সেখানে যেখানে পণ্যগুলির দ্বারা চাহিদাপূরণ এবং সন্তুষ্টির মাত্রা উচ্চ হয়। কেউ কেউ বিজ্ঞাপনের সমালোচনা এই কারণে করেন যে এটি আমাদের সম্পদের সিংহভাগকে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক হওয়া এই চাহিদাগুলো পূরণের পেছনে ব্যয় করায়। তারা তাদের সমালোচনাকে প্রসারিত করেন এই সত্যের ভিত্তিতে যে দ্রব্যের লুক্কায়িত বা গোপন গুণাবলীকে অতি সহজে বিজ্ঞাপনের প্রয়োগে ভুলভাবে উপস্থাপিত করা যায় এবং বিজ্ঞাপনদাতারা এই প্রান্তিক চাহিদাগুলি পূরণে মানুষের অভিজ্ঞতার অভাব বা অজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে পারে যা ভোক্তাদের মৌলিক ও জৈবিক সমস্ত চাহিদা পূরণের পরেই গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা নির্ধারক হয়ে ওঠে। বিজ্ঞাপনদাতারা ভোক্তাদের ব্যবহারকে বা প্রতিক্রিয়াকে একটি মাত্র নির্ধারিত উপায়ে চালনা করতে পারেন না। বিজ্ঞাপনদাতারা ভোক্তাদের প্ররোচিত করতে পারে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতাদের প্ররোচনার দক্ষতা ভোক্তাদের সেই প্ররেচনাকে উপেক্ষা করার দক্ষতার থেকে অধিক হয়। ভোক্তা-চাহিদা আসলে মানব প্রাজতির চাহিদারই একঠি অংশ, যা আসলে প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইতালিয়ানরা নিজেদের খাদ্যসংস্কৃতির ভিত্তিতে যেখানে চিজের বিভিন্ন ধরন এবং রুটির বিভিন্ন ধরন ক্রয় করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে সেখানে একজন বাঙালি ক্রেতা নিজের খাদ্যসংস্কৃতির ভিত্তিতে চালের বিভিন্ন প্রজাতি কিংবা মাছের বিভিন্ন প্রজাতি ক্রয় করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করবে। সংস্কৃতির প্রকৃতি এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন তাই বিজ্ঞাপনের মতো সংস্কৃতির যেকোনো একটি উপাদানের থেকে ভোক্তা-চাহিদা উপলব্ধি করার জন্য অনেক বেশি অপরিহার্য হিসেবে পরিগণিত হয়।

বিজ্ঞাপন হল এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে মানুষ নানান কিছু শেখে, কিন্তু এটি কোনোভাবেই একমাত্র

উপায় বা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপায় নয়। বিজ্ঞাপনের মাদ্যমে বা অনুকরণের মাধ্যমে গড়ে ওঠা চাহিদাগুলি কখনোই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেহেতু অধিকাংশ চাহিদাই আসলে এইভাবে গড়ে ওঠে ফলে এক্ষেত্রে কোনো যুক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয় যে একজন বা একজনের পরিবারের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা অপরের শিক্ষাগত যোগ্যতার থেকে উচ্চতর।

আলোচনার উপান্তে এসেও দুটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর মেলে না, এবং তার একটি হল মূল বিচারের বিষয় যার দ্বারা অবশ্যই মানুষের চাহিদার সম্প্রসারণ ও দিক নির্দেশনায় বিজ্ঞাপনের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি এই—বিজ্ঞাপনদাতারা, যারা কিনা দিকনির্দেশনা এবং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তারা কি নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন? এটি মূলত সমালোচনামূলক সেখানে যেখানে বিজ্ঞাপন শিশুদের দিকে পরিচালিত হয়; শিশুরা, যারা ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে সংবেদনশীল এবং দুর্বল অংশ, যাদের মূল্যবোধ জ্ঞাপন এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা গডে ওঠে।

বিজ্ঞাপনদাতারা কী করতে চেষ্টা করছে এবং তারা কী করতে সফল হয়েছে সেই বিষয়ে আমাদের অবশ্যই উদ্বিগ্ন হতে হবে। অর্থনীতি সম্বন্ধীয় যে প্রশ্নটির উত্তর আমাদের অতি অবশ্যই অন্বেষণ করা উচিৎ তা বাজারে গড়ে ওঠা কোনো অর্থনৈতিক পছন্দের থেকে মূল্যবোধ বিচারের স্থানটিকে অবহেলা না করে এটিকে বরং একটি ভিন্ন কাঠামোর মধ্যে এনে ফেলে। বিজ্ঞাপনের পেছনে প্রতিবছর যে লক্ষাধিক অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তা কি এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার জন্য সর্বোত্তম পন্থা?

বিজ্ঞাপনের সামাজিক প্রভাব থেকে অর্থনৈতিক প্রভাবকে পৃথক করা অযৌক্তিক। বিজ্ঞাপন মূলত একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞাপনের যে কোনো সামগ্রিক মূল্যায়নে এর অর্থনৈতিক প্রভাবের বিশ্লেষণকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ। বিজ্ঞাপন বিভিন্ন উপায়ে সমাজকে অর্থনৈতিক মূল্য প্রদান করে। এটি তথ্য প্রদান এবং ব্র্যাণ্ডের সমর্থনের মাধ্যমে ভোক্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণকে উন্নতর করে। বিজ্ঞাপন বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে তাদের গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একটি কার্যকর উপায় হিসেবে কাজ করে। এই ধরনের প্রক্রিয়া নতুন পণ্য প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

একজন ক্রেতা একটি নির্দিষ্ট পণ্য থেকে যে সুবিধা লাভ করে, বিভিন্ন পণ্য সংস্থা গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা সেই সুবিধাকে বৃদ্ধি করে। এটি বিবিন্ন গণমাধ্যমকে সমর্থন করে এবং ভোক্তা ক্রয়ের মাত্রার চরম সীমাকে হ্রাস করতে পারে।

যুগপৎ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার উদ্যোগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন ক্রমাগত অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠছে। এমন একটি সংস্থার ধারণা করা কঠিন যেটি তার পণ্যকে কোন না কোন ভাবে প্রচার করার চেষ্টা করেনি। অধিকাংশ আধুনিক সংস্থা খুব স্বল্পসময়ের জন্য ব্যতীত প্রচার ছাড়া টিকে থাকতে অক্ষম। এমনকি শ্রমিক সংগঠনগুলি নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি জনসাধারণের কাছে ব্যাপকভাবে জানাতে প্রচারমূলক চ্যানেলগুলির ব্যবহার করেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে বিজ্ঞাপন ব্যবসার ক্ষেত্রে অতীতের তুলনায় একটি বড় ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞাপনের কাজ হল পণ্য ও পরিষেবার ব্যাপক ব্যবহার প্রচার করা। এটি দ্রুত ভোক্তাদের কাছে প্রয়োজনীয় বার্তা প্রেরণ করে উৎপাদন এবং গ্রহণের মধ্যে সময়ের ব্যবধানকে হ্রাস করে। বিজ্ঞাপনও পুরাতন ও নিম্ন-মানের পণ্য থেকে উন্নত ও নতুন ধরনের পণ্য-মডেলের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। এটি

ভোক্তাদের পণ্য গ্রহণের মনোভাবকে ঢেলে সাজাতে এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন পণ্যের প্রবর্তনের গতি বৃদ্ধি করে।

এটি অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের পরিবর্তে সম্পদের সংরক্ষণ, শিল্প দূষণের পরিবর্তে বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ, সম্পদের প্রভূত অবক্ষয়ের পরিবর্তে উপকরণের পুনর্ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। আমরা যদি বিজ্ঞাপনকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবি তাহলে আমরা এটিকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তথ্য প্রেরণ এবং গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত জনসাধারণ এবং কার্যকলাপের একটি সেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি।

৩.৪ বিজ্ঞাপনের অর্থনৈতিক দিক

বিজ্ঞাপন চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটায়। এটি জনসাধারণকে পণ্য ও পরিষেবা ক্রয় করতে উৎসাহিত করে। এটি জনসাধারণের আয় উন্নত করার সুযোগ দেয়। এছাড়াও এর নানান অর্থনৈতিক দিকগুলি হল;

● **পণ্যের মান উন্নতকরণ :** বিজ্ঞাপন পণ্য এবং পরিষেবার মান উন্নত করে। বিজ্ঞাপিত অধিকাংশ পণ্যই বাজারের সেরা পণ্য। এটি পণ্যের ইতিবাচক দিকগুলি বিজ্ঞাপিত করে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। বাজারে বহু অবিজ্ঞাপিত পণ্য পাওায় যায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যখন ক্রয় করেন তখন অবিজ্ঞাপিত পণ্যের তুলনায় বিজ্ঞাপিত পণ্যটিকেই নির্বাচন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অধিকাংশ ব্যক্তিই তুমুল হারে বিজ্ঞাপিত পেপসি বা কোকাকোলাকে অন্যান্য অবিজ্ঞাপিত ঠান্ডা পানীয়ের তুলনায় অধিক নির্বাচন করেন।

● **পণ্যের উপযোগীতার উন্নতকরণ :** বিজ্ঞাপন ভোক্তাদের পণ্যের উপযোগিতা প্রদান করে, এটি ভোক্তাদের পণ্য ও পরিষেবা সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করে। মানুষ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে পারে। এটি মানুষকে পণ্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। যেমন—মোবাইল ফোনের মৌলিক গুণ হল প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা গড়ে তোলা। এখন আমাদের মোবাইল এই মৌলিক গুণটি বহন করা ছাড়াও ক্যামেরা, ইন্টারনেট, ব্লুটুথ প্রভৃতি পরিষেবা রপ্রদান করে। মোবাইল ফোনে থাকা এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রাহকদের জন্য উন্নততর উপযোগিতা তৈরি করেছে।

● **মূল্য হ্রাস :** ভোক্তামূল্যের মধ্যে পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিতরণ খরচ, বিক্রেতার লভ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় এবং ভোক্তামূল্য সরাসরিভাবে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় পণ্যের বিপণন ব্যয়কে বৃদ্ধি করবে. স্বল্পমেয়াদের বিজ্ঞাপনের জন্য বর্ধিত ব্যয় ভোক্তামূল্যকে বর্ধিত করে। দীর্ঘমেয়াদে, কোম্পানি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় এবং বাজারে নিজেদের অবস্থান প্রসারিত করে। এটি বিক্রয়ের পরিমাণকে বর্ধিত করে যার ফলে মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি পায়। যেমন—টেকসই পণ্য যেমন ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, কম্পিউটার ইত্যাদি প্রতিযোগিতা, ব্যাপক উৎপাদন, বিতরণ এবং ভোগের কারণে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের দাম কমিয়েছে।

● **উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা :** দীর্ঘমেয়াদে বিজ্ঞাপন উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেয়। পণ্য উৎপাদনকারী সংস্থার ক্ষমতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়। এটি উৎপাদনের পরিমাণকেও বৃদ্ধি করে। নিম্নলিখিত উপায়ে বিজ্ঞাপন উৎপাদন খরচকে হ্রাস করে;

বিজ্ঞাপন চাহিদা তৈরি করে উৎপাদনের ওভারহেড খরচ কমায়।

এটি চাহিদার সময় পরিবর্তনের ওপর নজর রাখে।

এটি বিক্রয় টার্ণওভার বাড়ায়।

এটি সামগ্রিক উৎপাদন খরচ কমায়।

এটি পণ্যের একক প্রতি উৎপাদন খরচ কমায়।

এটি উপাদনকারীকে হ্রাসপ্রাপ্ত সংরক্ষণ ক্ষমতার অর্থনীতি অধিগ্রহণে সহায়তা করে।

এটি উৎপাদনের নির্দিষ্ট নিক্তির অর্থনীতিকে সুনিশ্চি ত করে।

● **বিতরণ কমায় খরচ :** বিতরণ খরচের মধ্যে সবসময়ই বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এরই সঙ্গে এতে প্রদর্শন, ডিলারের কমিশন, প্রণোদনা খরচও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিজ্ঞাপনের ব্যয় আসলে পণ্য বিক্রয়ের ব্যায়েরই একটা অংশ। এটি মোট বিক্রয় ও বিতরণ খরচকে যুক্ত করে। কার্যকরী বিজ্ঞাপন ব্যক্তিগত স্তরে বিক্রয়ের খরচ কমিয়ে দেয়। এবং এইভাবে বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারকের জন্য বিতরণ খরচও হ্রাস করে।

● **চাহিদা এবং পছন্দ বৃদ্ধি করে :** পণ্য এবং পরিষেবার চাহিদা বাড়াতে বিজ্ঞাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কার্যকরী বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনদাতাকে নতুন ব্র্যাণ্ডের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ দেয়। এটি পণ্য এবং পরিষেবার প্রচার করে। এটি গ্রাহককে বিজ্ঞাপিত পণ্য ক্রয় করার জন্য উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ—বিভিন্ন ভোক্তা গোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসহ মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপন ভোক্তাদের চাহিদা এবং পছন্দ বৃদ্ধি করে।

● **নিম্নলিখিত উপায়ে বিজ্ঞাপনদাতা চাহিদা এবং পছন্দ বৃদ্ধি করতে পারেন—**

অন্য পণ্য উৎপাদন।

পণ্যের গুণমান উন্নত করা।

পণ্যেরপ বৈচিত্র্য প্রদান করা।

কার্যকর প্রচারমূলক কার্যক্রম।

কার্যকর বিজ্ঞাপন তৈরি করা।

উপযুক্ত 'লক্ষ্য গোষ্ঠী' নির্বাচন করা।

● **প্রতিযোগিতা কাটিয়ে ওঠা :** ব্যবসার সাফল্য নির্ভর করে 'targeted population' বা 'লক্ষ্য গোষ্ঠীর' কাছে কার্যকর উপায়ে পৌঁছনোর মধ্যে। কার্যকরী বিজ্ঞাপন কোম্পানিকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। এটি পণ্য এবং পরিষেবাগুলির জন্য অনুকূল ব্র্যাণ্ড ইমেজ তৈরি করে। এটি একটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য একটি একচেটিয়া পরিচয় প্রতিষ্ঠা করে। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোপানি গ্রাহকের আস্থা ও আনুগত্য অর্জন করতে পারে। এঠি সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের দিকে পরিচালিত করার সমান্তরালে গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করে।

● **অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বাড়ায় :** বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনদাতাকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি উদ্দীপিত করতে সহায়তা করে। ভোক্তা-ব্যয় দ্বারা অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। বিজ্ঞাপন মানুষকে নানা দিকে আরও বেশি খরচ করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি ক্রয় এবং পুনঃরক্রয়কে উৎসাহিত করে। বিজ্ঞাপন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে।

● **অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা :**

এটি বিজ্ঞাপনদাতার জন্য একটি অর্থনৈতিক কর্ম সম্পাদন করে।

এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এটি বিক্রয় প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এটি নতুন পণ্য এবং পরিষেবা প্রচারের জন্য একটি কার্যকর বিপণন সরঞ্জাম।

এটি মানুষকে সচেতন করতে সহায়তা করে।

এটি পণ্য ও পরিষেবা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে।

এটি জনগণের জন্য একটি দক্ষ ও সাশ্রয়ী প্রচারাস্ত্র।

এটি দীর্ঘমেয়াদে দাম কম নিশ্চিত করে।

এটি বাজারে নতুন পণ্য ও নতুন সংস্থাগুলির প্রবেশকে সহজতর করে তোলে।

এটি জনসাধারণের অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্নাবলি

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** :

১. বিজ্ঞাপন কখন এবং কীভাবে ভোক্তামূল্য বৃদ্ধি করে?

২. অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের ভূমিকাটি সূত্রাকারে লিখুন।

৩. বিজ্ঞাপনের দুটি প্রধান অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

● **বড় প্রশ্ন :**

১. বিজ্ঞাপনের অর্থনৈতিক দিকগুলি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

২. বিজ্ঞাপন ও সম্পদ বরাদ্দের সম্পর্কটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. বিজ্ঞাপন এবং পণ্যমূল্যের সম্পর্কে একটি বিস্তারিত আলোচনা করুন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. %Feconomic-and-social-aspects-of-advertising&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%F4

২. https://rksmvv.ac.in/wp-content/uploads/2021/04/Sem3_CC7_Studymaterial_SC.pdf

৩. বিজ্ঞাপনবিদ্যা—অনিল রায়চৌধুরী ও প্রভাত কুমার গোস্বামী—পঃ বঃ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ

৪. বিজ্ঞাপন ও বিপণন—ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য—লিপিকা

৩.৭ প্রযুক্তিগত ও নৈতিক প্রভাব

৩.৭.১ ভূমিকা
৩.৭.২ গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত প্রভাব
৩.৭.৩ গণমাধ্যমের নৈতিক প্রভাব
৩.৭.৪ প্রশ্নাবলি
৩.৭.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৭.১ ভূমিকা

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে স্মার্টফোন, সামাজিক মাধ্যম, উন্নততর গণমাধ্যম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির মতো ডিজিটাল সরঞ্জামগুলির বিস্তার তথ্যের সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়ায় একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই বস্তুগুলি অনস্বীকার্যভাবে অতুলনীয় সুবিধা, সংযোগ, গতি এবং দক্ষতা প্রদান্ন করে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, স্মর্টফোনের আবির্ভাব তথ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অবিশ্বাস্যভাবে সুভিধাজনক করে তুলেছে। এর মাধ্যমে আমরা অনায়াসে তথ্য পুনরুদ্ধার করতে, অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং স্ক্রিনে একটিমাত্র স্পর্শের মাধ্যমে সমস্ত কাজ করতে সক্ষম হই। এইসমস্ত সুবিধার সমান্তরালে মস্তিস্কের কার্যকারিতা ও জ্ঞানের ওপর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমগুলির প্রভাব অধ্যয়নের একঠি জটিল ক্ষেত্র। যেহেতু আমরা আমাদের জ্ঞানীয় ক্ষমতার ওপর প্রযুক্তির প্রভাবগুলি বোঝার চেষ্টা করি, ডিজিটাল সরঞ্জামগুলি এবং উন্নততর গণমাধ্যমগুলির উপর আমাদের ক্রমাগত নির্ভরতা এবং ব্যবহারের কারণে নিছক পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রকৃত কারণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা ক্রমাগত চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিম্নে আমরা আমাদের সামনে থাকা সেইসমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করব।

৩.৭.২ গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত প্রভাব

এই অত্যাধুনিক নবনির্মিতির জগতে সামাজিক গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের আজকের জীবনে এক নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহার্য জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে আমাদের জীবনকে অনেক বেশি সহজ ও উপযোগী করে তুলছে। প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের মধ্যকার দূরত্বকে কমিয়ে দিচ্ছে, যোগাযোগকে সহজ করছে। শুধুমাত্র বাইরের অভিঘাতই নয় প্রযুক্তি আমাদের মনোজগত, অস্তিত্বেও প্রভাব বিস্তার করছে। এর ফল ভালো-খারাপ দুটি দিকই লক্ষ করা যাচ্ছে।

এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি যে প্রযুক্তিগত দিক থেকে সমগ্র পৃথিবীর উন্নতির সুফল স্বরূপ হাতে হাতে স্মার্ট ফোন, ডিজিটাল যন্ত্রপাতি, সামগ্রী। এ-ছাড়া ডিজিটাল ঘড়ি থেকে গাড়ির প্রভূত সুবিধা

আমাদেরকে মুহূর্তেই গোটা পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে। আমরা ফোনের মাধ্যমে একটিই স্পর্শেই সারা বিশ্বের তথ্য জেনে নিতে পারছি। উল্টোদিকে আমরা নিজেদের বিষয়ে নিজেদের জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, কাজকর্ম মুহূর্তেই সামাজিক মাধ্যমে অন্যদের জানার সুযোগ করে দিতে পারছি। তথ্যের এই আদান-প্রদানের দুর্দান্ত সুযোগকে নানাভাবে কাজে লাগাচ্ছি। তবে এই ডিজিটাল সামগ্রীর প্রভাব মস্তিষ্কে কীভাবে পড়ে তা খুবই জটিল বিষয়। সামাজিক জীবন ছাড়িয়ে একেবারে ব্যক্তি জীবন, শরীর, মনের ওপর এইসব সামগ্রী, প্রযুক্তির নানারকম প্রভাব রয়েছে।

জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানের (cognitive psychology) বিস্তৃত পরিসর বলে যে মানুষের মনোযোগের একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট কাজ বা উদ্দীপনায় স্থির মনোযোগ রাখ তে পারে। তবে ক্ষমতা একেবারে বাধাধরা নয়। কমবেশি নয়। সমাজ, পারিপার্শ্বিক, পরিবেশ ও অন্যান্য কারণে। এই ডিজিটাল যুগ একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে এই মনোযোগ ক্ষমতার ওপর। মানুষ তার নির্দিষ্ট কর্মে বা বিষয়ে স্থির মনোযোগ ধরে রাখবে তা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। অতিরিক্ত স্মার্ট ফোনের ব্যবহার মনোযোগ, ধৈর্য্যের ওপর প্রভাব ফেলে। অস্থিরতা গ্রাস করছে। মানুষ খুব তাড়াতাড়ি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে আসল কাজ থেকে। ফেসবুক, ইন্সটাগ্রাম, টিকটক, থ্রেডস, টুইটার ইত্যাদি সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলি হল মনোযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণ। প্রতিনিয়ত নোটিফিকেশন, আপডেট, স্ক্রোলিং একটা নেশাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি করে আমাদের সময়কে গ্রাস করে। মানসিক শান্তি ও স্থিরতা বিঘ্নিত হয়। এমনকি অনেকসময় এই অ্যাপগুলো অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করতে করতে আমাদের সক্ষমতার স্তর পেরিয়ে যায়। যাকে বলা হচ্ছে 'attentional overload'। ফোন যেভাবে অতিরিক্ত চাপ, ব্যবহারে ক্ষমতার বাইরে কাজ করতে পারে না তেমনি ঘটে আমাদের মন-মগজের সাথেও। যাকে ডিজিটাল জগতে বলা হচ্ছে CONTINUOUS PARTIAL ATTENTION (CPA)। এই ব্যধির ফলে একই মেইল দুবার পাঠানো, ভুল ব্যক্তিকে পাঠিয়ে ফেলা, বিচ্ছিন্নতা, ভুলো মন কিংবা অতিরিক্ত সচেতন থাকা নির্দিষ্ট একটা বিষয় নিয়ে এসব ঘটে। ক্রমাগত আংশিক মনোযোগ বলা হচ্ছে একে বাংলায়। আমাদের একটি স্থির বিশ্বাসে কিংবা মনোযোগে থিতু হতে না দিয়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয় এইসব ডিজিটাল জিনিসের দ্বারা।

এরপর আরেকটি ব্যধি হল— 'FEAR OF MISSING OUT' তথা 'FOMO'। সমাজমাধ্যমে অত্যাধিক থাকার ফলে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়বার ভয় কাজ করে। নিত্যনতুন ট্রেন্ড, ঘটনার আপ্ডেট, পোস্টে না থাকলে পিছিয়ে যাওয়ার ভয় কাজ করে। অন্যদের মতো নিজেকে দেখানোর জন্য সবসময় সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, আধুনিক প্রযুক্তির এটা একটা বিশেষ প্রভাব বলা চলে। এই আংশিক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মনোযোগ আর বিচলিত স্বভাবই গঠনমূলক কাজ থেকে মস্তিষ্ককে দূরে সরিয়ে দেয়। মানসিক ধৈর্য, সক্ষমতা বিনষ্ট করে। বিষাদ, অবসাদ বাড়ায়। মাল্টিটাস্কিং (multitasking) তথা একইসঙ্গে একাধিক কাজ এই ডিজিটাল যুগে সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলেও একাগ্রতা কমে। কাজের গভীরতা নষ্ট হয়। মানসিকভাবে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না।

আংশিক মনোযোগের (attentional overload) নানা কারণ রয়েছে। ডিজিটাল বস্তুগুলো যেমন মোবাইল, ঘড়ি, টিভি ইত্যাদির নানা ফিচারস রয়েছে যা সর্বক্ষণ নোটিফিকেশন দেওয়ার মাধ্যমে আলার্মের

কাজ করে। মেসেজ আসা, কল আসা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার এপ্লিকেশনের নোটিফিকেশন। সবসময় কিছু না কিছু আসতেই থাকে যা মনকে সহজেই বারবার উদ্দীপনা দেয়। মস্তিষ্ক বারবার মনোযোগ হারিয়ে ফেলে। এ-ছাড়া ভিডিও, রিলস দেখার সময় দেখা যায় অনবরত স্ক্রোলিং। একটার পর একটা স্ক্রিনে আসতে থাকে স্ক্রোল করে করে প্রতিটি ভিডিও দেখা হয়। এভাবে সংযুক্ত থাকার ফলেও এই মনোযোগের সমস্যাটি ঘটে। এ-ছাড়া অত্যাধিক তথ্য (volume of information) ডিজিটাল মাধ্যম থেকে দিনরাত মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। খবর থেকে সিনেমা, বিনোদন সবকিছু বাধাহীন কোনোপ্রকার সময়-পরিসর ছাড়া অনবরত প্রবেশ করে। এই এত পরিমাণ তথ্য যা আসলে দেখা যায় একেবারেই মস্তিষ্কের জন্য প্রয়োজনীয় নয় তা সমস্যার সৃষ্টি করে। এ-ছাড়া এই তথ্যের জন্য বারবার ফোন ঘাঁটা, অন করা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবে ডিজিটাল যন্ত্র, প্রযুক্তি দ্বারা বারবার মনোযোগ বিঘ্নিত হতে থাকলে কাজে উদ্যোম হারিয়ে যায়। ইচ্ছেশক্তি, ধৈর্য্য হারায়। সহনশীলতা নষ্ট হয়। অবসাদ গ্রাস করে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত বোধ হতে পারে। কর্মক্ষমতার হানি ঘটে। একনাগারে অনবরত ডিজিটাল প্রযুক্তি, যন্ত্র ব্যবহারে ব্রেইনের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়। মনোযোগ নষ্ট হয়। জ্ঞানীয় বা বোধশক্তির (cognitive power) পরিমাণ হ্রাস পায়। আবার উল্টোদিকে গেম খেলার মধ্য দিয়ে মনোযোগ বৃদ্ধি পেত পারে। কারণ সেখানে একই কাজ অতিরিক্ত মনোযোগ ও উদ্যোমে করা হয়। তবে অতিরিক্ত খেলার ফল একই হবে।

বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে ডিজিটাল ডিভাইসের অতিরিক্ত ব্যবহারে ADHD (ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER) ঘটতে পারে। সার্বিকভাবে প্রমাণিত না হলেও বলা হচ্ছে যে অতিরিক্ত স্ক্রিনে চোখ রাখা, সামাজিক মাধ্যমে থাকা, টিভি দেখা এইজন্য দায়ী। এ-ছাড়া ডিজিটাল প্রযুক্তি, ডিভাইসের অতিরিক্ত ব্যবহারের স্মরণশক্তি কমে (memory loss) যেতে পারে। বোধশক্তির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। এটা ঘটে 'Digital Dimentia' এর মাধ্যমে। ফোনে ক্যালেন্ডার, নোটসে লিখে রাখা বা রিমাইন্ডার সেট করার মধ্য দিয়ে কিংবা ফোন নম্বর সেভ করার সুবিধার ফলে আমরা আর সে বিষয় মনে রাখি না। তেমনি ফোটোগ্রাফ রাখার মধ্য দিয়েও আমরা আসল স্মৃতিকে ধরে রাখতে পারি না। আমাদের ভাবনার, চিন্তার প্রয়োজন পড়ে না। ভাবা ভুলে যাওয়ার ফলে স্মৃতিতে তার প্রভাব পড়ছে।

গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে অত্যধিক সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার মানব মস্তিষ্কের অগ্রভাগের ধূসর পদার্থ বা গ্রে ম্যাটারের ঘনত্ব কমানোর জন্য দায়ী। স্মার্ট ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার মস্তিষ্কের 'প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স'-এর কার্যক্রম বিঘ্নিত করে। একটি গবেষণায় একদল মানুষক তিনটি ভাগে বিভক্ত করে একটি বক্তৃতায় অংশ নিতে বলা হয়। এর মধ্যে প্রথম দলটিকে বক্তৃতা চলাকালীন তাদের স্মার্ট ফোন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় দলকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং তৃতীয় দলকে তাদের স্মার্ট ফোন বক্তৃতাকক্ষের বাইরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। গবেষণার শেষে দেখা যায় প্রথম দলটি, অর্থাৎ যারা বক্তৃতাচলাকালীন তাদের ফোন ব্যবহার করেছিল বক্তৃতার খুব সামান্য অংশ তারা মনে রাখতে পেরেছে। একইভাবে সমাজমাধ্যমের থেকে আগত ক্রমপরম্পরা গ্রহণের ফলে একটা সময়ের পরে তথ্য মনে রাখার ক্ষমতা নষ্ট হতে দেখা গেছে। Cain et al. (2016)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী গণমাধ্যমের বহুল ব্যবহারের ফলে মনোসংযোগ এবং স্মৃতিশক্তি বিঘ্নিত হয় যার ফলস্বরূপ ছাত্রজগতে পড়ে এবং পরীক্ষায় আশানুরূ ফলাফল করার থেকে ক্রমাগত বিচ্যুত হয়।

প্রযুক্তিবিদ্যার অত্যাধিক ব্যবহার নেশা হয়ে দাঁড়ায়। এই নেশা মানসিক বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্মরণশক্তিকে প্রভাবিত বা বিনষ্ট করে এবং চিন্তা করার ক্ষমতা হ্রাস করে। প্রযুক্তবিদ্যা ছাড়াও ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের অত্যধিক ব্যবহার বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপের (Cognitive Function) উপর প্রভাব বিস্তার করে। সর্বোপরি এই নেশা আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াও সহানুভূতি, আবেগের ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বন্ধুত্ব স্থাপনের সমান্তরালে চিন্তাভাবনার আদানপ্রদানে আসক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সবসময় সেটা বজায় রাখার প্রচেষ্টা থাকে ফলস্বরূপ সামাজিক মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয়। ফলে সুস্থস্বাভাবিক মানুষের যে সামাজিক ও মানসিক চাহিদা তা সমাজ থেকে গ্রহণ না করে সামাজিক মাধ্যমগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, ফলে এই সামাজিক বিচ্যুতি ব্যক্তিমানুষ হিসেবে তার অবস্থানকে বিচ্যুত করে।

স্নায়ুবিদ্যার গবেষণায় দেখা গেছে যে এই সমস্যাযুক্ত সামাজিক মাধ্যম, ডিজিটাল যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কিত রয়েছে আমাদের PFC (Prefrontal Cortax) এবং ACC (The Anterior Cingulate Cortex)-এর সঙ্গে। মস্তিষ্কের এই অংশগুলোর কাজ হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আবেগ ও উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ। উক্ত বিষয়গুলির অতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থ হ্রাস করার বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করে। এগুলোর সরাসরি প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কের DLPFC (Dorso Lateral Prefrontal Cortex) এবং Rostral ACC-এর ওপর। DLPFC-এর কাজ হল সিদ্ধান্তগ্রহণ, তথ্য গ্রহণ ও তথ্যকে বাছাই করে প্রতিক্রিয়া প্রদান ইত্যাদি অন্যদিকে Rostral ACC-এর কাজ হল আবেগের সুষ্ঠু বিন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করা। কাঠামোগত ও কার্যকরী পরিবর্তনগুলি ছাড়াও মস্তিষ্কের কার্যকরী সংযোগের পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। অতিরিক্ত গেমিং আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিদের এই PFC এবং ACC-তে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তারা জ্ঞানীয় নিয়ন্ত্রণ ও মানসিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়। মস্তিষ্কের এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিবর্তনগুলি ছাড়াও বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। আত্ম নিয়ন্ত্রণ, সুস্থ স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এইসব অসুবিধা এবং অসুস্থতাকে দূরীভূত করবার জন্য প্রয়োজন মনঃসংযোগ, নিয়মনীতি পালন, সামাজিক মাধ্যম থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখা, প্রয়োজনের বেশি কোনো গণমাধ্যমই বেশি ব্যবহার না করা এবং বাস্তব সমাজ জীবনে সংযোগ বৃদ্ধি করা।

গণমাধ্যম এবং উন্নততর প্রযুক্তিসহ গণমাধ্যমগুলি নতুন তথ্য অন্বেষণ, নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আসক্তি তৈরি করে। ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যমসহ বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নতুনত্বসন্ধানী আচরণ ও উদ্দীপনাকে বৃদ্ধি করে। অভিনয় তথ্য, নানাবিধ বিষয় প্রতিনিয়ত উদ্দীপ্ত করে। এর একটি নেতিবাচক দিক হল জ্ঞানীয় ক্লান্তি এবং অত্যাধিক তথ্যের ভাণ্ডার অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। দৃশ্য-শ্রাব্য (Audio Visual) সুবিধা থাকার ফলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ অনেকবেশি সহজ হয়। তবে এই ভার্চুয়াল জগত ও ভৌত জগতের মধ্যে একটি পার্থক্য থাকার ফলে সত্য-মিথ্যা-ঠিক-ভুল ইত্যাদি বাইনারিগুলোর বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এছাড়াও, সামাজিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। আমরা কীভাবে উপলব্ধি করি এবং অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করি তা দর্শায়। অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যমগুলিতে অমৌখিক বার্তালাভের অভাবের ফলে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হত পারে। আমরা অপরের উদ্দেশ্য এবং

আবেগের সঠিক উপলব্ধির সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করি না। ডিজিটাল যোগাযোগ মাধ্যমগুলি প্রায়শই একটি 'অহং কেন্দ্রিক' পক্ষপাতের জন্ম দেয় (Ego-Central Bias) যেখানে ব্যক্তি নিজেদের আবেগ, মনোভাব, বিদ্রূপ ইত্যাদির ক্ষমতাকে অত্যাধিক মূল্যায়ন করে এবং সম্ভাব্যভাবে অপরের উদ্দেশ্য-আবেগ সম্পর্কে ভুল ধারণা গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া এই ডিজিটাল মাধ্যমগুলির থেকে ঈর্ষার সৃষ্টি হতে পারে, যেমন 'Facebook Envy'। অন্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দৈনন্দিন তথ্য জেনে নিজের অবস্থা সম্পর্কে হীনমন্যতা সৃষ্টি হতে পারে, নিজের জীবনের শান্তি, তুষ্টি বিঘ্নিত হয়।

যদিও ডিজিটাল যুগ ও প্রযুক্তির মাধ্যমে আমাদের উপলব্ধির পরিসর বৃদ্ধি পাওয়া এবং ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচে যাওয়া ও নানান সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া ঘটার সমান্তরালে নানান জটিলতারও সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত অনুপস্থিতির কারণে শুধুমাত্র অনলাইন বা এই ডিজিটাল উপস্থিতি আমাদের আসল ব্যক্তিত্বকে বিকৃত করে। আমাদের মৌলিক পরিচয়, আচার আচরণ, ইচ্ছে-অনুভূতির যথাযথ সত্যতা প্রকাশ পায় না। আমরা প্রায়শই ডিজিটাল মাধ্যমে নিজস্ব অবতার বা প্রতিকৃতি তৈরি করে, ফিল্টার ব্যবহার করি এছাড়া নাম-পরিচয় এবং বাস্তবতাকে গোপন করে একটি ভার্চুয়াল পরিচয় সৃষ্টি করি। এর ফলে ডিজিটাল বা প্রযুক্তিগত বিবর্তনের সদর্থক প্রয়োগ ঘটে না।

ডিজিটাল প্রযুক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমের উত্থান আমাদের তথ্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ইন্টারনেট, মিডিয়া প্রভূত পরিমাণ তথ্য প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে সরবরাহ করছে। এরফলে আমরা সেই যাবতীয় তথ্য গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এর একটি নেতিবাচকতাও রয়েছে। যেমন, এই বিশাল তথ্যের ভাণ্ডার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সঠিক বিষয়কে উপলব্ধির ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। আমাদের মস্তিষ্কের বৌদ্ধিক স্তরে এই অত্যাধিক পরিমাণ তথ্যের উদ্দীপনা সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষমতাকে বিনষ্টিকৃত করতে পারে। সমীক্ষায় দেখা গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অত্যাধিক সময় অতিবাহিতকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক ক্ষমতার অবনমন ঘটেছে। সমীক্ষকরা এই তথ্যের অতিরিক্ত চাপকে (Overload) এড়াতে ডিজিটাল ও বিভিন্ন গণমাধ্যমকে ব্যবহারের সময়কে সীমিত করার কথা বলেছেন।

ডিজিটাল যন্ত্র এবং গণমাধ্যমগুলি ব্যবহারের অতিরিক্ততা মনোযোগ ও শেখার ইচ্ছে হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া ডিজিটাল গণমাধ্যমের অত্যধিক ব্যবহার অনিদ্রার সৃষ্টি ও শারীরিক ক্লান্তির সৃষ্টি করতে পারে। ডিজিটাল স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো মেলাটনিন উৎপাদনকে দমন করে যা ঘুম ও জাগরণের চক্রকে ব্যাহত ও বৌদ্ধিক কার্যকারিতাকে বিনষ্ট করতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে নানাবিধ চিকিৎসা, ধ্যান, যোগ ও মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রকল্পে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। যেমন— Headspace, Calm প্রভৃতি অ্যাপের নাম করা যায়। এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে অনুশীলনের দ্বারা মানসিক চাপ কমানো, মনোযোগ ধরে রাখা এবং জ্ঞানীয় স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চালাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI/Artificial Intelligance)। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ChatGPT-র মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ তাদের নিজস্ব ভাষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করতে ক্রমশ সক্ষম হচ্ছে। এক্ষেত্রে 'Duolingo'-র মতো অ্যাপগুলির উল্লেখ অগ্রগণ্য।

ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার বয়স ভেদে আলাদা। প্রতিটি বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের ব্যবহার ভিন্ন। যেমন শিশুদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অত্যধিক। শিশুদের সৃজনশতা, জ্ঞানীয় দক্ষতা, সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ডিজিটাল গণমাধ্যমগুলি প্রভাব ফেলছে। শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কখনো কখনো অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই গণমাধ্যমগুলি। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্করাই সবথেকে বেশি ব্যস্ত থাকছে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত গণমাধ্যমগুলির ব্যবহারে। এরফলে প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিক জীবন, মানসিক স্বাস্থ্য, কর্মজীবন প্রভাবিত হচ্ছে।

যদিও সমস্ত গণমাধ্যম এবং প্রযুক্তিচালিত স্মার্ট মাধ্যম একইভাবে প্রস্তুত হয়নি এবং তাদের ব্যবহারের ফলাফল সবসময় একইরকম নয়। গণমাধ্যমকে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করার বিষয়টি মানুষের হাতেই রয়েছে।

৩.৭.৩ গণমাধ্যমের নৈতিক প্রভাব

গণমাধ্যম এবং নৈতিকতার মধ্যেকার সম্পর্ক জটিল এবং বহুমুখী। বেশ কিছু উপায়ের মাধ্যমে গণমাধ্যম নৈতিক দৃষ্টিকাণ ও নৈতিকতাকে প্রভাবিত করতে পারে। এগুলি হল;

✔ **মূল্যবোধের প্রতিবিম্বিত করণ—**

- **সাংস্কৃতিক মান**—গণমাধ্যম অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক মান এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে গড়ে তোলে। নির্দিষ্ট কিছু আচরণকে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য হিসেবে চিত্রিত করার মধ্যে দিয়ে গণমাধ্যম জনগণের ভুল-ঠিকের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলাতে পারে।
- **আদশ চরিত্র**—চলচ্চিত্রের চরিত্র, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য গণমাধ্যম একইসঙ্গে আদর্শ চরিত্র নির্ধারণ করতে কিংবা সাবধানকারী ঘটনা বর্ণনা করে দর্শকদের নৈতিক আদর্শ ও নৈতিকতাকে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

✔ **সুবেদিতা হ্রাস—**

- **সহিংসতার প্রকট করা**—ক্রমাগত অনৈতিক এবং সহিংস ক্রিয়ার প্রদর্শন কারও কারও মধ্যে সংবেদনশীলতা হ্রাস করে, যার ফলস্বরূপ আবেগময় প্রতিক্রিয়া বিনষ্টিকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের সহিংসতা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তাদের কাছে।
- **বিচ্যুতির স্বাভাবিকীকরণ**—যখন বিচ্যুত ব্যবহার ক্রমাগত কোনো নেতিবাচক প্রভাবের প্রদর্শন ছাড়া প্রচারিত হতে থাকে তখন সেটি ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যার ফলস্বরূপ দর্শকদের কাছে বাস্তব জীবনেও এই ধরনের বিচ্যুত ব্যবহারের গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হতে থাকে।

✔ **নৈতিক দোলাচলতা এবং আলোচনা—**

- গণমাধ্যম মানুষের মধ্যে থাকা জটিল নৈতিক দোলাচলতাকে প্রদর্শন করতে পারে, এই প্রদর্শনের মাধ্যমে উপস্থিত নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।

● তথ্যচিত্র এবং সংবাদের মাধ্যমে সামাজিক নানান সমস্যাগুলি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা সম্ভব। এর ফলে দর্শকদের মধ্যে তাদের সামাজিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং অবহিত করে তোলা সম্ভব।

✔ **যুবসমাজে প্রভাব—**

● মিডিয়া থেকে অনুকরণ একটি সাধারণ দিক, এই অনুকরণের বিষয়টি শিশু-কিশোর থেকে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এই অনুকরণের ফলে অনেক ভালো বিষয়ের সঙ্গে অনেক খারাপ বিষয়ও প্রভাব বিস্তার করে। মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানসিক শান্তিও বিঘ্নিত হতে পারে। মিডিয়ার বাস্তবতার সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের বাস্তবতার ফারাক অনেকসময় এইসব অনুকরণকে ক্ষতিকর প্রমাণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোটর বাইকের বিজ্ঞাপনে বহু বিপদজনক স্টান্ট বা কেরামতি দেখানো হয়, অপ্রাপ্ত তরুণ মন এইসব কেরামতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাস্তব জীবনে তার অনুকরণ করতে গিয়ে বিপদজনক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে এরকম প্রায়শই ঘটে।

● মিডিয়ায় দেখে জীবনকে একটা ভিন্ন জগতের মতো গড়ে তোলার চেষ্টায় যুবসমাজ প্রায়শই সমস্যায় পড়ে। যে কোনো ট্রেণ্ড বা নিয়ম-নীতি, চলমান ঘটনাতে নিজেকেও সামিল করতে গিয়ে সমাজ ও পরিবারের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে ব্যর্থ বা ছোট হয়ে যাওয়ার মতো মানসিক অবসাদ তৈরি হয় যা যুব সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর।

✔ **সামাজিক মাধ্যম ও নীতি-নৈতিকতা—**

● সোশ্যাল মিডিয়া হল ওয়েবসাইট এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিকে বোঝায় যা ব্যবহারকারীদের তৈরি করতে, সামগ্রী ভাগ করতে এবং অন্যদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে দেয়। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, SnapChat, TikTok ইত্যাদি। সোশ্যাল মিডিয়া আধুনিক সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে, বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষ এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে যোগাযোগ, তথ্য ভাগ করে নেওয়া এবং সংযোগ বিকাশের জন্য ব্যবহার করে। সোশ্যাল মিডিয়ার অনেক সুবিধা রয়েছে, যেমন লোকেদের আপডেট থাকতে এবং বন্ধু এবং পরিবারের সাথে সংযুক্ত থাকতে সক্ষম করে, ব্যবসাগুলিকে গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করতে দেয় এবং ধারণা, চিন্তাভাবনা এবং তথ্য বিনিময়ের সুবিধা দেয়। যাইহোক, সোশ্যাল মিডিয়ারও এর খারাপ দিক রয়েছে। একটি প্রধান সমস্যা হল ভুল তথ্য এবং জাল খবরের বিস্তার, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুন্ন করা থেকে শুরু করে জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করার জন্য মারাত্মক পরিণতি ঘটাতে পারে। আরেকটি সমস্যা হল সাইবার বুলিংভি, যা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এমনকি আত্মহত্যার কারণ হতে পারে। এছাড়াও, সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি হতে পারে এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে যারা এই প্ল্যাটফর্মগুলিতে অত্যধিক সময় ব্যয় করেন তাদের জন্য। সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলি এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য এবং তাদের প্ল্যাটফর্মগুলিকে এমনভাবে ডিজাইন

করার জন্য দায়ী বা ব্যবহারকারীর মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দেয়। কিছু কোম্পানি ভুল তথ্য এবং সাইবার বুলিংভির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, তথ্য-পরীক্ষা সিস্টেম বা সতর্কীকরণ লেবেলগুলিকে বিভ্রান্তিকর বলে মনে করা হয়েছে। অন্যান্য কোম্পানি আসক্তির বৈশিষ্ট্য কমাতে তাদের প্ল্যাটফর্মের নকশা পরিবর্তন করেছে। শেষ পর্যন্ত, দায়িত্বশীলভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা এবং জড়িত ঝুঁকি এবং নৈতিক বিবেচনার বিষয়ে সচেতন হওয়া ব্যক্তিদের উপর নির্ভর করে। সোশ্যাল মিডিয়াকে ভেবেচিন্তে এবং দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করে, আমরা সবাই একটি নিরাপদ এবং আরও ইতিবাচক অনলাইন পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করতে পারি। সোশ্যাল মিডিয়া আধুনিক জীবনে সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে, এবং এর ব্যাপক ব্যবহার এর ব্যবহারকারীদের জন্য বিভিন্ন নৈতিক প্রভাব নিয়ে এসেছে। গোপনীয়তা সামাজিক মিডিয়ার সবচেয়ে চাপা নৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে একটি। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রায়ই ব্যবহারকারীদের একটি প্রোফাইল তৈরি করতে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করতে হয়। এই ডেটা তারপর প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতকৃত করতে এবং বিজ্ঞাপনের সাথে তাদের লক্ষ্য করতে ব্যবহার করা হয়। যাইহোক, এই অনুশীলনটি ব্যক্তিগত ডেটার ডেটার অপব্যবহার এবং ডেটা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের অবশ্যই তাদের ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে শেয়ার করার ক্ষেত্রে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং তাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আরেকটি নৈতিক বিবেচ্য বিষয় হল অনলাইন হয়রানি এবং সাইবার বুলিং-এর সম্ভাবনা। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহারকারীদের একে অপরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে, কিন্তু এটি অনলাইন হয়রানি এবং উৎপীড়নের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটি মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং আত্মহত্যা সহ শিকারের জন্য গুরুতর পরিণতি হতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের অবশ্যই তাদের কথা এবং কাজের অন্যদের উপর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে সম্মানের সাথে এবং দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করার চেষ্টা করা উচিত। ভুল তথ্য এবং জাল খবর ছড়িয়ে দেওয়া সামাজিক মিডিয়া ব্যবহাকারীদের জন্য আরেকটি প্রধান নৈতিক বিবেচনা। মিথ্যা তথ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ণ করা থেকে শুরু করে জনস্বাস্থ্যকে বিপন্ন করার জন্য মারাত্মক পরিণতি ঘটাতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের সত্য-নিরীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং সঠিক নির্ভরযোগ্য তথ্য ভাগ করার চেষ্টা করা উচিত। অবশেষে, সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তির বিষয়টি রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার অত্যধিক ব্যবহার হতাশা, উদ্বেগ এবং আসক্তি সহ মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের অবশ্যই তাদের ব্যবহারের অভ্যাস সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং এই প্ল্যাটফর্মগুলিকে ভারসাম্যপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়া তার ব্যবহারকারীদের জন্য অনেক নৈতিক বিবেচনা নিয়ে এসেছে। গোপনীয়তা, সাইবার বুলিং, ভুল তথ্য, এবং আসক্তি মাত্র কয়েকটি বিষয় যা এই প্ল্যাটফর্মগুলি

ব্যবহার করার সময় ব্যবহারকারীদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বড় আকারের তথ্য সংগ্রহ অনেক কোম্পানি এবং সংস্থার মধ্যে সাধারণ হয়ে উঠেছে। যদিও এই অভ্যাসটি ভোক্তাদের আচরণ এবং পছন্দ সম্পর্কে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করার সম্ভাবনা রাখে, এটি বিভিন্ন নৈতিক উদ্বেগও উত্থাপন করে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বড় আকারের ডেটা সংগ্রহের প্রাথমিক নৈতিক উদ্বেগের মধ্যে একটি হল সম্মতির বিষয়। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ব্যবহারকারীদের প্রায়শই তাদের ডেটা সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা হচ্ছে তা বোঝার প্রয়োজন হয়। এই বোঝার অভাব এমন পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে যেখানে ব্যবহারকারীরা অজান্তেই তাদের ডেটা পরিচালনা করতে সম্মত হন। বৃহৎ আকারের ডেটা সংগ্রহে নিয়োজিত কোম্পানি এবং সংস্থাগুলিকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অবহিত সম্মতি পাচ্ছেন এবং ব্যবহারকারীরা বুঝতে পারে যে তাদের ডেটা কীভাবে ব্যবহার করা হবে। মিডিয়া নানান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে যেমন যুক্ত করতে পারে তেমনই পারে নস্যাৎ করতে। মিডিয়া সংস্কৃতির কোন অংশকে তুলে ধরবে আর কোন অংশকে বাতিল করবে এটা মিডিয়া চালনাকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত। বহু সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়ার ফলে অনেক কিছু বাদ পড়তে পারে বা আবার অনেক কিছু সংযুক্ত হতে পারে।

✔ **জটিল অধিগ্রহণ—**

- মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক গভীর ও কঠিন বিষয়, ঘটনাকে গ্রহণ করার ফলে ব্যক্তির শিক্ষা, জ্ঞান প্রভৃতি লাভ হতে পারে। মিডিয়াতে সর্বক্ষণ নানান রকম কার্যক্রম চলে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, ঘটনার তথ্য দেওয়া হয়। এর ফলে কোনো বিচ্ছিন্ন মানুষও মিডিয়ার থেকে এই সমস্ত তথ্য গ্রহণ করে উন্নত হতে পারে।
- ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ায় সংবেদনশীলতা, অনুভূতি, সহানুভূতি বাড়াতে পারে। অন্য জাতি, ধর্ম, কর্মের মানুষের অবস্থা, সংস্কৃতি সম্পর্কে কৌতূহল জাগতে পারে।

✔ মিডিয়ার ভালো খারাপ উভয় দিকই রয়েছে। তবে মিডিয়ার নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধের জায়গায় মানুষকে একটা বিরাট পরিসর দেয়। ঘটনা, বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যকে যুক্তিসহ তুলে ধরে। এই যুক্তি ব্যক্তি মানুষের মনোজগতে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। বিশ্বাসযোগ্য হলে মানুষ গ্রহণ করে। তবে মিডিয়াকে শিক্ষা কিংবা অভিজ্ঞতার সোপান হিসেবে ব্যবহার করতে হলে ব্যক্তি মানুষের প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে মিডিয়ার এককেন্দ্রিক বা একমুখী সুবিধাবাদী দর্শনকে ভেদ করে সঠিক তথ্য ও সত্যকে বুঝে নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা যাবে।

৩.৭.৪ প্রশ্নাবলি

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. গণমাধ্যম যুব সমাজের নৈতিকতার ক্ষেত্রে কী প্রভাব বিস্তার করে লিখুন।

২. গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত নেতিবাচকতা সম্পর্কে দুটি সূত্র আলোচনা করুন।

৩. গণমাধ্যমে সহিংস বিষয়ের প্রদর্শন কীভাবে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করে লিখুন।

৪. শিশুচিত্তে গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত প্রভাবের দিকটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

● **বড় প্রশ্ন :**

১. গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. সামাজিক মাধ্যম ও নৈতিকতার সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৩. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে আমাদের চালনা করছে সে সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

৩.৭.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১. Frontiers | The impact of digital technology, social media, and artificial intelligence on cognitive functions : a review.

২. Digital Media : Shaping Communication, Culture, and Society in the Digital Age.

৩. https://search.app?link=https@3A%2F%2Fwww.quora.com%2FHow-does-media-affect-morality&utm_campaign=aga&utmsource=agsadl2%Csh%2Fx%2Fgs%2%2F4

৪. https://search.app/?link=https%3A%2F%2Fwww.globalmediajournal.com%2Fopen-access%2Fethical-issues-and-challenges-in-social-media-a-current-scenario.php%3Faid%3D92953&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4.

NOTES

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

NOTES

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....